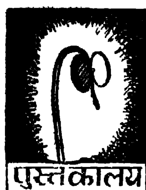
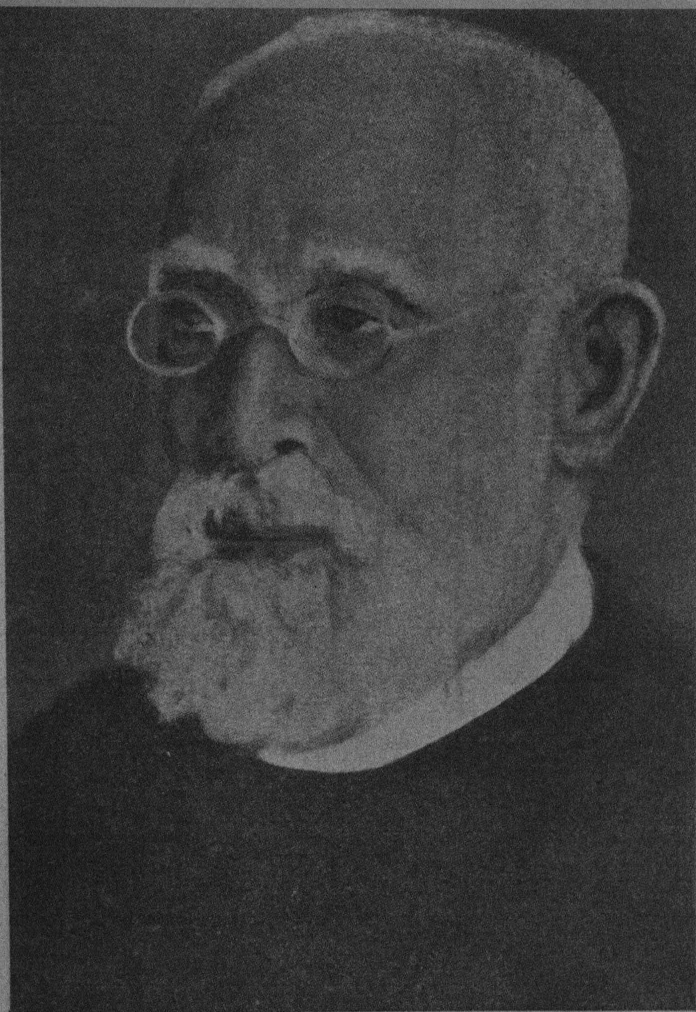
প্রথম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৬




২৯, বাদুড় বাগান রো, কলিকাতা থেকে ডি সি ব্যানার্জি কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৪৭, মধু রায় লেন, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ থেকে যামিনী মোহন ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন শ্রীযুক্ত বিভূতি ভৌমিক, বাঁধাই করেছেন মেসার্স বেঙ্গল বাইণ্ডার্স এবং ব্লক তৈরী করেছেন মেসার্স ন্যাশনাল হাফটোন।

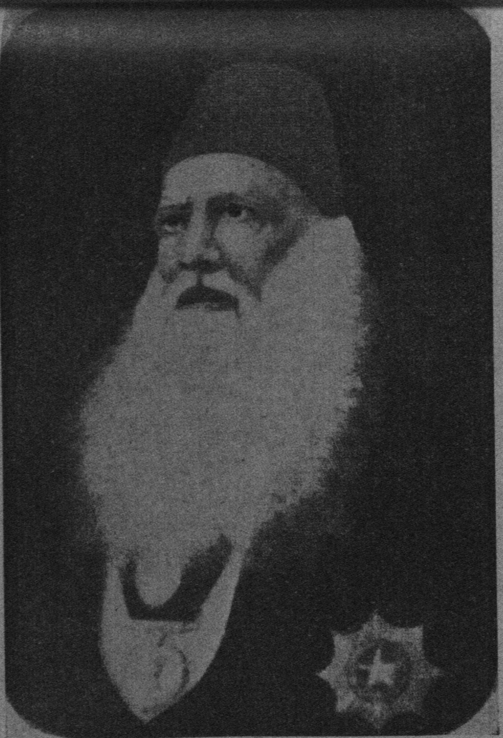


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

# ভূমিকা

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—ভারতেতিহাসের একটি পর্ব আজ শেষ হতে চলেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সত্যসত্যই কি-অর্থে কিংবা কি-পরিমাণে ১৯৪৮এর জুন মাসে ভারত ত্যাগ করবে, তা অবশ্য এখনো কেউ বলতে পারে না, স্বয়ং এটলিও না। কারণ কথাটা যা'ই হোক্ কার্যক্ষেত্রে তার রূপ নির্ভর করবে ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর ঘটনাবলী বিকাশের উপর। যে-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অতকাল আগে স্বাধীন মিশর সৃষ্টি করেও মিশর ছাড়ে না, বন্দুকের জোরে গ্রীসে নতুন করে চেপে বসে, প্যালেস্টাইন থেকে হংকং পর্যন্ত কোথাও সে সাম্রাজ্যজাল গুটিয়ে ফেলতে উদগ্রীব হয়নি। আসলে সে বুঝেছে যদি সাম্রাজ্যের স্বার্থ এদেশে বজায় রাখতে হয় তাহলে তা রাখতে হবে কূট কৌশলে—ভারতবর্ষের অন্তর্দ্বন্দ্বকে অ আঘাতে পরিণত করে, আর ভারতবর্ষের তাঁবেদার ও নূতন স্বার্থান্বেষী শক্তিসমূহকে ব্রিটিশ স্বার্থের স্থানীয় অংশীদার করে নিয়ে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, কতটা না দিয়ে কতটুকু দেওয়া যায় ক্ষমতা, এটাই হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এখনকার ভারতীয় পলিসি। আর দেওয়া ও না-দেওয়ার সেই পরিমাণ প্রধানত নির্ভর করবে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ঐক্যের ওপর ও ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম-শক্তির ওপর, ভারতীয় নেতৃ-সমাজের আপোষ রফার চাতুর্যের ওপর নয়, তাদের পরস্পরকে বানচাল করবার শক্তির ওপরেও নয়।

কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্রদের মুখে আজ এই প্রতিশ্রুতিই বা এল কেন যে, ১৯৪৮এর জুনে তারা ভারত ছাড়ছে? তারই উত্তর ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস,—যে-ইতিহাসের রচনা শুরু হয় প্রায়



সার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ



বিপিনচন্দ্র পাল

উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গেই, আর যে-ইতিহাসের শেষ অধ্যায় রচনা চলেছে আজ পথেঘাটে, ক্ষেতে-কারখানায়, ইস্কুল-কলেজে, এমন কি অফিসে ব্যারাকে পর্যন্ত। বুঝবার মত কথা এই—এ ইতিহাসে শুধু শাসন-যন্ত্রের পরিবর্ত্তনের ইতিহাস নয় এবং শুধু মাত্র শাসন-যন্ত্রের পরিবর্ত্তনে ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম এখন আর সত্যসত্যই সফল বলেও গণ্য হতে পারে না।

ধরাবাঁধা ইতিহাসের পাতায় আমরা পড়েছিলাম—কেমন করে ১৭৫৭এর পর থেকে পায়ের পর পা ফেলে ব্রিটিশ শক্তি দেশ পদানত করল। কিংবা, কেমন করে greater association of Indians in the administration of India দিনে দিনে প্রসারিত হচ্ছে; আর freedom broadening down from precedent to precedentও সত্য হচ্ছে ভারতবর্ষের বেলা। এই উদারনৈতিক দৃষ্টির জায়গায় এল ক্রমে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের এযুগের ইতিহাস-রচনা। তাতে বুঝলাম 'সিপাহী বিদ্রোহ' থেকে একেবারে ১৯৪২-এর 'আগস্ট বিপ্লব' পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসের একটা ধারা। তারপরে, এই সক্রিয় "ভারতীয় জাতীয়তাবাদ" আজ যখন উগ্র "মুসলিম জাতীয়তাবাদের" চ্যালেঞ্জে বানচাল হয়ে পড়েছে তখন হয়ত নতুন করে বুঝবার প্রয়োজন বুঝছি ওহাবি আন্দোলন থেকে জিন্না-জেহাদের পর্ব পর্যন্ত "মুসলিম বিদ্রোহ আন্দোলনের" গতি ও অর্থ। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে এসব কোনো ধারাই অবজ্ঞেয় নয়। আরও কম অবজ্ঞেয় আমাদের এই সময়কার রিনাইসেন্স, আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সুমহৎ সৃষ্টি, আমাদের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের গৌরবময় প্রচেষ্টা। তবু কিন্তু বলতে হবে, যে-কথাটি এ সবের মধ্যেও সুস্পষ্ট হয়নি তা এই যে, ভারতের মুক্তিসংগ্রাম সেই সিপাহী বিদ্রোহের দিন থেকে বাঙলার স্বদেশী আর বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অবশেষে বোম্বাইর নৌ-সেনা বিদ্রোহ ও মজদুর হরতালের মধ্যে পৌঁছে যে-অনিবার্য পরিণতির

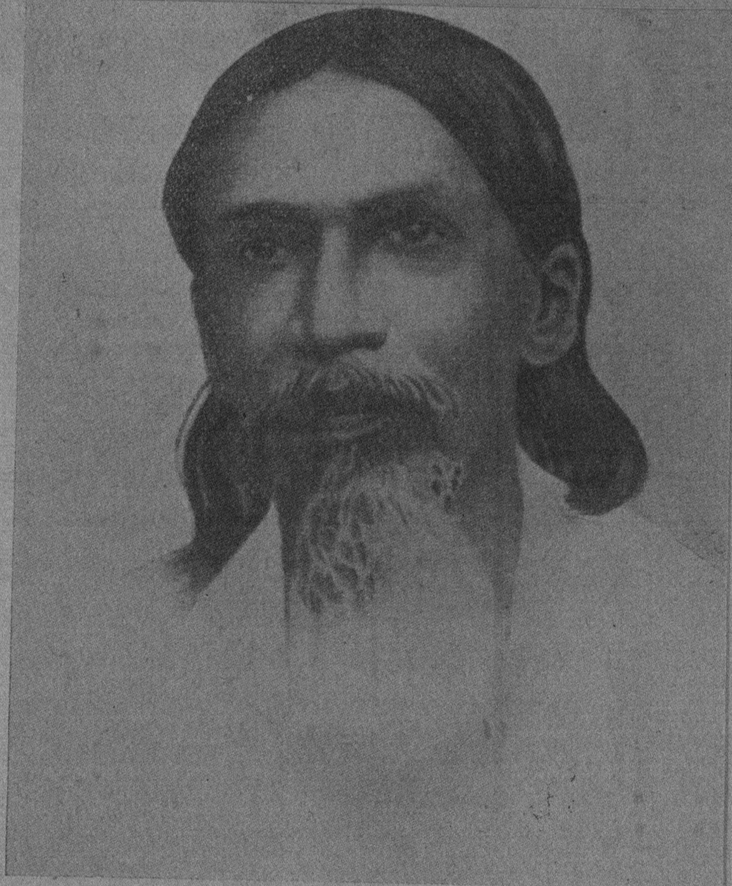


স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথ

ইঙ্গিত দেয়, তা ওরূপ ইতিহাস পর্যালোচনায় "পাকিস্তানী" বা "উদারনৈতিক", বা "জাতীয়তাবাদী" দৃষ্টিভঙ্গির নিকট তত্টা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

বুঝবার মত কথা তাই এই—ভারতের মুক্তিসংগ্রাম শুধু এঁদেরই সৃষ্টি নয়, সৃষ্টি ভারতীয় বিপ্লবী কর্মী দরও; আর তাই সে-সংগ্রাম আবদ্ধ থাকবে না শাসনতান্ত্রিক নীতির বাঠামোতে। বারে বারে তার নেতৃত্ব থেকে বিদায় নিয়েছে ধনী-মধ্য-শ্রেণীর দল, বারে বারে তার নেতৃত্ব পুনর্গঠিত হয়েছে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ভিত্তিতে, জনতার দাবীকে কেন্দ্র করে, জনশক্তিকে আশ্রয় করে। অর্থাৎ ভারতের মুক্তিসংগ্রাম হচ্ছে ভারতীয় জনতার এই ক্রম-শক্তির ও ক্রম-মুক্তির ইতিহাস।—আর তাই ১৯৪৮এর জুনের দিকে তাকিয়ে যদি নেতৃবর্গ তাঁদের বুদ্ধিকে শান দেন তর্কের জন্য, বন্দুককে উঁচিয়ে তোলেন জনশক্তির বিরুদ্ধে, কাশ্মীরে, হায়দ্রাবাদে, গোলডেন রকে, অন্ধ্রদেশে, বাঙলার গ্রামে-গ্রামে, তাহলে তাঁরা নিজেদেরই বিদায়ের দিন ঘোষণা করবেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর হাতেও নিজেদেরই পরাজয়কে করে তুলবেন অবশ্যম্ভাবী।

এই দৃষ্টিতে এই মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের দিকে তাকালেই আবার বুঝব—দিন দিনে "মুক্তি" ভারতীয় মনে কি-অর্থ গ্রহণ করেছে। যেদিন মুক্তি ছিল শুধু জোর "greater association of Indians in the administration of India"—কোথায় সে দিন? কোথায় সে দিন মুক্তির অর্থ ছিল যখন Self Government কিংবা Home Rule, কিংবা substance of independence? কোথায়ই বা থাকবে এদিন যখন মুক্তির অর্থ হচ্ছে হায়দ্রাবাদে নিজামের রাজত্ব, কাশ্মীরে রাজত্ব ডোমিনিয়নের? কোথায় বা থাকবে এদিন যখন স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে বিদেশী ও দেশীর সহযোগিতা, ইম্পীরিয়াল কেমিক্যাল-টাটা সমবায়, কিংবা ইঙ্গ-মার্কিন-ভারতীয় ধনিকতন্ত্রের ভারত-শোষণ? মুক্তিসংগ্রাম যেমন



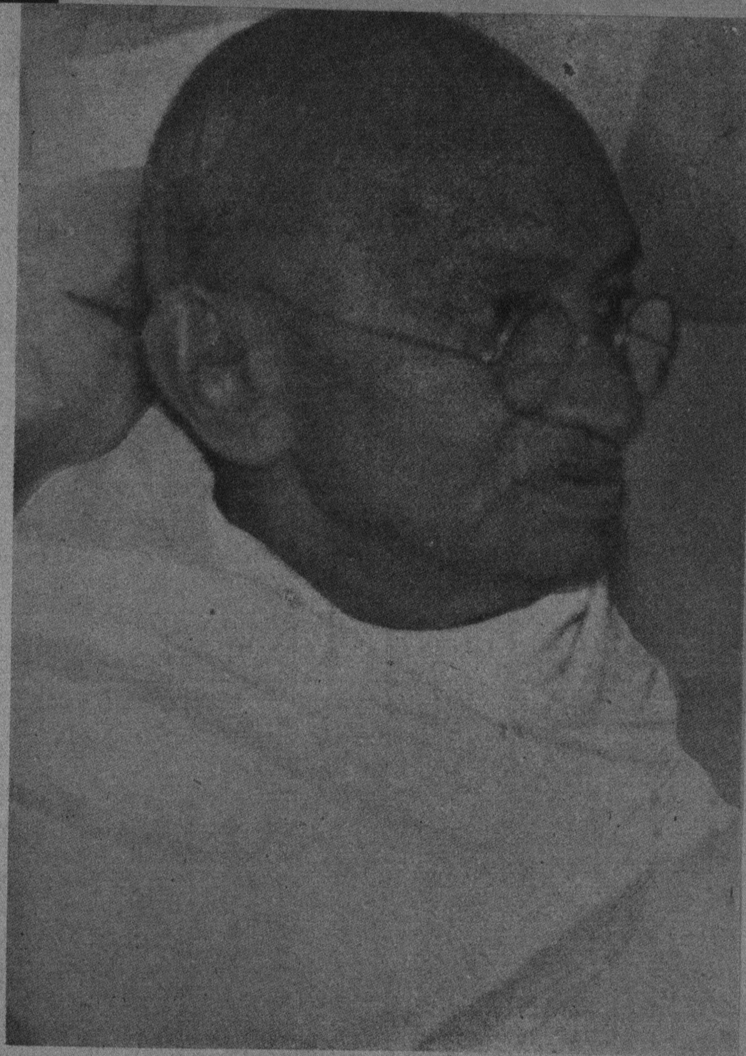
অরবিন্দ ঘোষ

অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে মুক্তিরও রূপ তেমনি সুস্পষ্ট হচ্ছে—মুক্তির অর্থ আজ শুধু শাসনযন্ত্রের হস্তান্তর নয়,—জনশক্তির রাষ্ট্রাধিকারে জাতীয় আর্থিক সামাজিক সমস্ত শক্তির বৈপ্লবিক রূপান্তর। সে-মুক্তি সম্ভব জনশক্তির দমনে নয়, আপোষ-রফায় নয়, গণবিপ্লবে।

ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের সেই বৈপ্লবিক লক্ষ্য ও অধ্যায়েরও রূপ ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে আজ চরম পরিণতির অপেক্ষা করছে। আজ তা এক আঘাতে সার্থক হতে পারে, অথবা নানা প্রতিঘাতে সাময়িকভাবে ব্যর্থও হয়ে যেতে পারে।

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বিপ্লবী ভূমিকা ও বিপ্লববাদী ধারাকে যথোচিত মূল্য দেবে, আর বৈপ্লবিক মুক্তি-চেতনার ক্রম-প্রকাশকে যথারূপে নির্দেশ করবে, এমন গ্রন্থ আমরা এখনো বেশি পাই না। এরূপ গ্রন্থেরই কিন্তু প্রয়োজন আজ বেশি।—যদিও অনেক অপরিজ্ঞাত ঘটনাকে উদ্‌ঘাটিত করতে গিয়ে সেরূপ ইতিহাসে কম-বেশী ত্রুটি ঘটবারও সম্ভাবনা আছে। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অনাদি পালের এই গ্রন্থেও তেমনি ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। তবে তা ধর্তব্য নয়; ঐতিহাসিক বিচারে ক্রমেই তা বোঝা যাবে। কিন্তু যা পরিষ্কার তা এই: অনাদিবাবুর "ভারতের মুক্তিসংগ্রামে" সিপাহী বিদ্রোহ থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত মুক্তিসংগ্রামের বৈপ্লবিক ধারা যথার্থ গুরুত্ব লাভ করেছে,—অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ধারার সঙ্গেও তার মূল্য হয়েছে তুলিত ও নির্ধারিত।—বোধ হয় এসময়ে এই কথা বলাই যথেষ্ট; কারণ, এ প্রয়াস প্রায়-নতুন ও সাহসিক।

গোপাল হালদার



মহাত্মা গান্ধী

# নিবেদন

১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হই। এজাতীয় দুরূহ ও বিরাট কর্ম সম্পাদনে নিজেকে অযোগ্য মনে করিয়াছিলাম; এখনও যে মন হইতে উক্ত ধারণা দূর হইয়াছে এমন নয়। ইহা সত্ত্বেও ক্ষীণ আশা জন্মিয়াছে যে যাঁহারা আমাদের সমসাময়িক অথবা যাঁহারা ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের উত্তর-সাধক তাঁহারা গ্রন্থে উল্লিখিত প্রচলিত ও অনুদ্‌ঘাটিত কাহিনী এবং ঘটনা বিকাশের পটভূমিকা ও ধারা অনুধাবন করিয়া হয়ত কিঞ্চিৎ সন্তোষ লাভ করিবেন, হয়ত খানিকটা উপকৃতও হইবেন। এই ভরসাই আমাকে নিরন্তর উৎসাহ যোগাইয়াছে।

ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ হইতে মুক্ত থাকিবার দাবী করা যায় না; ছোটখাট ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়; পুনরাবৃত্তি দোষও একাধিক স্থানে ঘটিয়াছে। এমন কি বহু তথ্য সংযোজনার পরও মনে হইতেছে যে বহু কিছু লিখিবার ছিল; হয়ত পুরাতন ঘটনাবিন্যাসকালে খুটিনাটি বিষয় দৃষ্টি এড়াইয়াছে। কাজেই তথ্যাভিজ্ঞ পাঠক ও সহৃদয় সমালোচকদের দৃষ্টি আগেই এদিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিলাম। এ সম্পর্কে তাঁহারা সংশোধনযোগ্য যে-কোন বিষয় অথবা অনুল্লিখিত প্রামাণ্য ঘটনার প্রতি আমাকে অবহিত করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

গ্রন্থরচনায় পূর্বাচার্যদের ঋণ প্রথমেই সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি। যেসব বান্ধব ও হিতার্থী সুহৃৎ আমাকে সর্ববিধ সহায়তা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বন্ধুবর দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঋণ অপরিশোধ্য। তিনি সমধর্মী সহযোগী বলিয়াই নহে, তিনি আমার চিন্তায়ও অংশভাগী হইয়াছেন।



লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক

শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার মহাশয় গ্রন্থে বর্ণিত বহু তথ্যের উপর আলোকপাত করিয়া এবং ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক অমৃতবাজার সেনগুপ্ত এবং মণীন্দ্র নারায়ণ রায়ের সহিত কোন কোন বিষয় আলোচনায় লাভবান হইয়াছি। তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগতভাবে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক বিদ্যমান। এই হেতু তাঁহাদের প্রতি মামুলি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব না। "পুস্তকালয়" কর্তৃপক্ষ বিপুল আর্থিক ঝুঁকি লওয়ায় এবং নানাভাবে সহযোগিতা করায় পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হইল। তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি শুধু ধন্যবাদ জ্ঞাপনই যথেষ্ট নহে বলিয়া মনে করি। এছাড়া আরও যাঁহারা আমাকে ছোটখাট নানা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমার ধন্যবাদ জমা রহিল।

পরিশেষে একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। ১৯৬৬ সালের পূজার সময় পুস্তক প্রকাশের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পাণ্ডুলিপির শেষাংশ এবং পুস্তকের মুদ্রিত কয়েকটি ফর্মা ঘটনাচক্রে খোয়া যায়। উহার ফলে আমাদের সংশ্লিষ্ট সকলকে যথেষ্ট দুর্ভোগ ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। এইহেতু পুস্তক প্রকাশেও অযথা বিলম্ব ঘটিয়া গেল। অধিকন্তু, পুস্তকে নির্ঘণ্টসূচী দেওয়া সম্ভব হইল না এবং চেষ্টা করিয়াও মুদ্রাকর প্রমাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া গেল না; এরূপ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

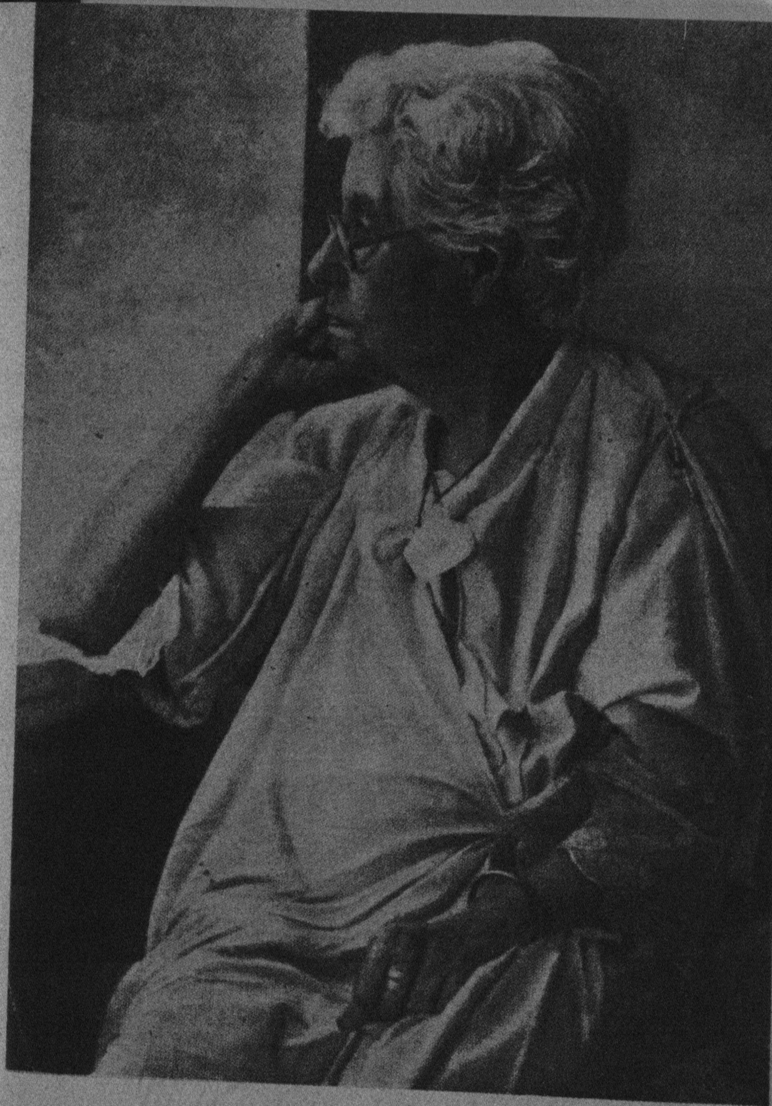
৫০, সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রন্থকার



বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী

# সূচীপত্র

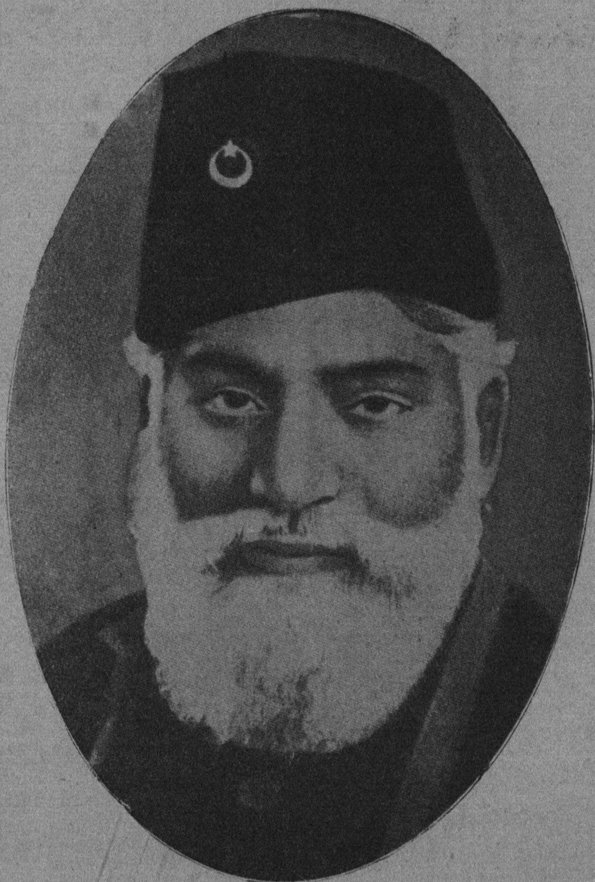


ডাঃ আনি বেশান্ত

মিঃ হিউমের উদ্দেশ্য—সরকারী ভেদনীতির সূচনা—দুই জাতির তত্ত্ব—মুসলমান রাজনীতি—কংগ্রেসে মত-সঙ্ঘর্ষ—কার্জনের ভেদনীতি—আন্দোলনের হেতু—প্রতিকারোপায়—বাঙালী জীবনে ভাব বন্যা—সাহিত্য, শিল্প ও রাজনীতিতে জোয়ার—জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জন—স্বাদেশিকতার প্রভাব—কার্লাইল সার্কুলার ও ছাত্রদলন—বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা—বরিশাল সম্মেলন—দলননীতি—মত-বিরোধ—বিপ্লব আন্দোলন—সরকারী নেকনজরে মুসলমান সম্প্রদায়—গবর্ণমেন্টের প্ররোচনা—মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কা—সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা—বিরোধের বীজ—বঙ্গভঙ্গ রদ—ভাঙ্গা বাঙলা জোড়া লাগিয়াছে কি? ফলাফল।

## (৫) বিপ্লব আন্দোলন:—১২০—১৯৫ পৃষ্ঠা

অস্ত্রবলে বিশ্বাসী বিপ্লবী দল—পুণায় দল গঠন—বাঙলায় সূচনা—সরকারী নির্যাতন—লাল বাল পাল—অনুশীলন ও যুগান্তর—অর্ধোদয় যোগ—বন্দেমাতরম্, নবশক্তি ও সন্ধ্যা—চরমপন্থা ও নরমপন্থী—সুরাট দক্ষযজ্ঞ—বোমা রিভলভারের তত্ত্ব—প্রথম বোমা বিস্ফোরণ—মানিকতলার বোমার কারখানা—আলীপুর মামলা—কানাই ও সত্যেনের ফাঁসী—সরকারী বেড়াজাল—নেতৃবর্গ নির্বাসিত—সন্ত্রাসবাদ—ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা—সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—রাজাবাজারে বোমা আবিষ্কার—বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা—১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে তৎপরতা—নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা—পশ্চিম ভারতে গুপ্ত আন্দোলন—সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়—বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপ—দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা—গদর আন্দোলন—কোমাগাতা মারু—সৈন্যদলে অসন্তোষ—রাসবিহারী, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি ও পিংলে—সর্বভারতে সৈনিক অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা—উদ্যোগ আয়োজন—অস্থায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থাপন—অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা—সরকারী পাল্টা আক্রমণ—ভারতরক্ষা আইন—

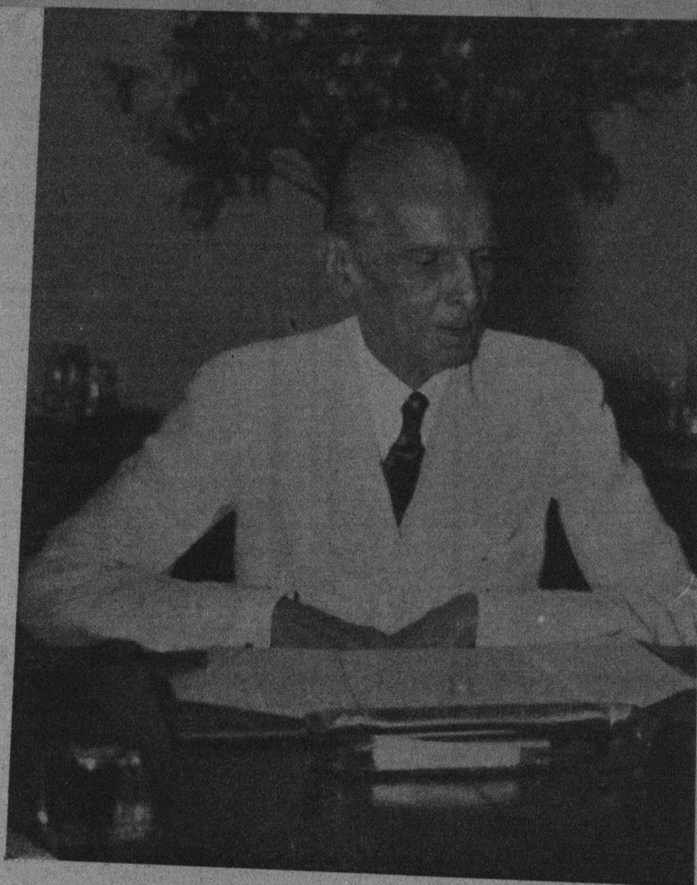


মৌলানা শৌকত আলী

---

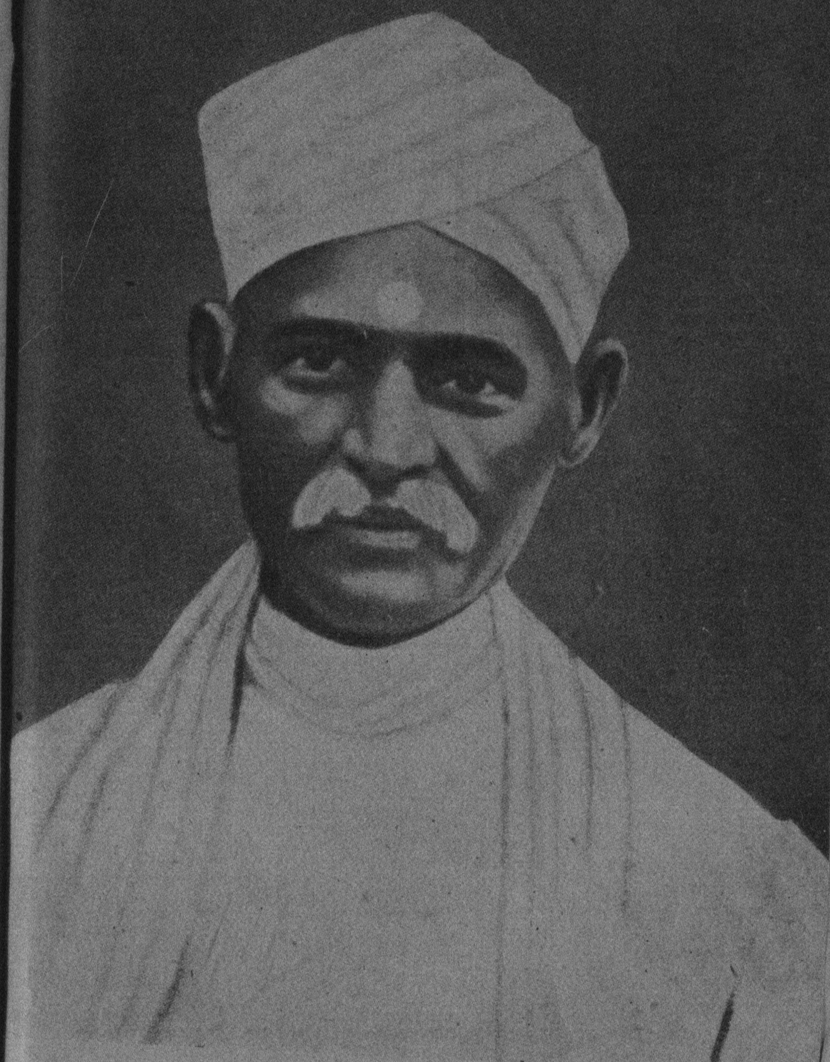


মৌলানা মহম্মদ আলী

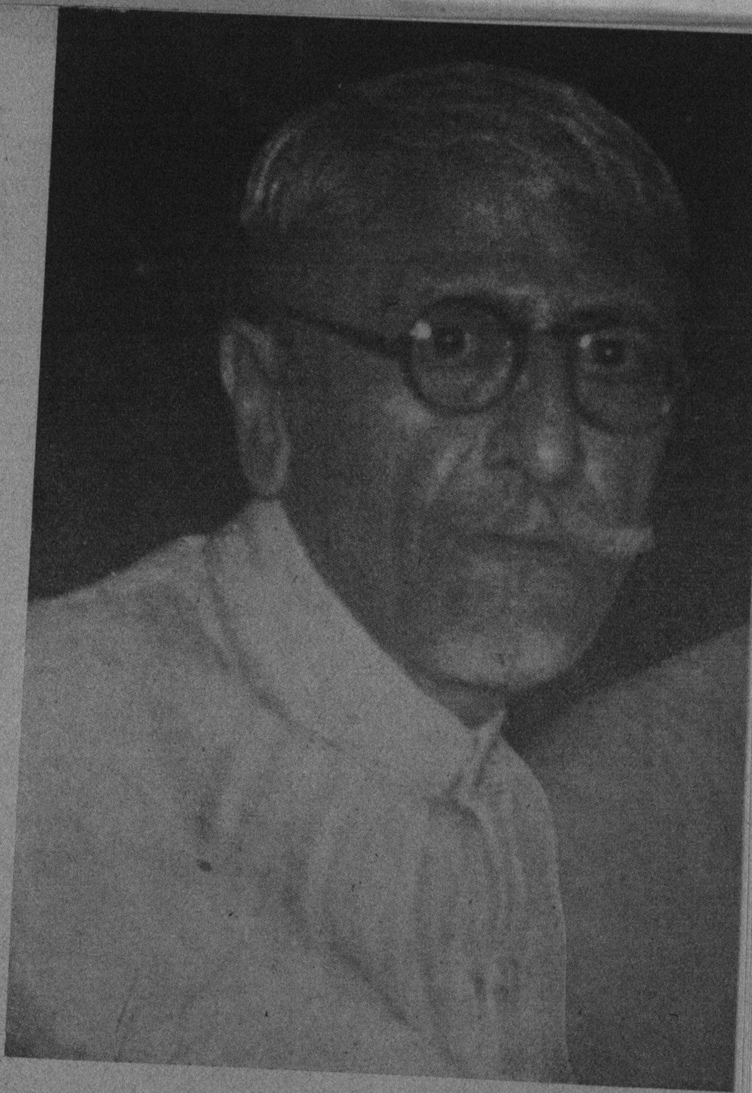


মহম্মদ আলি জিন্না

মা ও বাবাকে



পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়



আবুল কালাম আজাদ

# সিপাহী অভ্যুত্থান

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন। ঐদিন পলাশীর আম্রকুঞ্জে বাঙলার স্বাধীনতারবি অস্তমিত হয়। 'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।'

প্রথমদিকে এদেশে ইংরেজ বণিকের প্রতিষ্ঠাও ছিল না, তাহার স্বার্থও এখানে নিরাপদ ছিল না। ফরাসী ক্ষাত্রশক্তি তথনো নূতনভাবে ভারতে শিকড় গাড়িতে সচেষ্ট। কিন্তু ইংরেজ কূটবুদ্ধি ও সমরকৌশলের নিকট তাহাকে হার মানিতে হয়। এইভাবে ভারতের পূর্বসীমান্তে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয়; তাহাই আবার পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতে দণ্ডবিধাতারূপে মন্থরগতিতে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু 'খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত' বৈদেশিক শাসনের সর্বক্ষয়ী নিগ্রহকে একদিনেই স্বীকার করিয়া নেয় নাই; একদিনের জন্যও গ্লানিকর পরাধীন জীবনযাত্রা তাহার পক্ষে সন্তোষের কারণ হয় নাই। বন্ধন-মোচনের নিমিত্ত প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া জাতিবর্ণনির্বিশেষে ভারতবাসী পূর্বপুরুষদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় চিরাচরিত বাঁকা পথ ধরিয়া চলিয়াছে। ক্লাইভের শাসনকালে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভে বৃটিশ-শাসনের যে-অঙ্কুরোদ্গম হয়, হেস্টিংস তাহাই দৃঢ়মূল পাদপে পরিণত করিবার জন্য মারাঠা, হায়দরাবাদ, মহীশূর প্রভৃতির শক্তি সঙ্কোচ, যুদ্ধবিগ্রহ



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

চালাইবার জন্য অসঙ্কোচে রোহিলাদের উচ্ছেদ, কাশীর রাজা চৈৎসিংহ এবং অসহায়া অযোধ্যার বেগমদিগের উপর চূড়ান্ত জুলুমবাজি করে। শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে ইংরেজ বণিক অত্যাচার, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, বিশ্বাসহানি ও জুলুম দ্বারা প্রাধান্য লাভ করে। তখন হইতেই আরম্ভ হয় ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীন পরাধীনতার সূচনা—একদিকে চলে জবরদস্ত শাসন, অন্যদিকে চলে অবাধ শোষণ এবং দেশের ব্যবসায়বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ইংরেজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার উদ্যম। ইহার ফলে ভারতবাসীর মনে ইংরেজ-সদ্‌বুদ্ধি সম্পর্কে ঘোরতর ভীতি, সন্দেহ ও অবিশ্বাস গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের আমলে যে-চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তাহাদ্বারা ইংরেজ শাসনের দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হয়। এই ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব এবং পরোক্ষে কৃষিকুল ও জমির উন্নতিবিধান। অবশ্য ইংরেজ শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা প্রাথমিক লক্ষ্য হইলেও ইহার সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য ছিল অন্যবিধ। ইংরেজ শাসনের অনুচর হিসাবে এক নূতন অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি করাই ছিল ইহার আসল লক্ষ্য। বংশগত জমিদার ও প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব এইভাবেই হয়। বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়ায় যুদ্ধবিগ্রহ ও শাসন পরিচালনার ব্যাপারে কোম্পানীর বিস্তর সুবিধা হয়। কিন্তু ইহা দেশের পক্ষে আদৌ কল্যাণপ্রসূ হয় নাই। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপ দেশের সকল স্তরে মর্মান্তিকরূপে প্রকট হইয়া উঠে।

অবশ্য ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠা এত সহজে হয় নাই, তাহাও নিঃসন্দেহ। তবে একথাও স্বীকার্য, ক্লাইভের পরবর্তী ইংরেজ শাসকরা অনুকূল অবস্থার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করিয়া লইতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে নাই। এই হেতু তাহারা

তৎকালীন প্রভুত্বপ্রয়াসী মারাঠা এবং দাক্ষিণাত্যে মহীশূরের উচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নকরণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি তাঁহার পূর্ববর্তী বড়লাট স্যর জন শোরের নির্লিপ্ত থাকার নীতি পরিহার করেন। অন্যান্য সামন্ত শক্তির ক্ষমতা খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি এবং রাজ্যাধিকার ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া চলেন। বশ্যতা-মূলক মৈত্রী চুক্তি অনুযায়ী আশ্রিত রাজারা কোম্পানীর নিকট হইতে রাজ্যরক্ষার প্রতিশ্রুতি পাইলেন, কিন্তু বিদেশী শক্তির সহিত সন্ধি-বিগ্রহের স্বাধীনতা তাঁহাদের রহিল না। মারাঠাশক্তির ভয়ে ত্রস্ত হায়দরাবাদ সর্বপ্রথম ইংরেজ-আশ্রিত নৃপতিরূপে পরিগণিত হয়। এদিকে পিটের ভারতশাসন আইনের নির্দেশ অমান্য করিয়া ওয়েলেস্‌লি বহু ভারতীয় সামন্ত রাজ্য নানা অছিলায় কুক্ষিগত করিয়া ফেলেন। তিনি মারাঠাশক্তির ধ্বংস করিতে না পারিলেও উহাকে নির্জীব করিয়া ফেলিয়া ভারতে বৃটিশ শক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রশক্তিতে রূপান্তরিত করেন। এদিকে লর্ড মিণ্টোর আমলে পাঞ্জাবে শিখশক্তির অভ্যুত্থান ঘটিলে শিখরাজ রণজিৎ সিংহের সহিত সখ্যতা স্থাপনপূর্বক কোম্পানী নিজেদের পক্ষে সুবিধা করিয়া নেয়। লর্ড হেস্টিংসের শাসনকালে সিন্ধু, পাঞ্জাব, নেপাল ও আসাম ছাড়া ভারতের সর্বত্র বৃটিশ-প্রাধান্য স্থাপিত হয়। শুধু তাহাই নহে, একদিকে তিনি যেমন শিখদের সখ্যতালাভ করেন, অন্যদিকে তিনি তেমনি গুর্খাদের পরাজিত করিয়া সগৌলে সম্পাদিত সন্ধিসূত্রে কয়েকটি অঞ্চলের অধিকার লাভ করেন। নেপাল অভিযানকালে অযোধ্যা ইংরেজদের প্রধান সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী সিপাহী অভ্যুত্থানকালে ইহাই হইয়াছিল গুর্খাদের অযোধ্যা লুণ্ঠন ও অভিযানের কারণ। এদিকে তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে মারাঠা শক্তিকে (পেশবা, ভোঁস্‌লে ও হোলকার) ছিন্নভিন্ন করিয়া এবং রাজপুতদিগকে অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণে বাধ্য করিয়া

( রাজপুত সামন্তগণ মারাঠাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে ) তিনি ভারতে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সার্বভৌম প্রভুরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে যে-কূট ও ভেদনীতি স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহাতে ভারতীয় জনসাধারণ যেমন শঙ্কিত হইয়া পড়ে, তেমনি সম্পদ ও মর্যাদাভ্রষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধিতে থাকে।

বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট আসাম এবং ব্রহ্মদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ, লর্ড এলেনবরো সিন্ধু এবং লর্ড ডালহৌসী শিখদের মধ্যে গোলযোগ ও ষড়যন্ত্রের সুযোগ লইয়া দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে পাঞ্জাব বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন। তাহাছাড়া স্বত্বলোপ নীতি ( Doctrine of lapse ) প্রবর্তন করিয়া তিনি সাতারা, ঝাঁসী, 'নাগপুব প্রভৃতি সামন্ত নরপতিগণ অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে ঐসব রাজ্য কোম্পানীর শাসনাধীন করেন। পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওএর মৃত্যু হইলে তাঁহার পোষ্যপুত্র নানাসাহেবকে তাঁহার প্রাপ্য বৃত্তি হইতে বঞ্চিত কবা হয়। এদিকে কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা রাজ্য কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়। রাজ্যবিস্তার ও দেশ-শাসনে তিনি বৃটিশ স্বার্থরক্ষার পক্ষে স্তম্ভস্বরূপ বিবেচিত হইলেও ভারতবাসীর সংস্কার ও চিরাচরিত রীতিনীতি পদদলিত করিয়া তিনি যে দত্তকোচ্ছেদ নীতি অনুসরণ করেন, তাহাই সাধারণ ভারতবাসীর মনে নানারূপে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করে। ভারতবাসী বৃটিশ শাসনের ঘোব স্বৈব ব্যবস্থায় বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়ে ; ইংরেজশাসনেব আপাতমোহ ও জাক্‌জমক এবং আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চাকচিক্য নব্য ভারতীয়দের প্রলুব্ধ করিলেও সাধারণের মনে একটা বিজাতীয় ক্রোধের উদ্রেক করিতেছিল। প্রাচীন রীতিনীতি, ধর্ম, স্বত্ব ও সংস্কারের ক্রমিক লোপ দেখিয়া তাহাদের মনে আশঙ্কা নানাভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল ; তাহাই পরবর্তীকালে বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং উহা দেশব্যাপী বিপ্লবে পরিণত হয়।

## অভ্যুত্থানের হেতু

অভ্যুত্থানের একাধিক কারণ বর্তমান ছিল; বৈষয়িক, রাজনীতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক কারণ মিলিয়া এমন এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহার ফলে অভ্যুত্থান অনিবার্য হইয়া পড়ে। আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক ঘাতপ্রতিঘাতে সমুদয় অবস্থা সমস্যাসঙ্কুল ও সঙ্কটজনক হয়। ১৮১৩ সালে ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের পর ভারতে সামাজিক ও বৈষয়িক বিপ্লব সূচিত হইতে থাকে। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের অর্থ ও শিল্পনীতি ভারতের প্রাচীন স্বয়ম্পূর্ণ গ্রাম্য ব্যবস্থা পিষিয়া মারিবার আয়োজন করে। ইহার প্রথম চোট ভারতীয় কৃষি কুলের উপর পড়ে; বিলাতী কারখানা-জাত মাল পাইকারীভাবে ভারতের বাজারে আমদানী হইবার সঙ্গে প্রাচীন গ্রাম্য অর্থনীতিক ব্যবস্থা ধ্বসিয়া পড়িতে থাকে। এদিকে নূতন ব্যবস্থাধীনে খাজনা আদায়কারীরা দেশের জমিদার শ্রেণীতে রূপান্তরিত হইতে থাকে। জমির উপর অতিরিক্ত পরিমাণ কর ধার্য করা হয়। কিন্তু ইহার ফলে কৃষকের দারিদ্র্য বাড়িয়াই চলে; এই হেতু জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাহারা মোটেই কোন চেষ্টা করেনা; আর তাহাদের এব্যাপারে কোনরূপ মাথাব্যথাও ছিল না। শতাব্দীব্যাপী অরাজকতার জন্য দেশের সেচ ব্যবস্থাও অবহেলিত হয়; কাজেই দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাব প্রায়শ ঘটিতে থাকে। এদিকে কৃষক ভূমিদাসে পরিণত হয়। নূতন অর্থবানরাই জমির মালিক ও চাষী হয়। অর্থই হইয়া উঠে সর্বস্ব: ফসল দ্বারা আর জমির খাজনা শোধ করার উপায় ছিল না। টাকার জন্য চাষীকে বাজারে ফসল বিক্রয় করিয়া দিতে হইত; কিন্তু ইহাতে দালাল ও মহাজনের হইল সুবিধা। কৃষিকুল বিপর্যস্ত হইল। কারুকরদেরও সুবিধা হইল না; বৃটিশ শিল্প ভারতীয় শিল্পজীবীদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নিল। কলকারখানাজাত

মালের প্রতিযোগিতায় কুটীরশিল্প ধ্বংসমুখীন হইতে চলিল; তাঁতিরা মাকু ও চরকা ছাড়িয়া চাষবাস ধরিল। ঢাকা প্রভৃতি স্থানের বস্ত্র উৎপাদনকারীদের দুর্দশার অন্ত রহিল না; কিছুটা প্রতিযোগিতায়, কিছুটা উৎসাহের অভাব ও বেশীরভাগ প্রভুশক্তির বিরূপতায় তাহারাও কৃষিতে মনোনিবেশ করিতে থাকে; কিন্তু ইহার ফলে জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। আবার জমির মালিকানা সম্পর্কেও নিশ্চয়তা ছিল না। যেকোন মুহূর্তে তাহা হস্তান্তরিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। অধিকন্তু, বোঝার উপর শাকের আটির মত কোম্পানীর কর্মচারীদের অত্যাচার ও দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষের গ্রাস, সশস্ত্র ডাকাত দলের উৎপাত, বৃটিশ বিচারপদ্ধতিতে সমদর্শিতার অভাব এবং জীবন ও ধনসম্পত্তি নাশের ভয় ত সারাক্ষণ লাগিয়াই ছিল। ইহা ছাড়া, বিক্ষিপ্তভাবে ছোটখাট বিদ্রোহও যে না হইত এমন নহে! পক্ষান্তরে কোম্পানীর মুদ্রানীতিও দেশবাসীর নিকট বিভ্রান্তকর বলিয়া গণ্য হয়। দেশে প্রচলিত মুদ্রার অপ্রাচুর্যহেতু ১৮২৫ হইতে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য নিম্নাভিমুখই থাকিয়া যায়। এদিকে ১৮৩৫ সালের আইনে ভারতে রৌপ্যমান প্রচলিত হওয়ায় সাধারণের উপার্জন ক্ষমতা কমিয়া যায়। মূলত ইংরেজী বৈষয়িক স্বার্থই ভারতীয় আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে: কোম্পানীর শাসন জাতীয় অধঃপতন দ্রুততর করিয়া তোলে। এইহেতু দেশবাসীও ইংরেজ বণিককে সকল দোষের আকর বলিয়া স্থির করে।

সিপাহী অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ কারণ, এনফিল্ড রাইফেল নামক নূতন বন্দুক ব্যবহারের প্রবর্তন। উহাতে পশু-চর্বি দ্বারা নির্মিত টোটা ব্যবহার করিতে আদেশ দেওয়ায় বহুদিনের ধূমায়িত অসন্তোষবহ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ে। বারাকপুরের সিপাহীদের মধ্যেই প্রথমে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং পরে তাহাই সমগ্র উত্তর ভারতে রাষ্ট্র-বিপ্লবের রূপ নেয়। অন্যান্য পরোক্ষ কারণের মধ্যে ভারতে প্রভুশক্তি

বলিয়া পরিগণিত শক্তিসমূহের উচ্ছেদসাধন বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। ডালহৌসীর সামন্ত রাজ্য গ্রাসের নীতি আপামর ভারতবাসীর মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া তোলে। অবশ্য সাধারণ ভারতীয়ের সহিত সামন্ত নৃপতিরা সমস্বার্থসম্পন্ন ছিল না বটে, তথাপি প্রাচীন সংস্কারবশে ভারতবাসী কি হিন্দু, কি মুসলমান,—সমুদয় রাজবংশের প্রতিই তাহাদের অত্যাচার সত্ত্বেও অন্ধ মমতা পোষণ করিয়া আসিতেছিল। স্থানবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম যে না ছিল, এমন নহে। তথাপি কোন রাজবংশের উচ্ছেদকে জনসাধারণ কতকটা নিজেদের অধিকার লোপ বলিয়া মনে করিত। ইহারই সুযোগ লইয়া রাজ্যহারা অনেক রাজবংশের দাবীদার চারিদিকে ইংরেজ অধিকার বিস্তার ও শাসননীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ বিস্তার করিতে থাকে। নবাব ওয়াজেদ আলীকে রাজ্যচ্যুত করায় অযোধ্যাবাসীরা ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে কোম্পানীর ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল আগ্রা ও অযোধ্যা অঞ্চলের অধিবাসী। দ্বিতীয়ত, কোম্পানীর শাসকগণ রাজ্যশাসনের অপরিহার্য ব্যবস্থা হিসাবে ক্রমশ সামাজিক-বিধানের পরিবর্তন ও রদমূলক অনেক বিধি প্রবর্তনে উদ্যত হয়। রাজ্যগ্রাস ও স্বত্বলোপ নীতি অনুসরণের ফলে সাধারণের মনে যে-ভীতির উদ্রেক হয়, তাহাই পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের সূত্রপাতে, সতীদাহ নিবারণ প্রচেষ্টায় (১৮২৯ সাল), সমাজ সংস্কার মূলক বিধি সৃষ্টিতে এবং ডালহৌসীর আমলে আভ্যন্তরীন শাসন সংস্কার অবলম্বনে ত্বরান্বিত হইয়া উঠে। ১৮১৩ সালের সনন্দ অনুসারে লর্ড হেস্টিংসের সময় জনসাধারণের শিক্ষার জন্য সরকারী তহবিল হইতে বার্ষিক একলক্ষ টাকা ব্যয়িত হইতে থাকে। কেরী ও মার্শম্যান নামক বিখ্যাত পাদ্রীদ্বয় শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন করেন। ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তির চেষ্টায় ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। বাঙলার শিক্ষাবিস্তারে ও পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রচারের ইহাই ছিল কেন্দ্রস্থল। এদিকে ১৮৩৫ সালে

কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। পূর্তবিভাগ সৃষ্টি, রেলপথ নির্মাণ, টেলিগ্রাফ প্রবর্তন ও অল্প মাশুলে পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা তাঁহার শাসনকালে সর্বপ্রথম হওয়ার গৌরব তিনি করিতে পারিলেও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হওয়ায় এবং ধর্মান্তর গ্রহণের জন্য কাহাকেও পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে না বলিয়া আইন প্রণীত হওয়ায় জনসাধারণ তৎকালীন পারিপার্শ্বিকে স্বাভাবিক ভাবেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। একদিকে স্থায়ী স্বত্বলোপের শঙ্কা, অন্যদিকে জাতি ও ধর্মনাশের ভয় তাহাদের পাইয়া বসে। অবশ্যই বৃটিশ শাসকদের আচরিত নীতি সাধারণ স্বার্থের বিশেষ প্রতিকূল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও নিঃসন্দেহ। শিক্ষা-বিস্তার, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতির সঙ্গে যুগপৎ তাহারা খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারেও উৎসাহ দিবার নীতি প্রবর্তন করে এবং ভারতে মিশনারী-প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্য ভাবধারাই শুধু নহে, ইংরেজনকলনবীশ সৃষ্টিরও মূলকেন্দ্রে পরিণত হয় এদিকে ১৮৫৪ সালে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি স্থাপনের পরিকল্পনামূলক শিক্ষাবিষয়ক আজ্ঞাপত্র রচিত হয় এবং ডালহৌসীও সুযোগের সদ্ব্যবহার কল্পে অবিলম্বে শিক্ষাবিভাগ গঠন করিয়া প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার পরিবর্তে নূতন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের উদ্যোগ করেন। কিন্তু যিনি রাজ্যগ্রাস ও স্বত্বলোপনীতির জনক, ভারতীয় মানসিকতা ও সংস্কৃতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনমূলক ব্যবস্থা এবং শাসন-সংস্কার প্রবর্তন তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইলেও উহা ভারতীয়দের পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই; পক্ষান্তরে ইহাতে বৃটিশ শাসনের প্রতি সাধারণের বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ বাড়িয়াই চলে। সিপাহী অভ্যুত্থানের ইহাই হইল সাধারণ সামাজিক পটভূমিকা।

অবশ্য ইংরেজশাসনের প্রথমদিকেও যে ইতস্তত বিদ্রোহ না ঘটিয়াছে, এমন নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছিল না বলিয়া উহা

অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ১৮০৬ সালে ভেলোরের সিপাহীরা ধর্মীয় ও জাতিগত সংস্কারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শিত হওয়ায় বিদ্রোহী হইয়া বহুসংখ্যক ইংরেজের প্রাণনাশ করে; তবে সরকারী সতর্কতাব দরুণ তাহার বিস্তার ঘটে নাই। লর্ড মিণ্টোর (১৮০১—৯) আমলে ত্রিবাঙ্কুরে এবং ১৮০৯ সালে মাদ্রাজে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তাহা সহজেই দমন করা হয়। ১৮২৪—২৬ সালে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময় ভারতীয় সিপাহীদের ব্রহ্মদেশে পাঠাইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে তাহাদের সংস্কার ছিল এই যে, সেখানে গেলে জাতি ও ধর্মনাশ হইবে। তাহা ছাড়া বহির্ভাবতে যাওয়ার কথা তাহাদের ছিল না। এই কারণে কলিকাতার নিকটবর্তী বারাকপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। লর্ড আমহার্স্ট ইহা কঠোর ভাবে দমন করেন বটে; কিন্তু সিপাহীদের মনে অসন্তোষের ভাব রহিয়াই যায়। পরবর্তীকালে বারাকপুর হইতেই সিপাহী অভ্যুত্থানের সূচনা হয়।

সিপাহীদের অসন্তোষের অন্যান্য কারণও ছিল। তাহাদের ভাতা দেওয়া হইত না, চাকরিতে উন্নতির আশা ছিল না, ভ্রমণের ও পত্র লিখিবার সুবিধা দেওয়া হইত না; অবশ্য খৃষ্টান হইলে তাহদের হাবিলদার শ্রেণীতে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু সিপাহী অভ্যুত্থানের ব্যাপারে পটভূমি ছিল উহাব চেয়েও ব্যাপকতর ও বৃহত্তর। আন্তর্জাতিক গুরুত্বও ইহার কাল অনুযায়ী কম ছিল না। তৎকালে য়ুরোপে রাশিয়ার সহিত বৃটেনের যুদ্ধ চলিতেছিল। এই হেতু ভারতে বেশী ইংরেজ সৈন্য রাখা সম্ভব ছিল না; চীনদেশেও বৃটিশ আধিপত্যস্থাপনের প্রয়াস চলিতেছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংরেজ-বিরোধী রুশদের সাফল্যে সিপাহীদিগের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। তাহারা মনে করে যে, সংখ্যালঘু ইংরেজ সৈন্যকে একটি মাত্র প্রচণ্ড আঘাতে নিশ্চিহ্ন করিয়া শাসন ব্যবস্থা হস্তগত করা যাইবে। তখন ভারতে ৪০ হাজার

ইংরেজ ও ২ লক্ষ ১৫ হাজার ভারতীয় সেনা ছিল। কাজেই আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্রে বৃটিশের মর্যাদা-প্রতিষ্ঠার প্রশ্নও যেমন জড়িত ছিল, তেমনি ভারতে সিপাহী অভ্যুত্থানে তাহাদের অস্তিত্ব-সঙ্কটও ঘটিয়াছিল। ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চিরতরে লোপ পাইত; প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে উহার মর্যাদাও কোনকালে প্রতিষ্ঠিত হইত না। বস্তুত ভারতের অভ্যুত্থান স্বতই ইংল্যাণ্ডের জীবন-মরণের প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়।

মোগলসাম্রাজ্যের পতন, মারাঠারাষ্ট্র-স্থাপনে অসাফল্য এবং শিখরাজ প্রতিষ্ঠায় আশাভঙ্গ জনসাধারণের মনে হতাশা ও শাসনব্যাপারে বিশৃঙ্খলা আনিয়াছিল। ইংরেজ-শাসন সুশাসনের প্রতিশ্রুতি লইয়া নিজের প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী হইলেও তাহা কয়েকজন ইংরেজ শাসকের অহেতুক জবরদস্তি-মূলক ব্যবস্থার ফলে ভারতীয়দের সহানুভূতি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়।

ডালহৌসীর পরবর্তী বড়লাট লর্ড ক্যানিং সুশাসনে উদ্যোগী হইয়া ১৮৫৬ সালে ভারতে আগমন করেন: কিন্তু পূর্বগামীদের অনাচার মুছিয়া ফেলিবার মত কোন ব্যবস্থা করিবার আগেই ভারতীয়দের মধ্যে অভ্যুত্থানের লক্ষণ প্রকট হইয়া উঠে। ভারতের রাজপ্রতিনিধি মনোনীত হইবার পর তিনি কর্তৃপক্ষকে এই বিষয় জানাইয়াছিলেন; কিন্তু শাসকের ঔদ্ধত্যবশে বিজিত জাতির মনোভাবকে তৎকালে কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড উপেক্ষা করাই শ্রেয় বোধ করে। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার ভিত্তি হইল শাসিতদের মনোভাবের প্রতি এই নিদারুণ উপেক্ষা।

বৃটিশ শাসনব্যবস্থা শাসিতদের ধর্ম ও আচারবিচারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করিবার নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় না। 'শান্তিপূর্ণ বিপ্লব' ঘটানই হইল তাহাদের নীতি। কিন্তু লক্ষ্যের বিষয় এই যে এক্ষেত্রে প্রথমেই সৈনিকশ্রেণীর মধ্যে বৃটিশ-কূটনীতির খেলা প্রকট হইয়া উঠে। এই সম্পর্কে

মিঃ নোলান লিখিয়াছেন—'গবর্ণমেণ্ট সৈনিকদের ধর্মীয় সংস্কারে আঘাত করিতে থাকে। বিদ্রোহ না ঘটাইয়াও এইসব সংস্কারে হস্তক্ষেপ করার দৃষ্টান্ত শ্রুতিগোচর হইতে থাকে।' (১) ১৮৫৭ সালের ২২শে জানুয়ারী দমদমের ১০ম ভারতীয় সিপাহীদলের ক্যাপ্টেন রাইট বলেন যে, "কার্তুজে চর্বি-ব্যবহার সম্পর্কে ডিপোয় অবস্থিত সিপাহীদের মধ্যে অস্বস্তিকর মনোভাব দেখা দেয়। কোন কোন দুষ্টপ্রকৃতির লোক এই মর্মে গুজব রটাইতে থাকে যে, টোটায় যে-চর্বি ব্যবহার করা হইবে তাহা শূকর ও গরুর।"

১৮৫৮ সালের ৭ই জুন পার্লামেণ্টের জনৈক সদস্য ভারত সম্পর্কে আলোচনায় বলেন—"ভারতীয়দের প্রতি আমাদের তরুণ অফিসারদের আচরণ নির্দয় ও নিপীড়নমূলক বলিয়া মিঃ রীস তাঁহার 'ন্যারেটিভ-এ' বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহার মতে শ্বেতাঙ্গরা সাধারণত ভারতবাসীর আচার ও সংস্কার সম্পর্কে অল্পই খবর রাখে অথবা তাহারা আদৌ কোন খোঁজ রাখে না। * * * মিঃ ফ্রেজার বলেন যে, জনসাধারণ সাধারণতই অসন্তুষ্ট এবং তাহার কারণও আছে। তাঁহার মতে এক ডজন বিপ্লব ঘটার মত ভারতে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। সিভিল সার্ভিসেব উপকারের জন্য ভারতকে শোষণ করার যে-নীতি চালু আছে তাহাই সকল দোষের আকর।" (২) 'ইস্পাত কাঠামো' সিভিল সার্ভিস ( steelframe ) যে তখনও নিন্দনীয় ছিল, তাহা এই প্রসঙ্গে সত্যই লক্ষ্যের।

সিপাহী অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী বৃটিশ শাসন ভারতীয়দের নিকট সর্ববিষয়ে ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। বৈষয়িক দিক হইতে ভারতীয় বহির্বাণিজ্য ত লোপ পায়ই, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও বৃটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন হয় এবং তাহা বৃটিশ মালের প্রতিযোগিতায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। সামাজিক দিক হইতেও ভারতীয়

---

(১) ১৮৫৮ সালের ৭ই জুন মিঃ ড্রামণ্ড এর প্রদত্ত বক্তৃতা।

(২) History of the British Empire vol II pp 706.

সংস্কার ও আচারপদ্ধতির প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলা প্রদর্শিত হইতে থাকে ; ধর্মের দিক হইতে খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা পাইতে থাকে। ইংরেজ শাসনের প্রথম তিক্ত স্বাদ যাহারা পায় তাহারা ঘোর বৃটিশবিরোধী হইয়া পড়ে। কাজেই পূর্ব হইতেই বিপ্লবের উপযোগী মাল-মশলা প্রস্তুত হইয়াছিল। চর্বিযুক্ত টোটা ব্যবহারের প্রচেষ্টা একটা উপলক্ষ মাত্র।

চিন্তানায়ক ও দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত মত ব্যক্ত করেন—'ওয়ারেন হেস্টিংস বলেন, "আমাদের আগমনের সংবাদ পাইবামাত্র অধিকাংশ ক্ষুদ্র সহর ও সরাইএর লোকজন পলাইয়া যাইত। বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল কর্তৃপক্ষের আচরিত নীতি। সামন্ত নরপতিদিগকে একের বিরুদ্ধে অন্যকে লাগান হইত। দুইয়ের মধ্যে বিজয়ী সামন্তকে আবার তথাকথিত অসদাচরণের জন্য সিংহাসনচ্যুত করা হইত। * * * আশ্রিত নরপতিদিগের নিকট হইতে অতিরিক্ত কর আদায় করিয়া তাহাদের কপর্দকশূন্য করা হইত এবং কর দিতে অপারগ হইলে তাহাদের পদচ্যুত করা হইত। * * এখন পর্যন্ত লবণের একচেটিয়া অধিকার এবং নির্মম করআদায় ব্যবস্থা বলবৎ রহিয়াছে। এখন পর্যন্ত স্থানীয় সৈন্য দ্বারা ভারতের পরাধীনতা কায়েম রাখা হইতেছে। * * * কিছু কাল আগেও একদল সিপাহী উপযুক্ত পরিচ্ছদবিহীন অবস্থায় মার্চ করিতে গররাজি হইলে তাহাদের হত্যা করা হয়। এখনও পুলিশ কর্তৃপক্ষ ধনীদের সহিত যোগসাজসে গরীবদের নিকট হইতে বলপূর্বক অর্থ আদায় করিয়া থাকে।" (৩)

---

[ ১, ২ (১১ পৃঃ) ও ৩—Rise of the Christian Power in India—By Maj. B. D. Basu হইতে সংকলিত।

(৩) Social Statics.

## প্রথম সূচনা বারাকপুরে

১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাস। বিপ্লবের কোন প্রকার পূর্বসূচনা নাই; সিপাহীরা শান্ত ও অনুরক্ত; তাহাদের রাজানুগত্য সন্দেহাতীত। শীতকালের প্রথমদিক এইভাবে অতিক্রান্ত হইল।

সহসা প্রশান্ত দিগন্তে কালমেঘ দেখা দিল। সরকার-বিরোধী বিশেষত সম্পদহারা ও মর্যাদাভ্রষ্ট ব্যক্তিরা প্রচার করিতে থাকে যে, খৃষ্টধর্মী প্রভুশক্তি সিপাহীদের জাতি ও ধর্মনাশে প্রবৃত্ত। প্রচার একেবারে অমূলক ছিল না; এই হেতু তাহা বিশেষ কার্যকরও হয়।

এতদিন সিপাহীবা ব্যবহার করিত 'ব্রাউন বেস' নামক বন্দুক। এইবার উহার পবিবর্তে প্রবর্তিত হইল উহার চেয়ে বেশী দুবপাল্লার বন্দুক 'এনফিল্ড গান'। কিন্তু চর্বিযুক্ত টোটা ছাড়া উহার ব্যবহার চলিত না এবং উহা দাঁতে কাটিযা বন্দুকে ভরিতে হইত। সিপাহীরা শুনিল, এই টোটা মুসলমানদের অস্পৃশ্য শূকর এবং হিন্দুদের অস্পৃশ্য গরুর চর্বিতে প্রস্তুত।

এই সময় বারাকপুর (কলিকাতার ৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত) নূতন বন্দুকের ব্যবহার শিক্ষার অন্যতম ঘাঁটি নির্বাচিত হয়। ঐ স্থানের সেনাবারিকে ১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে নিম্নবর্ণের এক লস্কর জনৈক ব্রাহ্মণ সিপাহীর নিকট জলপানের লোটা চায়। কিন্তু বর্ণাভিমান দেখাইয়া লোটা দিতে অস্বীকার করা হইলে উক্ত লস্কর বিদ্রূপ করিয়া বলে,—সব এক হইয়া যাইবে। গরু ও শূকরের চর্বিতে নির্মিত টোটা ব্যবহার করিতে হইবে। কোম্পানীর রাজত্বে জাতিবিচার থাকিবে না।

কথা দ্রুত ছড়াইয়া পড়িল। ধর্মনাশা সরকারের বিরুদ্ধে সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ভেলোরে গোলটুপী পরিধানের বিরুদ্ধে হিন্দু

হারায়। মোগল পাঁড়েই সিপাহীদের মধ্যে প্রথম বিদ্রোহী। কিন্তু তৎকালে তাহার দলের অন্যান্যের বিচার হয় নাই। পরে ৪ঠা মে উহাদের নিরস্ত্র ও বিতাড়িত করা হয়। নিরস্ত্র সেনাদের মধ্যে ৫ শত অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণ ও রাজপুত উত্তেজিত অবস্থায় নিজেদের বাসভূমির দিকে প্রস্থান করে। ইহাদের পদচ্যুতি ও আগমনে গুজব পল্লবিত হইয়া উঠে এবং অযোধ্যায়ই প্রথমে সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

এই সময় নানাসাহেব লক্ষ্ণৌতে ছিলেন। ইহাতে লক্ষ্ণৌয় একদল সিপাহীর উপর কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। কিন্তু গুরুতর প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় তাহাদের স্থানান্তর করা হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও ১৫ দিন পূর্বেও যেসব সিপাহীদলে কোনরূপ বিকার ছিল না, তাহাদের মধ্যেও চাঞ্চল্য ঘটে। সেনাদের নিজেদের মধ্যে গোপনে পত্র চালাচালি হইতে থাকে। ইহাতে অযোধ্যার শাসনকর্তা স্যর হেন্‌রী লরেন্স অস্থির হইয়া উঠেন এবং সিপাহীদের নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হন। এই হেতু ৫০ জন মাথাওয়ালা সিপাহীকে কারারুদ্ধ করা হইল। গোলযোগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য কমিটিও গঠিত হইল; অথচ কারণ জানা গেল না।

বাহ্যিক প্রশান্তি দেখিয়া অভ্যুত্থানের কোন চিহ্নই বুঝা গেল না। কিন্তু ৭ই মে ৪৮নং সিপাহী দলের সেনাবারিক অগ্নিদগ্ধ হয়। ৯ই মে স্যর হেন্‌রী সিপাহীদের অসন্তোষের কারণ জানিয়া লর্ড ক্যানিংকে চিঠি দেন। ঐদিনই আবার তিনি সীমান্ত প্রদেশের লেঃ-গবর্ণর কলবিনকে ভারতের দুর্গসমূহের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করেন।

মীরাটের ৫ম অশ্বারোহী সেনাদের কঠোর দণ্ড লাভে অন্যান্য সিপাহীদের স্ব স্ব ভবিষ্যৎ ভাগ্য মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠে। অধিকন্তু অস্থিমিশ্রিত ময়দার কাহিনী, অপবিত্র টোটা ব্যবহারের ও নিরস্ত্রীকরণের জনরবে তাহারা দ্রুত-বিদ্রোহী হইয়া উঠে।



নানা সাহেব



ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

পলাশীর পরবর্তী একশত বছর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রায় নির্বিঘ্নেই শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। কিন্তু সিপাহী অভ্যুত্থানেই তাহাদের প্রথম অস্তিত্ব-সংশয় হয়। প্রথমে মীরাট হইতে দিল্লী এবং দিল্লী হইতে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে বিদ্রোহাগ্নি ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং একদিকে বিপদ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নানা স্থান হইতে সেনা সংগ্রহ করিতে থাকেন এবং অন্যদিকে জনসাধারণের মন হইতে জাতি ও ধর্মনাশের আশঙ্কা দূর করিবার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে রচিত এক ঘোষণাপত্র সেনাবারিকসমূহ ও সাধারণ্যে প্রচারিত হয়। অধিকন্তু, প্রভুভক্তদের পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। এত করিয়াও কিন্তু বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় নাই।

১০ই মে প্রাতে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকট হয়। ঐদিন ভৃত্যেরা শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের পরিচর্যায় বিরত থাকে। হাটে-মাঠে-বাটে সকলের মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে জনতা আসিয়া উত্তেজিত সিপাহীদের দলপুষ্টি করিতে থাকে; সায়াহ্ন ৫টার কিছু আগে ঘোড়সওয়াড় দল মীরাটের ৮৫ জন কারারুদ্ধ সঙ্গীকে উদ্ধার করে; কিন্তু তাহারা অপরাপর কয়েদীকে মুক্তি দেয় নাই বা অন্যকিছু ক্ষতিও করে নাই।

৩নং ঘোড়সওয়াড় দলের সহিত মীরাটের পদাতিক সেনারাও রণোন্মত্ত হইয়া উঠে। ঐদিন য়ুরোপীয় সেনাবারিকে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহা শ্বেতাঙ্গ বাসগৃহে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু সিপাহীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বা নেতৃত্বের অভাব লক্ষিত হয়। অভ্যুত্থানের সঙ্গে একটি মাত্র লক্ষ্য 'দিল্লীর' দিকে তাহারা বিক্ষিপ্তভাবে রওনা দেয়। অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ সেনা বা সমরশক্তি নির্মূলের দিকে তাহাদের লক্ষ্য আদৌ ছিল বলিয়া মনে হয় না।

একদা দিল্লী হিন্দু ও মুসলমান প্রভুশক্তির কেন্দ্রস্থল ছিল। ইংরেজ-প্রাধান্যে ইহা হৃতগৌরব ও মর্যাদাহীন হইলেও সিপাহীদের নিকট তখনও উহা এক পতাকা, এক নেতা, এক সাধারণ স্বার্থ ও রাজশক্তির প্রতীক ছিল। কাজেই দিল্লী-দখলের সংগ্রামকে উহারা রাজশক্তি ও ক্ষমতা অধিকারের প্রয়াস বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। এমনকি অবস্থান্তর ঘটিলেও বৃদ্ধ মোগল সম্রাট সপ্ততিপর বাহাদুর শাহ সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যে প্রভুশক্তির হস্তান্তর ঘটিবে বলিয়া সিপাহী বাহিনী ধরিয়া লইয়াছিল। তাহা ছাড়া, সামরিক দিক হইতেও ইহা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দিল্লী-দখলের অর্থ ছিল ৯ লক্ষ কার্তুজ, ২টি ট্রেন, বহু কামান, আটদশ হাজার মাস্কেট ও ১০ হাজার ব্যারেল বারুদ অধিকারে আসা।

## 'দিল্লী চল'

১৮৫৭ সালের কয়েকমাস অতীত হওয়ার পর দিল্লী ক্রমশ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। মোগলসম্রাটের শেষ অধিকার লোপ হওয়ায় মুসলমান সম্প্রদায় উত্তেজিত হয়। কিন্তু বাহাদুর শাহ তাহাদের উৎসাহিত করেন নাই, এমনকি বিদ্রোহের সময়ও নহে।

উপস্থিত উত্তেজনার কথা যথারীতি কর্তৃপক্ষের গোচর হয়। মার্চ মাসের মধ্যভাগে দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদে জনসাধারণের পক্ষে উত্তেজনাকর এক ঘোষণাপত্র টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। পারস্যের শাহের নামে উহা প্রচারিত হয়। এইরূপে দিল্লীর সিপাহীদের মধ্যে অশান্তির ঢেউ লাগে। এদেশীয় কোন কোন সংবাদপত্রেও এবিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হয়; কিন্তু তাহা

দ্ব্যর্থক ভাষায় বা রূপকে প্রচারিত হইতে থাকে যথা—ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট খবর আসিয়াছে যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কাশ্মীর গ্রহণ করা হইবে। এখানে কাশ্মীর অর্থে দিল্লীর অন্যতম তোরণ 'কাশ্মীর গেট' বুঝায়।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বেই প্রচার হইয়া পড়ে, ইংরেজরা ভারতে শতবর্ষ রাজত্ব করিবে ; অতঃপর ভারতের রাজবংশ অর্থাৎ মুসলমান বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে। সিপাহীদের দিল্লী পৌঁছিবার পূর্বে ইহাই ছিল দিল্লীর সাধারণ অবস্থা।

১১ই মে মীরাটের সিপাহীদের আগমনে দিল্লীতে বিশৃঙ্খল অবস্থার উদ্ভব হয়। দিল্লীর মুসলমান বাসিন্দা, তথাকার সাড়ে তিন হাজার সিপাহী এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গুজর নামক পশুচারী বেদে সম্প্রদায় নবাগত সিপাহীদের দলপুষ্টি করে। বিদ্রোহের স্বাভাবিক পরিণাম হিসাবে ঐস্থানের ইংরেজ কমিশনার ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ নিহত হয় ; খৃষ্টান মাত্রকেই অবাধে হত্যা করা হয়। ইংরেজের অসঙ্গত নীতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এমনি ভয়ঙ্করভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মোগলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম ও জাতিরক্ষাই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য বলিয়া সহরে ঘোষিত হয়। অথচ বাহাদুর শাহের ইহাতে হাত বা সম্মতি ছিল না, তিনি শুধু অভ্যুত্থানকারীদের নির্দেশমত কাজ করেন। বিপ্লবীরা তাঁহার নামে সমুদয় কাজ চালাইতে থাকে। তাঁহাকে সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হয়। দিল্লীর ইংরেজ সেনা যুদ্ধে সিপাহীদের নিকট পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ১৬ই মের পর নগরে আর কোন ইংরেজ অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু ভারতবাসীর সহায়তায়ই বহু ইংরেজ নরনারী ও শিশু অন্যত্র পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

এই সময় মীরাট, পিরোজপুর, ঝাঁসি, হিসার ও মথুরা, ফিলোর, জলন্ধর, রোটক ও নাসিরাবাদের সিপাহীরা ক্রমে ক্রমে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া তথাকার সিপাহীদের বল বৃদ্ধি করে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের অভ্যুত্থানকারী

সিপাহীদের লক্ষ্য হয়—'দিল্লী চল'; ইংরেজ শাসকশক্তিও তাই দিল্লী জয়ে কৃতসঙ্কল্প হয়।

দিল্লী প্রাচীরবেষ্টিত; উহার চতুর্দিকে ২৪ ফুট উচু ৭ মাইল পরিধিযুক্ত প্রাচীর। এখানে সিপাহীদের খাদ্য, সমরাস্ত্র ও গোলাগুলি ছিল প্রচুর; বিদ্রোহীদের সেনানায়ক পদে বৃত হইয়াছিলেন ছয় ফুট দীর্ঘ ৬০ বছর বয়স্ক ব্রিগেডিয়ার বখত খাঁ। আর প্রথম দিকে ইংরেজ পক্ষে সেনাপতি ছিলেন বার্ণার্ড। তাঁহার তাবে গুর্খা, শিখ ও শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধায় মিলিয়া ৮।৯ হাজার সৈন্য ছিল। কিন্তু উহাদের পক্ষে দিল্লী অধিকার করা আদৌ সহজ হইল না। অথচ ভারতের ইংরেজদের প্রথমে বিশ্বাস ছিল, দিল্লী পৌছা মাত্র তাহা অধিকৃত হইবে।

নানা কারণে ইংরেজদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়ায়। গ্রীষ্মে তাহাদের বহু সেনা বিসূচিকায় প্রাণ হারায়। এদিকে ১৯শে জুন সিপাহীরা ইংরেজ শিবিরের পার্শ্বভাগে আক্রমণ চালায়। অবস্থা দাঁড়ায়—ইংরেজরা দিল্লী অবরোধ করিয়াও অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে; আর আক্রমণোদ্যম সমস্তই থাকে সিপাহীদের হাতে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শতবর্ষ পরে ইংরেজ শাসন লোপ হইবে বলিয়া সিপাহীদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ১৮৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর শতবার্ষিকী। কাজেই ঐদিন সিপাহীরা প্রচণ্ডবেগে ইংরেজদের উপর ঝাপাইয়া পড়ে। ১১ ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধ হয়। তৎকালে ভারতের ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ রীড ইহার বর্ণনায় বলেন—'একসময় আমাদের পরাজয় ঘটিবে বলিয়া মনে হয়।' এদিকে সঙ্কট বুঝিয়া স্যর জন লরেন্স দ্রুত পাঞ্জাব হইতে সেনা ও সমরোপকরণ পাঠাইতে থাকেন। কর্ণালের রাজপথে অবস্থিত আলিপুরের নিকট ইংরেজদের প্রেরিত অর্থ আটকের চেষ্টা করিয়াও সিপাহীরা ব্যর্থকাম হয়। ইতিমধ্যে ৬ সপ্তাহে ২০ বার উভয় পক্ষে সঙ্ঘর্ষ ঘটে।

জুলাই মাস ইংরেজদের পক্ষে নিতান্তই দুর্দিন। কানপুর অবরুদ্ধ; লক্ষ্ণৌ আক্রমণে বিশৃঙ্খল এবং মধ্যভারত ও সীমান্ত প্রদেশ বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল। সিপাহীরা ইংরেজদের যোগাযোগ ও সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিতে বদ্ধপরিকর। ইহার মধ্যে আবার বর্ষণ সুরু হয়।

এমনিতর অবস্থায়ও ইংরেজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ;—দিল্লী পুনরুদ্ধার করিতেই হইবে। সঙ্কল্পে তাহারা অটল; কিন্তু সিপাহীদের তুলনায় বলহীন; চারিদিক হইতে প্রাপ্ত দারুণ দুঃসংবাদে তাহারা মানসিক শক্তিহীন; কিন্তু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রক্ষাকল্পে সুশৃঙ্খল প্রণালীবদ্ধ। এদিকে সিপাহীরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন মত ও দলানুবর্তী এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্তী। বিদ্রোহীদের নেতা বখত খাঁ'র নেতৃত্বও অনেকে মানিয়া নিতে পারে নাই। ঔষধ ও পথ্যের, খাদ্য ও পানীয়ের অভাব না থাকিলেও বিশৃঙ্খলার দরুণ প্রয়োজনের সময় তাহা পাওয়া যায় নাই। সর্বোপরি কেন্দ্রীভূত ও প্রণালীবদ্ধ তৎপরতার অভাব লক্ষিত হয়।

১৪ই জুন সসৈন্য ইংরেজ সেনাপতি নিকলসন দিল্লী পৌঁছেন। বিপদ বুঝিয়া ঐদিন সিপাহীরা আবার দিল্লী ও পাঞ্জাবের পথ অবরুদ্ধ করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করে। ফিরোজপুর হইতে দিল্লী অভিমুখে কামান আমদানী করা হইতেছে শুনিয়া বেরিলী ও নিমচের সিপাহীরা ১৮টি কামানসহ ইংরেজপক্ষের কামান অধিকারের জন্য যাত্রা করে। লুফৎগড়ে প্রবল বৃষ্টি ও কর্দমের মধ্যে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। কিন্তু বিপুল বীরত্ব প্রদর্শন সত্ত্বেও সিপাহীরা পরাজিত হয়। দিল্লীরক্ষার উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব ও দিল্লীর মধ্যে যোগাযোগ পথ বিচ্ছিন্ন করার সর্বশেষ চেষ্টাও এইভাবে তাহাদের ব্যর্থ হইয়া যায়।

প্রায় তিন মাস রণনিপুণ ইংরেজসৈন্যের (শিখ ও গুর্খাসহ) সমর-কৌশল ব্যর্থ করিয়া দিয়া সিপাহীরা প্রবল পরাক্রমে দিল্লী নিজেদের অধীন

রাখে। দিল্লী সিপাহীদের অধিকারে থাকায় উত্তেজিত জনসাধারণের ধারণা হয়, ভারতে ইংরেজশক্তির অবসান আসন্নপ্রায়।

এদিকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইংরেজদের নগর-অবরোধের উপযোগী কামানসমূহ পাঞ্জাব হইতে দিল্লী পৌঁছে। ইহা সত্ত্বেও আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্য দিল্লী পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই। কাশ্মীররাজ গোলাপ সিংহের প্রেরিত সৈন্য এবং পাঞ্জাব হইতে আমদানী সেনা ও সমরোপকরণ সহ সেনাপতি উইলসন সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকে দিল্লী অবরোধ করেন। সাড়ে ছয় হাজার ইংরেজ পক্ষীয় সৈন্য ( তন্মধ্যে ১২শত ইংরেজ ) ৩০ হাজার সিপাহীর বিরুদ্ধে সজ্জিত হয়। নগরের কাশ্মীর ও মুরী তোরণ লক্ষ্য করিয়া ইংরেজদের কামান হইতে প্রবলবেগে গোলা বর্ষিত হইতে থাকে এবং ইহার ফলে ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রাচীরের দুইস্থানে ভাঙ্গন দেখা যায়। পরদিন উহারই মধ্য দিয়া ইংরেজ সেনা নগরে প্রবেশ করে। সিপাহীরা অসামান্য পরাক্রম ও বিস্ময়কর রণকৌশল দেখাইয়াও তাহাদের নিরস্ত করিতে পারে নাই। অবশ্য দুইতিন স্থানে ইংরেজ সৈন্য পরাজিত যে হয় নাই এমন নহে।

যুদ্ধের গতি ইংরেজদের অনুকূল হইবার লক্ষণ যেই দেখা যায়, অমনি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার বাসনাও তাহাদের উগ্র হইয়া উঠিতে থাকে।

নগরীর কিয়দংশ অধিকৃত হইবার সঙ্গে দিল্লীর দোকানপাট লুণ্ঠিত হইতে থাকে এবং মাতাল ইংরেজ ও শিখ সৈন্য উন্মত্ততার পরিচয় দেয়। উহাদের সংযত করিবার জন্যই নাকি দিল্লীর যাবতীয় সুরা বিনষ্ট করা হয়; রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত ও সুরাময় হইয়া যায়। কিন্তু ইংরেজপক্ষের এই বিশৃঙ্খলার সুযোগও সিপাহীরা নিতে পারে নাই; নহিলে যুদ্ধের গতি ঘুরিয়া যাইত। এদিকে অতি সুকৌশলে আক্রমণমূলক রণপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ইংরেজরা ২০শে সেপ্টেম্বর লাহোর তোরণ, জুম্মা মসজিদ ও আজমীর তোরণ দখল

করিয়া নেয়। ঐদিন মোগল সম্রাটের রাজপ্রাসাদেও তাহাদের পতাকা উড্ডীন হয়। ইহাতে সিপাহীরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে।

যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে মোট ৩,৮৩৭ জন সেনা হতাহত ও নিরুদ্দেশ এবং ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

এইবার ইংরেজদের প্রতিহিংসা সাধনের পালা। ইংরেজ ও শিখ সৈন্য যথাক্রমে হত্যা ও লুণ্ঠনে মত্ত হইয়া উঠে। দিল্লী নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান স্থলে পরিণত হয়; ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ও স্বাধীনতালিপ্সার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নগরবাসীরা দুইদিন ধরিয়া নির্বিচারে আত্মাহুতি দেয়। ইতিহাসের গতিপথে ভারতে প্রভুশক্তির কেন্দ্রস্থল দিল্লী পুনরায় নর-শোণিতে কলঙ্কিত হয়। বাহাদুর শাহের পুত্রপৌত্রাদি নিহত হয়। দিল্লীর বর্তমান লাল কেল্লায় ইংরেজ সামরিক আদালতে ৪০ দিন ধরিয়া মোগল বাহাদুর শাহের বিচার-প্রহসন চলে। বিচারে তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন। শুধু তাহাই নহে; দিল্লীতে যাহারা জীবিত ছিল, লোকদেখান বিচারে অবাধে তাহাদের অনেককে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান হয়।

## ইংরেজ সাম্রাজ্যরক্ষী পাঞ্জাব

বাঙলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অভ্যুত্থান ঘটিবার সংবাদে পাঞ্জাবও দুলিয়া উঠে। মাত্র আট বছর পূর্বে এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ড শিখদের কবল হইতে ইংরেজের কুক্ষিগত হয়। এই হেতু তৎকালে পাঞ্জাবের নানা স্থানে বহু নিরস্ত্রীকৃত সেনা ছিল। তাহা ছাড়া শিখ, পাঠান, গুর্খা, পাহাড়িয়া, রাজপুত ও হিন্দুস্থানী মিলিয়া ২৬ হাজার সেনা সেনাবারিকে ছিল। ইহাদের সহিত উত্তেজিত সিপাহীরা মিলিত হইলে এবং ইংরেজ-বিদ্বেষী আফগানরা

আবার রাষ্ট্রভ্রষ্ট শিখদের সহিত যোগ দিলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের বাসস্থান বলিয়া পাঞ্জাব বৃটেনের পক্ষে পরিণামে অসুবিধার কারণ হয় নাই ; বরং পাঞ্জাবের সহায়তায়ই ভারতসাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে ইংরেজদের সুবিধা হয়। এই সময় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন স্যর জন লরেন্স। তাঁহার অবলম্বিত কূটনীতি ও তৎপরতার ফলেই পাঞ্জাব তথা ভারতবর্ষের সিপাহী অভ্যুত্থান সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই।

১০৫৭ সালের ১২ই ও ১৩ই মে মীরাট ও দিল্লীর ভয়াবহ দুঃসংবাদ লাহোর পৌঁছে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। লাহোরের সিপাহীদের নিরস্ত্র এবং অমৃতসর ও মীয়ামীর প্রভৃতি স্থানে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে ফিরোজপুরে সিপাহীদের ও উত্তেজিত জনতার অভ্যুত্থান ও আনুষঙ্গিক বিশৃঙ্খলা ঘটে। তবে উহার অব্যবহিত পর সিপাহীদের মধ্যে কেহ কেহ দিল্লীর দিকে ধাওয়া করে। ঝিলম ও শিয়ালকোটেও বিপ্লব ঘটে। ঝিলমে সিপাহীদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হইলে উভয় পক্ষে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তাহাতে ইংরেজ সৈন্যের পরাজয় ঘটে। এদিকে শিয়ালকোট, মীয়ামীর প্রভৃতি স্থানের সৈন্যরা বিদ্রোহ করিয়া কয়েক দল দিল্লীর দিকে রওনা দেয় এবং অনেক নিহত হয় ও ধৃত হইয়া ফাঁসিতে প্রাণ দেয়। ফিলোর ও জলন্ধরের বিদ্রোহী সৈন্যের কিয়দংশ দিল্লীর পথে লুধিয়ানা পৌঁছার পর ইংরেজদের সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। সিপাহীদের প্রচণ্ড দাপটে ইংরেজরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। ৯ই জুন সিপাহীরা লুধিয়ানা পৌঁছে। সেখানে কাবুলী ও কাশ্মীরীরাও অভ্যুত্থানে যোগ দিয়া চারিদিক বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও ভয়াবহ করিয়া তোলে। লুধিয়ানায় ইংরেজ শাসন কিছুদিনের জন্য লোপ পায়।

কথিত আছে, বহু দূরবর্তী স্থান হইতে মুসলমান মৌলবীরা ধর্মরক্ষার নামে পাঞ্জাবের সিপাহীদের নিকট পত্র লেখালেখি করিতে থাকে। ঐসব চিঠি ধরা

পরিবার পর কর্তৃপক্ষের চৈতন্য হয় এবং তাহারা অবিলম্বে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করে। এই উদ্দেশ্যে একদিকে সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হইতে থাকে, অন্যদিকে বিদ্রোহের বিস্তৃতি নিরোধ এবং সিপাহীদের দিল্লীগমনের পথরোধ করা হয়। এই ব্যাপারে দেশীয় সামন্তবর্গ অশেষরূপে ইংরেজের সহায়তা করে। বহু অভ্যুত্থানকারী গুলি, ফাঁসি ও কামানের গোলাতে নিঃশেষ হইয়া যায়। সিপাহীদের আত্মত্যাগ, স্বাধীনতাপ্রীতি ও বীরত্ব ইংরেজের শ্রেষ্ঠতর সংগঠনশক্তি ও উৎকৃষ্টতর অস্ত্র ব্যবহারের নিকট নতি স্বীকার করে।

পাঞ্জাবে অবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নৃশংস প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে থাকে। নির্দোষীদেরও ফাঁসি হয়; অনেকে কামানের মুখে আত্মবিসর্জন করে; মাত্র একজনের দোষেও সমগ্র পল্লী বিনষ্ট করা হয়। মীয়ামীরে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বন্দী ৪৫ জন সিপাহী শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এইভাবে নৃসংশ প্রতিশোধ লওয়া হয়।

## কুমার সিংহের বিহার

অযোধ্যা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাব যখন বিপ্লবশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়, তখন পূর্ব-প্রান্তীয় বিহারও অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠে। বহু বেহারী সিপাহীশ্রেণীভুক্ত ছিল। তাহারা উত্তেজিত হইলে অঘটন ঘটা সম্ভবপর ছিল। এদিকে পাটনার ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের মুসলমানরা বহুদিন সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। দানাপুরের সিপাহীদের সহিত তাহাদের সম্মেলন ঘটিবারও সম্ভাবনা ছিল। বিহারে সিপাহী অভ্যুত্থানের আশংকা নীলকর ও অহিফেন বিভাগীয় শ্বেতাঙ্গ এবং কোম্পানীর রাজত্বের পক্ষে বিভীষিকাময় হইয়া পড়ে। কাজেই দানাপুরের সিপাহীদের নিরস্ত্রীকরণের কথা উঠে।

জুনমাসের শেষভাগে ত্রিহুতে সংবাদ রটে, ওয়ারিশ আলী নামক জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি পাটনার মুসলমানদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করিতেছেন। উক্ত ব্যক্তি আলী করিম নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন বলিয়াও প্রকাশ পায়। ওয়ারিশ আলির প্রাণদণ্ড হয়; আলী করিমের মাথার জন্য ৫ হাজার টাকার হুলিয়া বাহির হয়; কিন্তু কোন ফল হয় না।

ইতিমধ্যে পাটনায় নানা গোলযোগের সূত্রপাত হয়। কমিশনারের যথেচ্ছাচারে সকলে প্রাণভয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠে; কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্র বধ্যভূমিতে পরিণত হয়; নৈশ নিষেধাজ্ঞাও জারি হয়; অধিকন্তু সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ অযথা নিপীড়িত ও অপমানিত হইতে থাকেন। কাজেই ৩রা জুলাই অভ্যুত্থানের প্রয়াস হয়; কিন্তু শিখসৈন্যের উপস্থিতিতে সকলে আত্মগোপন করে। এই সম্পর্কে পীর আলী নামক জনৈক তেজস্বী মুসলমান বন্দী হন। কোম্পানীর বিরুদ্ধে লক্ষ্ণৌর মুসলমানদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ পীর আলীকে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে গোপন খবর বলিতে প্ররোচিত করেন। কিন্তু পীর আলী গম্ভীরভাবে উত্তর দেন,—'এমন কতকগুলি কাজ আছে, যাহার জন্য জীবনরক্ষার প্রয়োজন; আর কতকগুলোর জন্য জীবন-রক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি আমাকে ফাঁসি দিতে পারেন; আমার ন্যায় অন্যান্য লোক প্রতিদিন ফাঁসিতে প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারে। কিন্তু আমার পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে। আপনার উদ্দেশ্য কখনও সফল হইবে না।'

ইহার পর পাটনার অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল; কিন্তু তাহাও বেশিদিনের জন্য নহে। দিল্লী সিপাহীদের অধিকারে, কানপুরে শ্বেতাঙ্গগণ নিহত, লক্ষ্ণৌ বিধ্বস্ত-প্রায় এবং আগ্রা ও সীমান্ত প্রদেশের প্রায় প্রত্যেক

স্থান সিপাহীদের রণক্ষেত্রে পরিণত। এই খবরে বেহারীরা স্থির থাকিতে পারে নাই; দানাপুরও শান্ত থাকে নাই।

২৫শে জুলাই ঐস্থানের ৭ম ও ৮ম সিপাহীদল অভ্যুত্থান করিয়াই ৪০ তম দলের সহিত অস্ত্রাদি সহ আরা অভিমুখে ধাবিত হয়।

ঘটনাচক্রে কুমার সিংহ নামক জনৈক অশীতিপর তেজস্বী রাজপুত ভূম্যধিকারী বিদ্রোহীদের প্রধান উৎসাহদাতা ও নেতা হইয়া উঠেন; আরার নিকটবর্তী জগদীশপুর ছিল তাঁহার আবাস ভূমি। বিহারে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। এমনকি কোম্পানীও তাঁহাকে মানিত। প্রকাশ, দানাপুরের সিপাহীরা টোটা ব্যবহারে অসম্মত হইলে কুমার সিংহকে সিপাহীদের রাজি করাইতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি যে-কোন কারণেই হউক, সালিশী করিতে রাজি হন না। যাহা হউক, অবশেষে সিপাহীদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের হেতু জানিতে গিয়া তিনি সিপাহীদের অধিনায়ক পদে বৃত হন। এদিকে ২৭শে জুলাই দানাপুরে বিপ্লবের আনুষঙ্গিক কাজ যথা—ধনাগার লুণ্ঠন ও কয়েদীদের মুক্তিদান করা হয়। কিন্তু শিখ সৈন্যের সহায়তায় ইংরেজরা তাহাদের আশ্রয়দুর্গ রক্ষা করিতে থাকে; অন্যস্থান হইতে তাহাদের সাহায্যার্থ সৈন্য আসিলে পর সিপাহীরা হটিয়া যায়।

কুমার সিংহের এমনি প্রতিপত্তি ছিল যে সমগ্র আরা তাঁহার নামে পদানত হইয়া পড়ে। তিনি নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার বন্ধ করেন। এমনকি কয়েকজন কোম্পানীর চাকুরিয়া বাঙালী তাঁহার সম্মুখে নীত হইলে তিনি তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলেন—'আমার আদেশে কেহ তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে না।' তিনি তাহাদের হাতীতে পাটনায় পাঠাইবার নির্দেশ দেন।

কুমার সিংহের বিক্রমে কোম্পানী অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। কয়েক স্থানে ইংরেজ সেনার সহিত তাঁহার প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়; বহু চেষ্টার পর ইংরেজ

সৈন্য ৩রা আগস্ট আরায় প্রবেশ করে। এদিকে ইংরেজ সেনাপতি আয়ার জগদীশপুরের দিকে রওনা হন। তাঁহার গতিরোধের জন্য দুলুর নামক স্থানে শেষ চেষ্টা করা হয়; কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইয়া যায়। ইংরেজরা দেবমন্দিরসহ কুমার সিংহের সমুদয় সঞ্চিত খাদ্য ও ঘরবাড়ী বারুদ দিয়া উড়াইয়া দেয়।

এদিকে দানাপুরের ১০ম শ্বেতাঙ্গ পদাতিক দল আরা উদ্ধারে যাইবার কালে ভয়াবহ নৃশংসতার পরিচয় দেয়। ইহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জনৈক শ্বেতাঙ্গ পত্রপ্রেরক বিলাতের এক বিশিষ্ট সংবাদপত্রে লেখেন—'ইহারা আহত সিপাহীদের পর্যন্ত পথিপার্শ্বের বৃক্ষশাখায় ফাঁসি দেয়। যুদ্ধে নিহত সেনাদের শব বৃক্ষশাখায় ঝুলান হয়। কুমার সিংহের প্রাসাদরক্ষী ৫০ জন সিপাহী গুলিতে প্রাণত্যাগ করিলে তাহাদের শবও অনুরূপভাবে বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখা হয় এবং জগদীশপুরের পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহ অগ্নিদগ্ধ ও পল্লীবাসীরা নিহত হয়।' ইহাতেও প্রতিহিংসাপরায়ণ শ্বেতাঙ্গ সেনার তৃপ্তি হয় নাই; তাহারা নিজেদের অনুগত একশত সিপাহীর উপর আক্রমণ চালাইয়া অনেককে হতাহত করে।

জগদীশপুর বিধ্বস্ত ও সিপাহীরা পরাজিত হইলেও কুমার সিংহ একদিনের জন্যও ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করেন নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সাসারামের পথে প্রস্থান করেন। কুমার সিংহ কিন্তু বহু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজদের মত নিরাশ্রয় শ্বেতাঙ্গিনী ও বালকবালিকার শোণিতে নিজের হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই।

এদিকে তাঁহার নামে রাজধানীর শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হয়। তাঁহার মস্তকের মূল্য বাবদ ২৫ হাজার টাকার হুলিয়া বাহির হয়। ইংলণ্ডের টাইম্‌স পত্রিকায় পর্যন্ত লিখা হয় যে, "সমগ্র সৈন্যের এক পঞ্চমাংশ সিপাহীদের অধীন হইয়াছে। তাহারা যদি দক্ষিণাভিমুখী হইয়া রাণীগঞ্জ আক্রমণ ও রেলপথ অধিকার করে, তাহা হইলে কী হইবে?"

মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের সর্বত্র সিপাহীরা কুমার সিংহের নামে চঞ্চল হইয়া উঠে। দূরবর্তী আসামের জনৈক রাজা পর্যন্ত কুমার সিংহের সমর্থক সন্দেহে অবরুদ্ধ হন। বেরার ও উহার পার্শ্ববর্তী প্রদেশে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে সিপাহীরা কুমার সিংহের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া নেয়। এই সময় তিনি উত্তর ভারতের সিপাহীদের সহিত সংযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হন। তিনি যখন মধ্য ও উত্তর ভারতে পদার্পণ করেন তখন বহু সিপাহী তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া নেয়। এইভাবে পুনরায় নব বল ও অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তিনি ১৮৫৮ সালের ১৮ই মার্চ আজিমগড় আক্রমণের উদ্যোগ করেন। তাঁহার প্রবল পরাক্রমে ইংরেজ সৈন্য পর্যুদস্ত হয়। এদিকে হতাবশিষ্ট সৈন্য সহ ইংরেজ সেনাপতি শঙ্কিতচিত্তে সাহায্যের প্রত্যাশায় কাশী, এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ সংবাদ পাঠায়। কাশী ও গাজীপুর হইতে আগত ইংরেজ সৈন্য কুমার সিংহকে স্থানচ্যুত করিতে গিয়া নিজেরাই বিপন্ন হয়। আজিমগড়ের পরাজয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। তাহাদের আশঙ্কা হয় যে, কলিকাতা, এলাহাবাদ এবং এলাহাবাদ-লক্ষ্ণৌর মধ্যে গমনাগমন পথ হয়ত অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে।

এদিকে নবাগত ও উৎকৃষ্টতর সমরোপকরণে সজ্জিত ইংরেজ সৈন্যের সহিত আজিমগড়ের ৮ মাইল দূরবর্তী সর্না নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। ইহার ফলে ১৩ই এপ্রিল কুমার সিংহ আজিমগড় হইতে পশ্চাদপসরণ করেন বটে; কিন্তু আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় তিনি অসাধারণ রণকৌশল দেখান। অতঃপর ইংরেজ সৈন্যের সহিত তাঁহার ক্রমাগত খণ্ড যুদ্ধ হইতে থাকে। গাজীপুর অঞ্চলে পৌঁছিয়া তিনি স্থানীয় লোকের সহযোগিতায় গঙ্গা পার হইয়া যান। কিন্তু হস্তিপৃষ্ঠে যাইবার সময় তাঁহার মস্তকে রাজচিহ্নসূচক ছত্র ধারণ করা হয়। ইহাতে তাঁহাকে চিনিতে

পারিয়া ইংরেজরা তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে থাকে। তিনি গুরুতর আহত হন; এই অবস্থায় তাঁহাকে তাঁহার আবাসভবন জগদীশপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। ইতিমধ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য ২৩শে এপ্রিল জগদীশপুরে আক্রমণ চালাইতে আসিয়া পরাজিত হয় ও কোন ক্রমে প্রাণ লইয়া পলাইয়া যায়।

উহাদের পরাজয়ে শাহাবাদে আবার গোলযোগের সূত্রপাত হয়। কিন্তু এই ঘটনার তিনদিন পর সিপাহী বিপ্লবের অন্যতম নায়ক কুমার সিংহ দেহত্যাগ করেন।

দীর্ঘ নয় মাস কাল ভারতের বিভিন্ন স্থানে সেনাচালনা করিবার সময় নানারূপ বিপদগ্রস্ত হইলেও তিনি কদাপি আত্মসমর্পনের কথা চিন্তায় স্থান দেন নাই। ইংরেজ সেনার বিরুদ্ধে তিনি সাময়িক সাফল্য লাভ বহুবার করেন; রণকৌশল ও সেনাসংস্থাপনে অভূতপূর্ব দক্ষতারও পরিচয় দেন। কিন্তু বিশৃঙ্খলা ও সর্দারদের স্বপ্রধান মনোভাবহেতু তাঁহার সাফল্য কখনও স্থায়ী হইতে পারে নাই। ইহা সত্ত্বেও কুমার সিংহের পরাজয় ও বিহারে তাঁহার প্রতিপত্তিনাশ অসম্ভব বলিয়া একসময় ইংরেজদের মনে হইয়াছিল। অদ্যাপি কুমার সিংহের বীরত্বগাথা, মহত্ত্ব ও শৌর্যের কথা উত্তর বিহারের বহুস্থানে গ্রাম্য ছড়া ও সঙ্গীতে কীর্তিত হইয়া থাকে।

কুমার সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা অমর সিংহ সিপাহীদের অধিনায়করূপে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাইয়া যান। তাঁহার অনুসৃত গেরিলাযুদ্ধে শাহাবাদের ইংরেজদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হয় ও তাহাদের আধিপত্যও লোপ পায়। জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সিপাহীরা শাহাবাদের নানাস্থানে, গঙ্গার দক্ষিণ ও সোনের পশ্চিম অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব অব্যাহত রাখে। কিন্তু অবশেষে অমর সিংহের সাড়ে চার হাজার সৈন্য একযোগে নানাস্থানে আক্রান্ত হইয়া

শাহাবাদের দক্ষিণপশ্চিমস্থ পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এইভাবে তিনি সাত মাস কাল আত্মরক্ষা করেন ও ইংরেজদের নানাভাবে বিব্রত রাখেন।

বিহারের দীর্ঘকালব্যাপী খণ্ডযুদ্ধের ন্যায় ইংরেজদের আর কোথাও এরূপ অবসন্ন ও হীনপ্রভ হইতে হয় নাই। বহুবার তাহাদের পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে; তাহাদের দুর্দশাগ্রস্তও কম হইতে হয় নাই। কিন্তু তাহারা হাল ছাড়ে নাই; সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য কোন ক্ষতিই তাহাদের নিকট অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। অবশেষে ১৮৫৮ সালের শেষভাগে শাহাবাদ নিরুপদ্রব বলিয়া বিবেচিত হয়। সাময়িকভাবে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত বিহার পুনরায় ইংরেজ শাসনের অধীন হয়।

## বাঙলায় চাঞ্চল্য

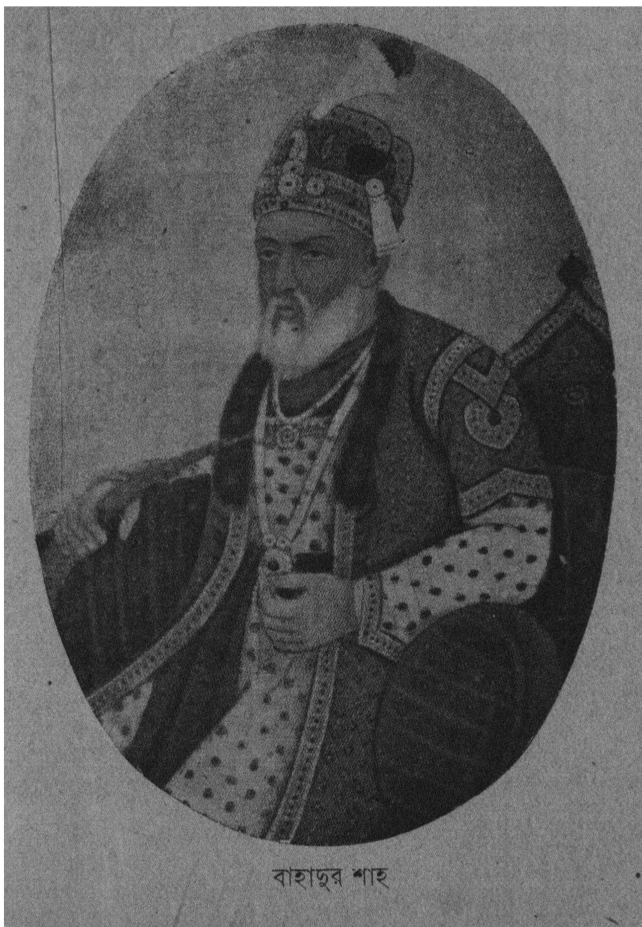
১৮৫৭ সালের জুন মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহ বিনাগোলযোগে অতিবাহিত হয়। ঐ মাসের প্রথম দিকে বারাকপুরের সিপাহীরা কোম্পানীর নিকট 'এনফিল্ড রাইফেল' পাইবার জন্য দরখাস্ত করে এবং দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য সুযোগ প্রার্থনা করে। সেনাপতি হিয়ার্সে ৮ই জুন কর্তৃপক্ষের নিকট নূতন বন্দুক ব্যবহারের অনুমতিদান সম্পর্কে সিপাহীদের আবেদনপত্র কলিকাতায় পাঠান; কিন্তু তিনিই আবার ১৩ই জুন গবর্ণর জেনারেলের নিকট খবর দেন যে, বারাকপুরে সেনাদল সেই রাত্রেই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন।

গবর্ণর জেনারেল ইহাতে সম্মতি দেন। তদনুসারে পূর্বোক্ত রাত্রেই কলিকাতা ও চুঁচুড়া হইতে দুই দল শ্বেতাঙ্গ সেনা বারাকপুর অভিমুখে যাত্রা

করে। উহার পরদিন প্রাতে কামানের মুখে সিপাহীদের অস্ত্রত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। অতঃপর কলিকাতার দুর্গে এবং দমদম ও বারাকপুরে মোতায়েন সৈন্যদিগকেও বিনাবাধায় নিরস্ত্র করা হয়।

এদিকে ১৪ই জুন কলিকাতায় এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। ঐদিন খৃষ্টানরা অলীক আশংকায় দলেদলে আত্মগোপনের চেষ্টা করে। গুজব রটে, বারাকপুরের সিপাহীরা পূর্ব রাত্রে বিদ্রোহ করিয়াছে এবং অযোধ্যার নির্বাসিত নবাবের অনুচরবৃন্দ খৃষ্টান নাশের উদ্দেশ্যে সিপাহীদের সহিত সম্মিলিত হইবার উদ্যোগ করিতেছে। মন্ত্রিসভার প্রধান সদস্য ও রাজ-কর্মচারীরা নিজ নিজ আবাসস্থল সুরক্ষিত করিতে থাকে এবং নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীরা গড়ের মাঠে ফোর্ট উইলিয়মএ আশ্রয়ের জন্য দুর্গাধ্যক্ষের নিকট সকাতর অনুমতি প্রার্থনা করে। নগরে ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; গড়ের মাঠ ও ভাগীরথী তট লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। পলায়নকারিগণ দুর্গে বা জাহাজে আত্মরক্ষার সঙ্কল্প করে। ইণ্টালী ও সার্কুলার রোডের ফিরিঙ্গীরাও বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করে। চৌরঙ্গী ও খিদিরপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ইংরেজ-শূন্য হইয়া পড়ে; দুর্গ ও ভাগীরথীর জাহাজসমূহ পলাতক দলে পূর্ণ হইয়া উঠে।

১৫ই জুন সংবাদ রটে যে, গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অযোধ্যার নির্বাসিত নবাবের অনুচরগণ কলিকাতা দুর্গের মুসলমান সিপাহীদের উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। পূর্ব হইতেই নির্বাসিত নবাবের মুচিখোলা প্রবাসের সহচরদিগকে বিপ্লবের সহিত সংশিষ্ট বলিয়া সন্দেহ করা হইতে থাকে; দুর্গরক্ষী তাহার মুসলমান বন্ধুদের নিকট হইতে খবর পান যে, দুর্গদ্বারের শান্ত্রীদের সহিত নবাবের লোকজনের সর্বদা দেখাশুনা হইতেছে এবং অযোধ্যার প্রধান তালুকদার রাজা মানসিংহ কলিকাতার নবাব ওয়াজিদ আলী ও তাঁহার মন্ত্রীবর্গের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। এই সব খবরের



বাহাদুর শাহ

মূলোচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণর জেনারেল প্রতীকারে উদ্যত হন। ১৫ই জুন সকালে নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ তিনজন পারিষদের সহিত ফোর্ট উইলিয়মে আটক হন। কিন্তু নবাব কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বাহাদুর শাহের মত তাঁহার নাম এবং প্রভাবপ্রতিপত্তিও বিপ্লব-প্রসারে সহায়ক হয় মাত্র।

এদিকে পলাশীযুদ্ধের শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' নামক সংবাদপত্রে এক প্রবন্ধ বাহির হয়। গভর্ণমেণ্ট সম্পাদককে সাবধান করিয়া দেয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি অশান্ত ভাব প্রকাশ করেন। এই হেতু গভর্ণমেণ্ট ভড়কাইয়া যায় এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচ আইন প্রয়োগ করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু সম্পাদককে অপসারণ করা হইলে কাগজ রেহাই পায়। ওদিকে নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত দুঃসংবাদ ও গুজবে য়ুরোপীয় সম্প্রদায় আবার অধীর হইয়া উঠে। সীমান্ত হইতে কলিকাতায় আগন্তুক শ্বেতাঙ্গগণ ভীতিবিহ্বল অবস্থা অধিকতর ত্রাসজনক করিয়া তোলে।

জুলাই মাসের শেষভাগে বাঙলা ও সীমান্তের সরকারী কর্মচারীদের প্রতি এই মর্মে এক আদেশলিপি প্রচারিত হয় যে, আদালতের বিচারে কেহ দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত যেন কাহাকেও দণ্ডদান না করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন ভারতবাসীর বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে এবং সামান্যমাত্র বিরোধিতার আভাসেও তাহারা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে প্ররোচিত করিতে থাকে। এই সম্পর্কে সামরিক আইন জারীর দাবী করা হয়। কিন্তু তাহা তাহা না হইলেও অস্ত্রসংক্রান্ত আইন জারী হয়।

এদিকে বাঙলার মফঃস্বল সহর ক্রমশ অশান্ত হইয়া উঠিতে থাকে। প্রথমে জলপাইগুড়ির ৭৩ নং সিপাহীদলে উত্তেজনা দেখা যায়। ১৮৫৭ সালের

বন্দোবস্তে ইজারাদার সম্প্রদায় বা তৎকালীন জমিদার শ্রেণী হইতে যে-নূতন ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক হইতে তাহারা ইংরেজ নকলনবিশ বনিয়া যাওয়ায় এবং ভূম্যধিকারীরা আত্মতৃপ্ত থাকায় ইংরেজ-পক্ষ সমর্থনই অধিকতর লাভজনক বলিয়া মনে করে। ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায় ইংরেজের গোমস্তা বা চাকুরিয়া হিসাবে আরামপ্রিয়তা ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশস্ত বলিয়া মনে করে এবং জমিদার সম্প্রদায় বিড়ালের বিবাহ, মোরগের লড়াই ও নানা বিলাসব্যসনে কালাতিপাত করাকে শ্রেয়তর বলিয়া গণ্য করে। এইভাবে বাঙলার ইংরেজশাসন কায়েমের পক্ষে ভূমি-বন্দোবস্ত যে ফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। অন্য প্রদেশবাসী সিপাহীরা এবং কিয়দংশ তাহাদের স্বপ্রদেশবাসীরা যখন ইংরেজ-বিতাড়নে নিযুক্ত, তখন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী আরামবিলাসে মত্ত। এই হেতু অভ্যুত্থানে বাঙ্গালীর সাড়া পাওয়া যায় নাই; নূতন জীবনবিলাস তাহাদের এমনই উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলে; ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং কদাচার তাহাদের নীতিভ্রষ্ট বা মনুষ্যত্বহীন করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। জীবিকান্বেষণ ও নব্য জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনে তাহারা পুরাদস্তুর ইংরেজানুসারী হইয়া উঠে। ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। পক্ষান্তরে জনসাধারণও দারিদ্র্য ও নিষ্পেষণে বোধশক্তি হারাইয়া ফেলে। তৎকালীন পরিবেশে ইহাই স্বাভাবিক ছিল মাত্র। এদিকে শ্বেতাঙ্গ বাহিনী কর্তৃক দিল্লী পুনরধিকৃত হইলে নব্য বাঙালীদের একশ্রেণী প্রকাশ্য সভায় উল্লাস প্রকাশ করে। বাঙলার বিশিষ্ট সংবাদপত্র যথা হিন্দু পেট্রিয়ট,—হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) বিদ্রোহে সরকার পক্ষ সমর্থন করে। তবে উহাতে সরকারী প্রতিহিংসাপরায়ণতার নিন্দাও করা হয়। অন্যান্য প্রদেশ ও বাঙলার মধ্যে এদিক হইতে বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, নব্য বাঙলার কেহ কেহ যে বাঙালীর এই শোচনীয় অধঃপতনে ব্যথিত না হইয়াছিলেন এমন নহে। কিন্তু তাহা ধর্তব্য নহে।

## কোল ভীল সাঁওতালের দেশ

বিহারের পূর্বাংশে গোলযোগ দূর হইলেও উহার দক্ষিণ দিকবর্তী পার্বত্যপ্রদেশে অর্থাৎ ছোট নাগপুরে স্বতোৎসারিত অভ্যুত্থান ঘটে। রাঁচী ও উহার নিকটবর্তী সহর সিপাহীদের হস্তগত হয়; অন্যান্য স্থানের মত রাঁচীতেও আনুষঙ্গিক হত্যাকাণ্ড চলে। এদিকে হাজারীবাগ, পুরুলিয়া, চাইবাসা, পালামৌ, সম্বলপুর ও সিংহভূমে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠে এবং সহজেই তাহা নির্বাপিত হয় নাই। আদিবাসী কোলরাও ইংরেজের বিরুদ্ধে ধনুর্বাণ ধারণ করে। যেসব রাজার অধীনে তাহারা পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদের গদিচ্যুত করিবার জন্য তাহারা দলবদ্ধ হয়। উহার ফলে সমগ্র অঞ্চল অরাজক হইয়া উঠে। অবশেষে ১৮৫৮ সালের প্রারম্ভে বহু চেষ্টায় ছোটনাগপুরে কিছুটা শান্তির লক্ষণ দেখা দিলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিহিংসা গ্রহণ করা হয়। ইংরেজ শাসকগণ যথেচ্ছাচার করিয়া বহু গ্রাম জ্বালাইয়া দেয় ও নিরপরাধ অনেকের প্রাণদণ্ডের বিধান করে। কিন্তু অত সহজেই বিদ্রোহীরা মাথা নোয়ায় নাই। সমগ্র ছোট নাগপুরে শান্তি স্থাপিত হইতে ১৮৫৮ সাল শেষ হইয়া যায়।

## অভ্যুত্থানের কেন্দ্রভূমি আগ্রা-অযোধ্যা

১৮৫৭ সালের ১২ই ও ১৩ই মে মীরাট ও দিল্লীর খবর আগ্রায় পৌছিলে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গবর্ণর কলভিন সাহেব ভরতপুর ও গোয়ালিয়রের মহারাজা সিন্ধিয়ার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন; তাঁহার অনুরোধ মঞ্জুর হয়। এদিকে আলীগড়ে ২০শে মে সিপাহীরা অভ্যুত্থান করে। উহার

ফলে আলীগড় এবং সঙ্গে সঙ্গে এটোয়ায় বৃটিশ শাসন বিলুপ্ত হইয়া যায়। ৩১শে মে আবার মথুরার সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে; উহাদের বিরুদ্ধে ভরতপুরের সিপাহীদের নিয়োগ করা হইলে কামানচালক পূরবীয়া সিপাহীরা কর্তব্যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধেই কামান সন্নিবেশ করে। ঐদিনই আশঙ্কাহেতু আগ্রার সেনাদের নিরস্ত্র করা হইলে উহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ বাড়ীর দিকে এবং অধিকাংশই দিল্লীর দিকে রওনা হয়। মে মাস শেষ হইবার আগেই গবর্ণর জেনারেলকে জানান হইল—'সমগ্র অঞ্চল বিশৃঙ্খল; লোকের বিশ্বাস, আমাদের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না।'

দেখিতে দেখিতে অযোধ্যার সর্বত্র বিপ্লবশিখা পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়; মুজঃফরনগর, শাহজাহানপুর, সাহারাণপুর, রোহিলখন্দ, মোরাদাবাদ, বেরিলী প্রভৃতি স্থানে কমবেশি একই দৃশ্যের অবতারণা হয়। খাঁ বাহাদুর খাঁ নামক অযোধ্যার নবাব বংশীয় জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি বেরিলীর সুবাদারপদে আসীন হইয়া প্রকাশ্যে ইংরেজদের ফাঁসী দিতে আরম্ভ করেন। বদায়ুনের মুসলমানদের অভ্যুত্থানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আগ্‌রা বিভাগের এলেকাধীন ফড়ক্কাবাদে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিতে থাকে। ফতেগড়ের সিপাহীরা দুর্গে আবদ্ধ শ্বেতাঙ্গদের উপর জুন মাসে আক্রমণ চালাইতে সুরু করায় তাহারা পলাইয়া আত্মরক্ষা করে। ঐ অঞ্চলের বিপ্লবে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডে ইংরেজ প্রাধান্য লুপ্ত হয়।

আগ্রার দুর্গে ইংরেজদের সহিত পার্শী, বাঙালী প্রমুখ বিভিন্ন দেশীয় নরনারী আশ্রয় নিয়াছিল। নীমচ, ওনসিরাবাদ, কোটা ও ভরতপুরের উত্তেজিত সিপাহীরা আগ্রার পথে অগ্রগমন করিলে বাধাদানকারী ইংরেজ সৈন্য বিপর্যস্ত ও হতমান হইয়া আগ্রাদুর্গে আশ্রয় নেয়। এদিকে সাশিয়ার যুদ্ধে বিজয়ী সিপাহীসৈন্য দিল্লীর পথে ধাবিত হয়। দিল্লীর সিপাহীরা তোপ

নাগিয়া তাহাদের জয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। নানারূপ বিপর্যয়ে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গবর্ণর কলভিন সাহেব ১০ই সেপ্টেম্বর আগ্রাদুর্গে প্রাণত্যাগ করেন। বিপ্লবকালে ভারত সাম্রাজ্যরক্ষার পক্ষে এই ইংরেজ ভদ্রলোক অন্যতম প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন।

সিপাহী অভ্যুত্থান অযোধ্যাতেই সর্বাপেক্ষা গুরুতর হইয়া উঠে; ১৮৫৭ সালের মে মাসের প্রারম্ভে নানাস্থানে অশান্তির লক্ষণ প্রকট হয়। এদিকে ৩০শে মে লক্ষ্ণৌয় সিপাহী অভ্যুত্থান ঘটে। রাজধানীর সিপাহীদের অভ্যুত্থানে সীতাপুর, মূলাওন, মোহমদী, ফৈজাবাদ, সুলতানপুর, সলোনী, বরুইচ, গোণ্ডা, মোল্লাপুর, ফরিদাবাদ প্রভৃতি স্থান বিপ্লবের লীলাস্থলে পরিণত হয়।

৩০শে জুন বিনহাট নামক স্থানে লক্ষ্ণৌরক্ষী শ্বেতাঙ্গ সেনার সহিত সিপাহীদের প্রচণ্ড সংগ্রামে শ্বেতাঙ্গরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং জুলাই মাসের প্রারম্ভেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে চারিদিক হইতে আক্রমণ চালান হইতে থাকে। সিপাহীরা লক্ষ্ণৌ অবরোধ করার পর অযোধ্যার শাসনকর্তা ও ইংরেজদের অন্যতম ভরসাস্থল স্যর হেন্‌রী লরেন্স নিহত হন। তিনমাস অবরুদ্ধ থাকার পর কানপুর উদ্ধারকারী সেনাপতি হ্যাভলক ও আউটরাম লক্ষ্ণৌর ইংরেজ রেসিডেন্সির নিকট হাজির হন। এদিকে ৩০ হাজার সেনাসহ (তন্মধ্যে নেপালী এবং শিখও ছিল) ভারতের তৎকালীন প্রধান সেনাপতি স্যর কলিন ক্যাম্বেল লক্ষ্ণৌয় উপস্থিত হন। প্রচণ্ড হানাহানির পর ২১শে জানুয়ারী (১৮৫৮ সাল) সিপাহীরা লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিয়া যায়। দিল্লীর মত এখানেও শিখ, গুর্খা এবং ইংরেজ সেনা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনে উন্মত্ত হইয়া উঠে। এই সম্পর্কে সার্জেণ্ট মিচেল বলেন—'ফ্রান্সের অধিপতি ৯ম চার্লস মৃত শত্রুর শবদেহের ঘ্রাণ লইতে ভালবাসিতেন, ঐতিহাসিকরা ইহা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যদি ১৮৫৮ সালের মার্চে লক্ষ্ণৌএ একবার পদার্পণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহারও মত পরিবর্তন হইত।'

লক্ষ্ণৌ অবরোধ ও রক্ষার সংগ্রামে মৌলবী আহম্মদ উদ্দৌলা ও অযোধ্যার বেগম হজরৎ মহলের বুদ্ধি ও রণকৌশল সিপাহীদের মধ্যে সঙ্ঘশক্তি ও উদ্দীপনা সৃজনে কম সহায়তা করে নাই। এদিকে স্থানান্তরে গিয়া হজরৎ বেগম পুনরায় আক্রমণের উদ্যোগ করিতে থাকেন। পক্ষান্তরে মৌলবী ও নানাসাহেবের সৈন্য এবং স্থানবিশেষে কুমার সিংহের সেনারা প্রবলবিক্রমে যুদ্ধ চালাইতে থাকে। এমনকি লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করার বহু পরও শ্বেতাঙ্গগণ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে নিরাপদে চলাচল করিতে অসমর্থ হয়।

১৮৫৮ সালের ২রা হইতে ২১শে মার্চের মধ্যে পরাজিত সিপাহীরা লক্ষ্ণৌ চিরতরে ত্যাগ করে। এদিকে মৌলবী আহম্মদ উদ্দৌলা নানাস্থানে সিপাহীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন; কিন্তু শেষে পোয়াইনের রাজার বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণ হারান। তাঁহার সম্পর্কে জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন,—'কেহ অন্যায় উপায়ে স্বাধীনতা হরণ করিলে, সেই লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারকারী যদি দেশহিতৈষী বলিয়া কীর্তিত হয়, তাহা হইলে মৌলভী নিঃসন্দেহে স্বদেশপ্রাণ।.........যে-বিদেশীরা তাঁহার দেশ দখল করিয়াছিল, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে পুরুষোচিত পরাক্রমের পরিচয় দেন।' তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দুই দুইবার ইংরেজ পক্ষের প্রধান সেনাপতি স্যর কলিন ক্যাম্বেলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন।

লক্ষ্ণৌয় পরাজিত বহু সিপাহী রোহিলখন্দে খাঁ বাহাদুর খাঁর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকে। তিনি ছিলেন অসাধারণ কৌশলী ও সংগঠনদক্ষ; কিন্তু উৎকৃষ্ট রণপরিকল্পনা ও গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করিয়াও তিনি বেরিলী নিজ অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। এদিকে ১৮৫৮ সালের জুন মাসের মধ্যে অভ্যুত্থানকারী সিপাহীরা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্যান্য স্থানেও দলভঙ্গ হইয়া যায়; ইহাদের অনেকে নেপালের গহন অরণ্যে আশ্রয় নেয়; অনেকে আত্মসমর্পণ করে। ইতিমধ্যে সগর, নর্মদা প্রদেশ ও বোম্বাই

প্রদেশেও উত্তেজনা ও শৃঙ্খলা হ্রাস পায়। কিন্তু মধ্য ভারতে নানাসাহেব, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপী প্রভৃতির তৎপরতায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল শ্লথ হইয়া যায়। সিপাহী অভ্যুত্থান প্রধানত ইহাদের মন্ত্রণা ও পরিচালনাধীন ছিল।

## প্রধান নেতা নানাসাহেব

শেষ পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওএর দত্তক পুত্র নানাসাহেব সিপাহী অভ্যুত্থানের সময় কানপুরের নিকটবর্তী বিঠুরে বাস করিতেছিলেন। ডালহৌসীর স্বত্বলোপ নীতি অনুসারে তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট ও পেন্সন হইতে বঞ্চিত করা হয়; এই হেতু তিনি সাধারণ অবস্থায় কালাতিপাত করিতে বাধ্য হন। তিনি ছিলেন অশেষ বুদ্ধিমান, কূটকৌশলী, সুদক্ষ যোদ্ধা ও দুর্ধর্ষ নেতা। এই কারণে, ইংরেজের বলাধিক্যহেতু তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হন নাই; বরং ইংরেজ রাজ্যশাসন নীতির ব্যর্থতা ও তাহাদের অদূরদর্শিতা তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে। তিনি সাময়িকভাবে চুপ করিয়া অবস্থা অনুধাবন করিতে থাকেন। শুধু তাহাই নহে; তিনি গোপনে দেশের অসন্তোষে ইন্ধন যোগাইতে থাকেন এবং তলে তলে সিপাহীদের সঙ্ঘবদ্ধ ও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করিয়া তোলেন। এই উদ্দেশ্যে বিদ্রোহের পূর্বাহ্ণে তিনি উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্র পরিক্রমণ করিয়া ফিরেন। বলিতে গেলে বিদ্রোহের মূল পরিকল্পনার তিনিই ছিলেন প্রধান সূত্রধার; প্রধানত আগ্রা, অযোধ্যা ও মধ্যভারতে তাঁহার নেতৃত্বে ও নির্দেশে বিপ্লবীরা পরিচালিত হন।

নানা সাহেবকে আরামপ্রিয় ও আমুদে সামাজিক লোক বলিয়া

ইংরেজরা মনে করিত। তিনি যেখানেই যাইতেন, সেখানেই তাঁহার অনুচর দলবল একটা সাড়া তুলিত। এদিকে ১৮৫৭ সাল যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে, তাঁহার দানধ্যানও ততই বাড়িতে থাকে। বাহির হইতে তাঁহাকে অস্থির প্রকৃতির বলিয়া মনে হইলেও বস্তুত তিনি ছিলেন ঘোর কূটকৌশলী, অসীম ধৈর্যশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণের ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য তিনি তাঁহার কোম্পানীর কাগজ ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিয়া দেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্যের বিষয় গবর্ণমেণ্ট পূর্বাহ্নে তিলমাত্র জানিতে পারে নাই। বরং তিনি কোম্পানীর শাসকদের নিকট বিশ্বস্ত ও ইংরেজ-সহযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হন। এই হেতু অভ্যুত্থানের পূর্বে জনৈক ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাকে কানপুরে সরকারী কোষাগার রক্ষার ভার দিতে চাহেন। ইহাতেই তাঁহার ঘোর কূটবুদ্ধি ও সংগঠনকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

মীরাট ও দিল্লীতে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কানপুরের সিপাহীরাও বিপ্লবে ঝাপাইয়া পড়ে এবং নানাসাহেবকে তাহাদের নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া নেন। নানাসাহেবও নিজেকে পেশবা বলিয়া ঘোষণা করিয়া সিপাহীদের গোরা সেনাবারিক আক্রমণের নির্দেশ দেন। দুর্গরক্ষী বৃটিশ সেনারা ১৯ দিন আত্মরক্ষা করে; কিন্তু তাহারা নিরাপদে এলাহাবাদ পৌঁছিতে পারিবে এই ভরসায় অবশেষে আত্মসমর্পণ করে। তবে নৌকাযোগে নদী পার হইবারকালে উহাদের উপর গোলাবর্ষণ করা হয়; ইহার ফলে অধিকাংশ ইংরেজ পুরুষ নিহত এবং স্ত্রীলোক ও শিশু বন্দী হয়। এই সংবাদ পাইবামাত্র বৃটিশ সেনানায়ক হ্যাভলক ও নীল লক্ষ্ণৌ হইতে কানপুরের দিকে ধাবিত হন এবং বিদ্রোহীদের পরাজিত করিয়া নিদারুণ প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন; অসংখ্য নির্দোষ লোক ইংরেজ সৈন্যের ক্রোধে আত্মাহুতি দেয়। কিন্তু সসৈন্য হ্যাভলক ও নীল যখন

কানপুর পৌঁছেন, তাহার পূর্বেই বন্দীদিগকে হত্যা করিয়া কূপে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু অনেকের অভিমত, নানা ইহার জন্য দায়ী নন। *

কানপুরের ব্যর্থতার পর নানাসাহেব মধ্য ভারত অঞ্চলের দিকে প্রস্থান করেন এবং সেখানে বিশেষ করিয়া ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও স্বীয় সহকারী তাঁতিয়া তোপীর সহায়তায় নূতন করিয়া সেনা সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার অদ্ভুত সংগঠনকৌশল ও সেনাপরিচালনায় ইংরেজপক্ষ বিস্মিত হইয়া যায়; তাঁহার বিক্রমে ইংরেজদের বহুবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। অবশেষে কয়েকস্থানে শ্রেষ্ঠতর সামরিক কৌশল ও শক্তির নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু নানা সাহেব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে চেষ্টা করেন; ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তিনি যে-ব্যক্তিগত ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করিতেন, তাহা তিনি দেশব্যাপী করিয়া তোলেন। যখন আর কোন আশা নাই তখন তিনি নেপালের জঙ্গলে আত্মগোপন করেন—একদিনের জন্যও আত্মসম্ভ্রম বিকাইবার কথা তিনি মনে স্থান দেন নাই। সংগ্রাম পরিচালনায় তিনি বুদ্ধিই যোগান নাই, বিপদে তিনি সর্বাগ্রে মাথাও বাড়াইয়া দেন। প্রকৃত বিপ্লবী নেতার সকল গুণ তাঁহাতে বর্তমান ছিল।

* অভ্যুত্থানের প্রথম দিকে সিপাহারা অ-সামরিক ইংরেজ নরনারীর উপর কোনরূপ বলপ্রয়োগ করে নাই; কিন্তু গোরা সেনার নৃশংস অত্যাচার ও ব্যাপকভাবে অসামরিক ভারতীয়দের হত্যায় তাহাদের মধ্যেও প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। কানপুরের ঘটনা উহার প্রমাণ। কিন্তু নানাসাহেবকে উহার জন্য দায়ী করা যায় কিনা সন্দেহ। ইহা শ্বেতাঙ্গদের অনাচারের প্রতিক্রিয়া মাত্র। ফাঁসির পূর্বে আজিম উল্লা খাঁ যে বিবৃতি দেন, তাহাতে তিনি নানা সাহেবকে এই কলঙ্কের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া গিয়াছেন।

## আজিম উল্লা খাঁ

নানাসাহেব যেমন ছিলেন কার্যত বিপ্লবের নায়ক, আজিম উল্লা খাঁ ছিলেন তেমনি তাঁহার যোগ্য সহচর। নানাসাহেবের সমুদয় দুঃসাহসিক কার্যকলাপের পশ্চাতে তিনি বুদ্ধি ও পরিকল্পনা যোগাইয়াছেন।

তাঁহার জীবনধারা ছিল রোমাঞ্চময়। প্রথম জীবনে তিনি ইংরেজদের অধীনে খানসামার কাজ করিতেন; কিন্তু স্বীয় অধ্যবসায় ও বুদ্ধিবলে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। ঘটনাচক্রে তিনি নানা সাহেবের সংস্পর্শে আসেন এবং অত্যদ্ভুত বুদ্ধিমত্তায় তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা হইয়া উঠেন। তাঁহার এমনি ক্ষুরধার বুদ্ধি ছিল যে, অতি সামান্য ব্যাপারকেও তিনি নিজের সুবিধামত কাজে লাগাইতে পারিতেন।

ইংল্যাণ্ডে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের নিকট তাঁহার দাবী উত্থাপনের জন্য নানা সাহেব তাঁহাকে বিলাত পাঠান। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি সেখানকার অভিজাত শ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন এবং ইংল্যাণ্ডের সামরিক সংগঠন, উহার শক্তি ও দুর্বলতার পরিমাপ করেন। শুধু তাহাই নহে; তিনি ক্রিমিয়ার ইঙ্গ-রুশ রণাঙ্গনে গিয়া ইংরেজের সামরিক কৌশল স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করেন। ইহার কিছুকাল পর ভারতে ফিরিবার পথে আসন্ন বিদ্রোহে যাহাতে তুরস্ক ও আফগানিস্থানের সমর্থন পাওয়া যায়, তিনি তাহার চেষ্টা করেন।

আজিম উল্লা খাঁ শুধু কূটনীতিক বলিয়াই খ্যাত ছিলেন না, তিনি সামরিক তৎপরতায়ও যোগ্যতা দেখান। অভ্যুত্থানের তরঙ্গ যখন দুকূলপ্লাবী, তখনও তিনি নিজে ইংরেজদের সামরিক বলাবল নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বস্তুত সামরিক গোয়েন্দাগিরিতে তিনি অদ্ভুতকর্মা পুরুষ ছিলেন।

তঁহার আকৃতি এবং শিক্ষাদীক্ষাও তাঁহার কার্যকলাপের অনুকূল ছিল; প্রথম দর্শনে তাঁহাকে ইংরেজ বলিয়া ভ্রম হইত। অভ্যুত্থানের শেষ পর্যায়ে তিনি যখন লক্ষ্ণৌর দুর্গে ফলবিক্রেতা বেশে ঘোরাফেরা করিতে থাকেন, তখন তিনি ধরা পড়িয়া ইংরেজদের হাতে প্রাণ হারাণ। কিন্তু তাঁহার সৌম্য মূর্তি, বুদ্ধিমত্তা ও আন্তরিকতায় দুর্গাধ্যক্ষ পর্যন্ত বিমোহিত হইয়া যান। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি দেশহিতে আত্মদানের গৌরব ও শ্লাঘা অনুভব করেন।

## তাঁতিয়া তোপী

সিপাহী অভ্যুত্থানের সময় নানা সাহেবের দুঃসাহসিক ব্রতের যোগ্য সহকর্মী হন কুশলী ও রণনিপুণ মারাঠী ব্রাহ্মণ তাঁহার পার্শ্বচর তাঁতিয়া তোপী। পরাক্রান্ত ও অপরাজেয় গোয়ালিয়র সৈন্যদলের তিনি অধ্যক্ষ হন এবং সৈন্যসহ ১৮৫৭ সালের ৯ই নভেম্বর কানপুরের ৪৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কাল্পীতে যান। তাঁহার কিছু সৈন্য কানপুরের ৭ মাইলের মধ্যেও পৌঁছে। উহাদের হটাইয়া দিতে গিয়া কানপুর-রক্ষী ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ ওয়াইণ্ডহ্যাম ২৭শে নভেম্বর শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।

ইংরেজদের যোগাযোগ পথের উপরও তাঁতিয়ার খরদৃষ্টি থাকে; তিনি তাহাদের লক্ষ্ণৌ ও কানপুরের মধ্যে যোগাযোগ পথ অবরুদ্ধ এবং রসদ সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেন। বহু স্থান বিনা বাধায় তাঁহার দখলে আসে। কিন্তু ইংরেজ পক্ষের প্রবীন সেনাপতি হ্যাভলক ও নীল অভাবনীয় ক্লেশ স্বীকার করিয়া ৩০শে নভেম্বর অবরুদ্ধ ইংরেজ সেনার সাহায্যার্থ কানপুর পৌঁছেন। উভয় পক্ষই সেনা সন্নিবেশ করিতে থাকে। বিদ্রোহী সিপাহীদের অধ্যক্ষ হন তাঁতিয়া তোপী; নানাসাহেব স্বয়ং সেনাদলের বাম পার্শ্বরক্ষী বাহিনী চালনা করেন। কিন্তু

দক্ষিণ পার্শ্ব তেমন সুরক্ষিত না থাকায় তাহাদের পরাজয়ের সূত্রপাত হয়। ৬ই ডিসেম্বর উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ চলিতে থাকে। কিন্তু ইংরেজপক্ষ অধিকতর কৌশলে কামান দাগিতে থাকায় তাঁতিয়ার বিপুল বাহিনী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। অতঃপর ৯ই ডিসেম্বরও পুনরায় সিপাহীরা পরাজিত হয়; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও গোয়ালিয়র বাহিনীকে তাঁতিয়া কাল্পীতে সঙ্ঘবদ্ধ করেন; তবে তাহাতে আশানুরূপ ফললাভ হয় না। ইতিমধ্যে নানাসাহেব বিঠুরে চলিয়া যান; কিন্তু ইংরেজদের আগমনসংবাদে তিনি গতি পরিবর্তন করিয়া অযোধ্যার দিকে প্রস্থান করেন।

এদিকে তাঁতিয়া ১৮৫৮ সালের ২২শে জুন গোয়ালিয়রে পরাজিত হইয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে হটিতে থাকেন। তাঁহাকে ধরিবার জন্য ইংরেজপক্ষ নানারূপ ফাঁদ পাতে। কিন্তু কৌশলী সেনাপতি ইহার পরও নয়মাস কাল তাহাদের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সেনাসমাবেশ করিতে থাকেন। ২২শে জুনের পর ৭ই আগস্ট ভলবারা নামক স্থানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয়। কিন্তু তিনি অক্ষত শরীরে কামান ও সেনাসহ রণস্থল ত্যাগ করেন। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি প্রকাশ পায়। তাঁতিয়া পাঁচছয় দিন ঝালরপত্তনে অবস্থান করিয়া ইন্দোর অভিমুখে রওনা হন। এদিকে ইন্দোরের নানাস্থানে ইংরেজদের সহিত তাঁতিয়া রণকৌশলের পরিচয় দিলেও তেমন সুবিধা করিতে পারেন না। আবার ইংরেজরা বহুস্থানে তাঁহার বৃথাই পশ্চাদনুসরণ করে। অবশেষে জনৈক বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় এক গভীর অরণ্যে নিদ্রিতাবস্থায় তাঁতিয়া ধৃত হন। ইংরেজ আদালতের বিচারে ১৮৫৭ সালের জুন হইতে ১৮৫৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধচালনার দায়ে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং ১৮৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিল প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্যে পরিণত হয়।

সিপাহী বিপ্লবের অন্যতম নায়কের শোচনীয়ভাবে জীবন বিসর্জন বড়ই মর্মান্তিক; কিন্তু ইহা গর্বেরও। বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান

বিধাতানির্দিষ্ট কর্তব্য বলিয়া তিনি হৃষ্টচিত্তে দণ্ড গ্রহণ করেন। এদিকে তাঁহার পতনের সহিত মধ্য ভারতের সিপাহীযুদ্ধের অবসান ঘটে।

## ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

রাণী লক্ষ্মীবাঈ রূপময়ী, বুদ্ধিমতী ও শৌর্যশালিনী নারী। বাল্যে তিনি নানারূপ পুরুষোচিত ক্রীড়ায় পারদর্শিতা লাভ করেন। ঐসময় নানাসাহেব ও রাও সাহেবের তিনি খেলাসঙ্গিনী ছিলেন। তরুণ বয়সে বিধবা হইলেও তিনি সন্তানবতী ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র জন্মের ৩ মাস পর মারা যায়। কিন্তু দত্তক গ্রহণ করা সত্ত্বেও ইংরেজ কর্তৃপক্ষ স্বত্বলোপ নীতি অনুযায়ী ঝাঁসী হস্তগত করে। 'মেরি ঝাঁসী নেহী দেঙ্গী' বলিয়া দাবী জানাইলে তাহা অগ্রাহ্যই হয়। শুধু তাহাই নহে; তাঁহার প্রতি বহু অন্যায় আচরণও করা হইতে থাকে। তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন; সিপাহী অভ্যুত্থানের মধ্যে তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের এক মাহেন্দ্রক্ষণ দেখিতে পান।

১৮৫৭ সালের ৩রা জুন ঝাঁসীতে বিপ্লবের সূচনা প্রকাশ পায় এবং ৫ই জুন সমগ্র সিপাহীদল অভ্যুত্থান করিয়া শ্বেতাঙ্গদের নির্মূল করে। কিন্তু তখন পর্যন্ত ঐ ব্যাপারে তাঁহার কোন হাত ছিল না।

ঝাঁসী ইংরেজদের অধিকারচ্যুত হইবার পর রাণী লক্ষ্মীবাঈ নয়দশ মাস কাল সুনিয়মে রাজ্যশাসন করেন। কি সেনাচালনা, কি বিচারকার্য, কি শান্তিস্থাপন—প্রত্যেক বিষয়েই তাহার অসামান্য কার্যদক্ষতার স্ফূরণ হয়। রাজ্যরক্ষা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিরোধের বিষয়েও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি থাকে।

এদিকে ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে ইংরেজ সেনাপতি স্যর হিউ রোজ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈও বিপুল যুদ্ধসজ্জায় ব্যাপৃতা

হন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সেনাদল সংস্কার করেন এবং স্বয়ং সৈন্যচালনার ভার নেন। এই ব্যাপারে ঝাঁসীর বীর নারীরাও তাঁহাকে সহায়তা করিতে থাকেন। এদিকে নানাসাহেবের নিকট তিনি সাহায্য প্রার্থিনী হন। অল্প সময়ে অসাধারণ সংগঠনশক্তির পরিচয়ে ইংরেজরাও স্তম্ভিত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে ২১শে মার্চ ইংরেজসৈন্য ঝাঁসীতে উপস্থিত হয়। ঝাঁসী প্রাচীর-বেষ্টিত; উহার পরিধি সাড়ে চার মাইল। রাত্রে ইংরেজসৈন্য দুর্গ আক্রমণ করে। কিন্তু ২৩শে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম আক্রমণে ঝাঁসীর গোলন্দাজদের পরাক্রমে আক্রমণকারীদের উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায়। সমস্ত রাত রণবাদ্যের ভৈরবরবে চারিদিক মুখরিত হইয়া পড়ে এবং প্রভাত হইবামাত্র ঝাঁসীর গোলন্দাজরা আবার দুর্গপ্রাকার হইতে কামান দাগিতে থাকে। ঘনগর্জ নামক কামান হইতে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করায় ইংরেজ সৈন্য অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। কিন্তু ২৪শে তারিখে ইংরেজরা নগরের দক্ষিণ দিকে গোলাবর্ষণ করিয়া প্রাচীরের কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া ফেলে। যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে ইংরেজদের নিক্ষিপ্ত গোলায় নগরবাসীদের বিষম ক্ষতি হইতে থাকে। কিন্তু যেখানেই বলক্ষয় সেখানেই রাণীর উপস্থিতি। তিনি নিরলসভাবে সকলকে সমভাবে উৎসাহিত করিতে থাকেন। একদিকে অসীম দৃঢ়তা, অন্যদিকে কোমলতার সংমিশ্রণে তিনি মহিমময়ীরূপে প্রতিভাত হইতে থাকেন।

২৫শে তারিখে রাণীর গোলন্দাজ গোশ খাঁ দক্ষিণ দিকের বুরুশ হইতে এরূপ তীব্রভাবে গোলাবর্ষণ করিতে থাকে যে, উহাতে আক্রমণকারীদের তোপ বন্ধ হইয়া যায়। এইভাবে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তিনি আক্রমণ ও আত্ম-রক্ষায় অভূতপূর্ব পরাক্রম প্রকাশ করেন। সুশিক্ষিত সৈন্য বা উৎকৃষ্ট সমরোপকরণ না থাকা সত্ত্বেও তিনি যে অদ্ভুত রণকৌশলের পরিচয় দেন, তাহাতে ইংরেজ সৈনানায়কের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ইংরেজদের

যাবতীয় উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায়। লক্ষ্মীবাঈ-এর ক্ষমতা দর্শনে ও উৎসাহবাক্যে স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা পর্যন্ত যুদ্ধে স্ব স্ব সাধ্যমত নানাভাবে সহায়তা করিতে থাকে। ঝাঁসীর দৃঢ়সঙ্কল্প সেনাদের গোলাগুলি নিঃশেষ হইলেও এবং দুর্গমধ্যে বহু নরনারী হতাহত হইলেও ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তাহারা দুর্গে ইংরেজদের প্রবেশ করিতে দেয় নাই।

এদিকে নানাসাহেবের নির্দেশে ২০ হাজার সৈন্য লইয়া তাঁতিয়া তোপী অবরুদ্ধা লক্ষ্মী বাঈকে উদ্ধারের জন্য উত্তর দিক হইতে আক্রমণ করেন। ইহাতে ইংরেজ সেনাপতি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রথম দিকে তাঁতিয়া পরাজিত হন। ইহাতেও রাণীর পরাক্রম হ্রাস পাইল না। অবশেষে ৩রা এপ্রিল ইংরেজ সেনা নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাণী ৪ঠা এপ্রিল রাজ্য ত্যাগ করেন। ১৩ দিন ঘোর যুদ্ধের পর ঝাঁসী পরাজয় স্বীকার করে।

রাণীর প্রস্থানের পর ঝাঁসীতে ভয়াবহ 'বিজন' ( হত্যাকাণ্ড ) আরম্ভ হয়। পাঁচ হাজার অধিবাসীকে হত্যা করা হয় বলিয়া প্রকাশ। বহু মহিলা সম্ভ্রম রক্ষার জন্য কূপে ঝাঁপ দিয়া মৃত্যু বরণ করে। ঝাঁসীর দুর্গ ও নগর লুণ্ঠিত হয়।

বিপর্যয়েও রাণী হতোদ্যম হইলেন না; কাল্পীতে উপনীত হইয়া তিনি নানাসাহেবের নিকট সেনা সাহায্য চান। তাঁতিয়া তোপীর নেতৃত্বে সেনাদল কুঁচ নামক স্থানে এবারেও পরাজিত হয়। রাণী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরামর্শ গৃহীত হয় নাই। পরাজিত হইলেও তিনি সেনাদল সহ অপূর্ব কৌশল ও শৃঙ্খলার সহিত পশ্চাদপসরণ করেন।

কুঁচে পরাজয়ের পর কাল্পীর ছয় মাইল দূরবর্তী গলাবলীতে আবার যুদ্ধ হয়। রাণী মাত্র আড়াই শত অশ্বারোহী সৈন্য চালনার ভার পান। দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানেও তাঁহারা পরাজিত হন। এদিকে কাল্পীতে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে তাঁহার

পরাক্রমে ইংরেজ সৈন্য একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে। তাঁহার সমরকুশলতায় প্রতিপক্ষগণ প্রায় পরাজিত হয়। সেবার নূতন সেনা আসিয়া না পড়িলে ইংরেজদের পরাজয় অবধারিত ছিল।

কিন্তু পরাজয়েও তিনি দমেন নাই। তিনি নবোদ্যমে নূতন কৌশল উদ্ভাবন করেন। অপূর্ব রণচাতুর্য ও সেনাচালনা করিয়া তিনি বিপুল গোয়ালিয়র বাহিনীকে পরাজিত করেন ও নানাসাহেবকে মহারাষ্ট্রের পেশবা ও রাও সাহেবকে গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু রাও সাহেবের অব্যবস্থায় রাণী বিরক্ত হইয়া উঠেন। এদিকে ১৬ই জুন মোরার ইংরেজদের অধিকারে যায়। এই হেতু গোয়ালিয়রের পূর্বভাগ রক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। সৈন্যসজ্জা ও শৃঙ্খলারক্ষায় তিনি সকলকে অতিক্রম করেন।

১৮ই জুন ফুলবাগের রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী পার্বত্য ভূখণ্ডে উভয় পক্ষে সারাদিন যুদ্ধ হয়। পুরুষবেশে রাণী অশ্বপৃষ্ঠে সেনাদের উৎসাহিত করিতে থাকেন। কিন্তু এত করিয়াও জয়লাভ হইল না। রাণী অপর একটি অশ্বে রণস্থল ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে উহাই হয় কাল। পশ্চাদ্ধাবিত ইংরেজ সৈন্যের সহিত অসিযুদ্ধে রাণীর মস্তকের দক্ষিণ ভাগ বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু তিনি আক্রমণকারীদের অনেককে নিহত করেন। তাঁহার বুকে সঙ্গীনের আঘাত লাগে। আহতাবস্থায়ও রাণী আক্রমণকারীদের প্রাণনাশ করেন। অতঃপর নিকটবর্তী পর্ণশালায় দত্তকপুত্র গঙ্গাধর রাওয়ের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে বীরাঙ্গনা অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন। ইংরেজ সেনাপতি স্যর হিউরোজ বলেন যে, যদিও তিনি নারী তথাপি বিপক্ষ দলের মধ্যে তাঁহার সর্বাধিক রণদক্ষতা ছিল। ম্যালেসন সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার দেশের জন্য প্রাণধারণ করেন, দেশের জন্যই প্রাণত্যাগ করেন।

## বিপ্লববিরোধী সামন্ত শক্তি

সিপাহী অভ্যুত্থানের সময় উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সামন্ত নৃপতিবর্গের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আচরণ সম্পর্কে ইংরেজ শাসকরা নিরতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়ে। অবশ্য অন্যান্য প্রদেশ বিশেষত পাঞ্জাব, কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানের সামন্ত নৃপতিদের সম্পর্কেও তাহাদের ভাবনা এমন কিছু কম ছিল না। যাহাদের একদা নানাছলে ও কৌশলে অধিকারচ্যুত ও ইংরেজ-আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছিল, তাহারাই যে বিপ্লবের সংঘাতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইবে, তাহা ইংরেজ শাসকবর্গের অজানা থাকিবার কথা নয়। তাহারা জানিত, সিপাহী অভ্যুত্থানের সহিত সামন্তদের সম্মিলিত শক্তির যোগাযোগ ঘটিলে ইংরেজ শক্তির বিলোপ অনিবার্য। এই হেতু তাহারা রাজন্যদের স্বীয় পক্ষভুক্ত রাখিবার জন্য যত্নবান হয়। এই ব্যাপারে তাহাদের উদ্দেশ্য সফলও হয়। পাঞ্জাবের পাতিয়ালা, নাভা (নাভারাজ সম্প্রতি নির্বাসিত), ঝিন্দ প্রভৃতি সামন্ত রাজ এবং কাশ্মীর-রাজ শেষ পর্যন্ত ইংরাজের পক্ষে থাকিয়া নষ্টগৌরব ও সাম্রাজ্য-ভ্রষ্ট ইংরেজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। স্বদেশের দাসত্ব কায়েমে অদ্যাবধি সামন্ত রাজ্যগুলি ভারতে ইংরেজ শাসনের অন্যতম মূলস্তম্ভ।

ব্যতিক্রম সর্বত্রই আছে, এক্ষেত্রেও ছিল। কিন্তু তাহাও ক্ষমতাচ্যুত ও রাজ্যভ্রষ্ট সামন্তদের মধ্যে। এদিকে গোয়ালিয়রের তরুণ বয়স্ক মহারাজ জয়াজী শিন্ধে ইংরেজ পক্ষে থাকিলেও তাঁহার অধীন ইংরেজচালিত সৈন্যরা ১৮৫৭ সালের ১৪ই জুন অভ্যুত্থান করে এবং ইন্দোরের তুকাজী রাও হোলকার চতুর্দিকে বিপ্লবরশ্মি জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়ে। ১লা জুলাই হোলকারের দুই দল পদাতিক কোম্পানীরাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলে

সকলে হতবাক হইয়া যায়। রেসিডেণ্ট সহ সমুদয় ইংরেজ অন্যত্র পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করে। সিপাহীদের সঙ্গে জনসাধারণও উত্তেজিত হইয়া উঠে। ইন্দোরে শাসন-শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যায়।

রাজপুতনা সম্পর্কেও ইংরেজদের বিশেষ চিন্তার উদ্রেক হয়। মেবার, জয়পুর, মারবাড় প্রভৃতি ১৮টি রাজ্য লইয়া রাজপুতনা গঠিত। কিন্তু উহারা প্রত্যেকে স্বপ্রধান ছিল। তাহাদের পূর্ববর্তিগণ পিণ্ডারী ও মারাঠাদের নিপীড়ন হইতে ত্রাণের আশায় ইংরেজের অধীনতামূলক মিত্রতা স্বীকার করিয়া নেয়। এই এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বর্গ মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ডের সাহসী ও দুর্ধর্ষ জনগণ বিপ্লবে যোগ দিলে ইংরেজের শাসনভিত্তি টলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রাজপুত নরপতিরা সকলেই সিপাহী অভ্যুত্থানকালে ইংরেজ পক্ষের সহায়তা করে। একমাত্র এই কারণের জন্যই দেশীয় রাজাদের ডালহাউসীর অনুসৃত স্বত্বলোপ ব্যবস্থার আমলে না আনিয়া তাহাদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি বহাল রাখা হয়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ১৮৫৮ সালে দেশীয় রাজাদের সহিত ব্যবস্থায় ভারতে ইংরেজ শাসনের দ্বিতীয় আত্মরক্ষার ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

## বৃটিশ পক্ষে শিখ ও নেপালী

ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর ৪টি শক্তিস্তম্ভ ছিল : যথা (১) হায়দরাবাদের স্যর সালার জঙ্গ (২) গোয়ালিয়রের স্যর দিনকর রাও (৩) নেপালের স্যর জঙ্গ বাহাদুর এবং (৪) পাঞ্জাবের শিখ।

অভ্যুত্থানের মাত্র আট নয় বৎসর পূর্বে বিচ্ছিন্ন ও আত্মকলহপরায়ণ শিখ ক্ষাত্র শক্তি কোম্পানীর নিকট অপমানিত ও হতমান হয়। তাহারা যে কেন ইংরেজদের সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিল তাহা অনেক সময় দুর্বোধ্য মনে

হয়; বরং তাহাদের পক্ষে লুপ্তগৌরব ও হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করাই ছিল স্বাভাবিক।

কিন্তু ভেদবুদ্ধি ও ক্ষমতালিপ্সা ব্যক্তিবিশেষের মত জাতিকেও নিম্নাভিমুখী করে। রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর তাহাদেরও সেই দশা ঘটে। প্রথমত শিখ রাজ্য স্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্য আর তাহাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা যোগায় না; দ্বিতীয়ত অর্থ, ক্ষমতা ও আরামপ্রিয়তা তাহাদের চারিত্রিক দৌর্বল্য ঘটায়; জাতীয় চরিত্রের দৃঢ়তা ও নৈতিক মনোবলও তাহাদের হ্রাস পায়। অধিকন্তু বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব ও নিজেদের জাতীয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞতাও তাহাদিগকে ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী কোম্পানীর অনুগত করিয়া তোলে। ইংরেজরা শিখদের এই জাতীয় চরিত্রের অবনতির সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করে।

লর্ড জন লরেন্স ছিলেন এই সময় পাঞ্জাবের শাসনকর্তা; যেমনি ছিলেন তিনি দুর্ধর্ষ, তেমনি কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি বিদ্রোহের পূর্বাভাস পাইয়াছিলেন; এই হেতু পূর্ব হইতে তিনি প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বিচ্ছিন্ন অথচ বীর্যবান পাঞ্জাবী বিশেষত শিখদের যেকোন উপায়ে হাত করিতে পারিলে আসন্ন সামরিক পতন হইতে আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে। তিনি প্রথমেই পাঞ্জাবকে আর্থিক দিক হইতে নির্বীর্য করিবার ব্যবস্থা করেন। মিঃ বসওয়ার্থ স্মিথ লরেন্সের জীবনীতে লিখিয়াছেন—"বিদ্রোহের প্রাক্কালে বা প্রথমাবস্থায় পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলা হইতে বলপূর্বক সরকারী ঋণ আদায় করা হয়, অথচ অর্থগৃধ্নু শিখরা এক 'সন্দেহজনক ব্যাপারে' ঋণদানের পক্ষপাতী ছিল না। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করা হয়। * * যখন অর্থের প্রয়োজন সর্বাধিক তখন এই টাকা আমাদের অশেষ কাজে লাগে। ইহার ফলে পাঞ্জাবী বণিক ও জমিদার শ্রেণী কোম্পানীকে সহায়তা করিতে বাধ্য হয়।"

তাহা ছাড়া এই ক্ষেত্রে বৃটিশ কূটনীতিরও জয় হয়। মোগল শাসনের

শেষ দিকে কয়েকজন শিখগুরুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। এই হেতু গুরু গোবিন্দ ও বান্দার শিষ্য-প্রশিষ্যদের দিল্লীর বিরুদ্ধে জাতক্রোধ ছিল ; প্রতিশোধলিপ্সু হইলেও প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। কিন্তু সিপাহী অভ্যুত্থানকালে এই সুযোগ উপস্থিত হয় ; স্যর জন ( পরে লর্ড ) ইহার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করেন। তিনি শিখদের দিল্লী লুণ্ঠনের আশা দিয়া সেনা-দলে গ্রহণ করেন ; ১৮৫৮ সালে স্যর ফ্রেডারিক কুরীর নিকট লিখিত পত্রে তিনি স্বীকার করেন—"ঈশ্বরের অনুগ্রহে পাঞ্জাবের জনসাধারণের আনুগত্যে ভারত রক্ষা পাইয়াছে। পাঞ্জাব আমাদের পিছনে না থাকিলে আমরা ধ্বংস হইয়া যাইতাম।"

তারপর গুর্খাদের ব্যাপারেও অনুরূপ সুযোগ গৃহীত হয়। নেপাল যুদ্ধের সময় অযোধ্যা ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি ছিল এবং তৎকালে উহার নবাব যুদ্ধচালনায় তাহাদের অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। যুদ্ধে গুর্খারা হারিয়া গিয়া ইংরেজদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে, কিন্তু অযোধ্যার শত্রুতামূলক আচরণের কথা বিস্মৃত হয় না। এই হেতু সিপাহী অভ্যুত্থানের সময় ওয়াজিদ আলীর পুত্র বিদ্রোহীদের সহিত সহযোগিতার জন্য নেপাল অধিপতির নিকট আবেদন জানাইলেও তাহা ব্যর্থ হয়। বরং ইংরেজেরা যখন বিদ্রোহদমনে তাহাদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয় তখন তাহারা হৃষ্টচিত্তে অযোধ্যাকে সায়েস্তা করিবার সুযোগ নেয়। নেপালীদের আক্রোশ এতই প্রচণ্ড ছিল যে, 'লক্ষ্ণৌর পথে' অভিযানকালে স্যর জঙ্গ বাহাদুর 'পাঁচ ছয় হাজার অযোধ্যা-বাসীকে হত্যা করার' গৌরব অনুভব করেন। এইভাবে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে লেলাইয়া দিয়া, একের আক্রোশ ও বীতস্পৃহাকে অন্যের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইয়া, এক স্বার্থের বিরুদ্ধে অপর স্বার্থকে খাড়া করিয়া ইংরেজ পাকেচক্রান্তে সিপাহী বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হয়। ভারত শাসন ব্যাপারে ভেদনীতির সার্থক প্রয়োগ ইহাই প্রথম।

## বিপ্লবের আহুতি

সিপাহী অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইয়া যায় বটে; কিন্তু এখানেই ইহার শেষ হয় না। ইংরেজদের সমুদয় পুঞ্জীভূত আক্রোশ ও রোষ নির্মম-প্রতিশোধের আকারে তৃপ্তি খুঁজিতে থাকে; ভারতবাসীদের পাইকারী হত্যা, জরিমানা, গৃহদাহ ও লুণ্ঠন রেওয়াজ হইয়া উঠে; দোষীনির্দোষ ভেদাভেদজ্ঞান লোপ পায়; পশুপক্ষীর মত নির্বিচারে তাহাদের প্রাণসংহার করা হইতে থাকে। কোম্পানীর কু-শাসন হইতে মুক্তি চাহিবার অপরাধে দুই লক্ষ ভারতবাসী আত্মাহুতি দেয়। এই মূল্য বড় সামান্য নহে।

পক্ষান্তরে, অভ্যুত্থানকালে ভারতবাসী যে ইংরেজদের প্রতি নৃশংস আচরণ না করিয়াছে এমন নহে; কিন্তু তাহা বৃটিশ-অনুষ্ঠিত নির্যাতনের তুলনায় নিতান্তই সুসভ্য ও নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হয়। দুই এক ক্ষেত্র ছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরেজ নারী ও শিশুদের নিষ্কৃতি দেওয়া হয়: ভারত-বাসীরাই তাহাদের হয় নিরাপদে রাখে, নয় নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করে।

বিচারপতি ম্যাককার্থী লিখিয়াছেন যে,—"ইংরেজ নারীদের উপর বাধ্যতামূলক ধানভানা ছাড়া অপর কোন প্রকার অসম্মানজক ব্যবহার বা নারীদের উপর কোনরূপ নির্যাতন বা তাহাদের কাহাকেও নগ্ন অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদের হত্যা করা হয় নাই।"

'পাইওনিয়ার'এ বলা হয়—"একথা সত্য, লক্ষ্ণৌ ও কানপুরের মত সহর অধিকৃত হইবার পর অপভাষী ভারতীয়দের খবরের উপর নির্ভর করিয়াও বহু নির্দোষ হিন্দুকে সরাসরি ফাঁসি দেওয়া হয়।"

শুধু তাহাই নহে, ইচ্ছাপূর্ব্বকও এইরূপ বর্বর আচরণের আশ্রয় লওয়া হয়।

"সামরিক আইন জারী হয়। বিচারে ও বিনাবিচারে সামরিক ও অসামরিক নির্বিশেষে বহু নরনারীকে ফাঁসিতে লটকান হয়। গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক পার্লামেণ্টে প্রেরিত কাগজপত্রে জানা যায় যে বিদ্রোহীদের 'সহিত বৃদ্ধা নারী ও শিশুদেরও বলি দেওয়া হয়।' যাহাদের ইচ্ছাপূর্বক ফাঁসী দেওয়া হয় নাই, তাহাদের নিজ নিজ গ্রামে পোড়াইয়া মারা হয়; ইহাদের কতকাংশকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। * * * ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমর্থিত এক পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, "তিনমাস কাল প্রতিদিন মৃতদেহ-ভর্তি আটটি গাড়ী সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শব আনয়নের জন্য যাতায়াত করিত। ঐ সব শব চৌমাথা ও বাজারে ঝুলান ছিল। এইভাবে ছয়হাজার লোককে সরাসরি মৃত্যুর কবলে পাঠান হয়।" তাহা ছাড়া দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতাহেতুও কম বিপত্তি ঘটে নাই। ১৮৫৮ সালে জনৈক যুবক অফিসার হিন্দুস্থানী শিখার পর বলিয়া উঠে, "ওঃ, গত বছর বহু স্থানীয় অধিবাসীকে বহুকাল গ্রামে না থাকার অপরাধে ফাঁসি দিয়াছি। আমার মনে হয়, তাহারা বহুকাল গ্রামে বাস করিতেছে, এই কথাই তাহারা বুঝাইতে চাহিয়াছিল।' একথা স্থির নিশ্চয়, দেশীয় ভাষার অজ্ঞতাহেতু বিদ্রোহ দমনকালে অভিযুক্তদের সাক্ষ্য প্রমাণের বা আত্মপক্ষ সমর্থনের ভাষা অবোধ্য থাকায় ফাঁসি হইয়া যায়।" (Dilke's Great Britain.)

সিপাহী বিপ্লবের ইতিহাসে ইংরাজের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা ও প্রতিহিংসার আরও অসংখ্য কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ইহারা দিল্লীর ঘটনার পর 'পথিমধ্যে সাতজন লম্বরদারের (ইজারাদার) ফাঁসি দেয়' ও চারটি গ্রাম জ্বালাইয়া দেয়। ইংরেজ মহিলাদের হত্যা করা হইয়াছে, এই সন্দেহে তাহাদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন করা হয়।' (Ball, Indian mutiny, vol. I p. 166). আর একজন সেনানী (সেনাপতি নীল) এলাহাবাদ হইতে যাত্রাকালে এত লোক বধ করে যে, শেষে জনৈক অফিসার আর

লোক মিলিবে না বলিয়া তাহাকে সর্বধ্বংস হইতে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করে। (Russell, Diary vol. I p. 222). খৃষ্টান সৈনিকপুরুষরা নিরস্ত্রদের গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে, হিন্দুর দেবমন্দির নষ্ট করিয়াছে, এমন কি শরণাগত নিরপরাধ বালকেরও প্রাণনাশ করিয়াছে। (Russell, vol. I p. 219, 220, 348)

## ফলাফল

অভ্যুত্থান দমনের পরিণাম পরাজিত ভারতীয়দের পক্ষে মোটেই শুভ হয় নাই; হইতে পারেও না। তাহারা শাসক সম্প্রদায় হইতে ত বটেই, নিজেদের মধ্যেও পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইংরেজ শাসনের সংস্পর্শে আসিয়া যদিও বা কিছু আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্তের সুবিধা হইয়াছিল, তাহাও ইহার ফলে ভাটা পড়ে। অধিকন্তু ভারতবাসীদের প্রতি ইংরেজদের ঘৃণা ও ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়া যায়। শুধু ইহা হইলেও বাঁচোয়া ছিল; বিজেতা ইংরেজ বিদ্রোহী মুসলমানদিগকে বিদ্রোহী হিন্দুদের চেয়ে অধিকতর সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকে। অবশ্য একথাও সত্য, মুসলমানগণ সাধারণভাবে অভ্যুত্থানে অধিক পরিমাণে সমর্থন ও সহানুভূতি যোগায়; আর উভয় সম্প্রদায় একই সময় বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেও মুসলমানরাই যে ঐতিহাসিক ও আদর্শগত কারণে হিন্দুদের চেয়ে বেশী বৃটিশবিদ্বেষী হয়, ইহাও নিঃসন্দেহ। সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছাড়াও বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধতা করা মুসলমানেরা ধর্মীয় অনুশাসন বলিয়া বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। এই হেতু ইংরেজদের সকল আক্রোশ মুসলমানদের উপর পড়ে; দোষীনির্দোষ নির্বিচারে তাহাদের উপর দণ্ডাদেশ হইতে থাকে; তাহাদের সমুদয় সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয়; ইহার ফলে মুসলমানদের

মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহারা মাথা নোয়ায় নাই। দীর্ঘকাল তাহারা সর্বপ্রকারে ইংরেজ শাসন ও সংস্কৃতিতে উপেক্ষা করার মনোভাব দেখাইতে থাকে; ইংরেজদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ বা তাহাদের সভ্যতার অনুকরণ তাহাদের প্রকৃতিবিরোধী ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। বরং তাহারা প্রাচীন রীতিনীতি, সংস্কার ও গোঁড়ামীর পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। ইহাতে আর যাহাই হউক, প্রগতিশীল আন্দোলনে তাহারা পশ্চাদ্‌গামী হয়; এই হেতু প্রগতিশীল হিন্দুকে তাহারা নিজেদের পশ্চাদ্‌গামিতার কারণ অনুমান করিয়া অনেকটা প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া জাতীয় জীবনে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকিবার চেষ্টা করে।

সাম্প্রদায়িক জীবনে এইভাবে বিভেদ সৃষ্টির অবসর ঘটে। কিন্তু ইংরেজ সরকার আরও উপলব্ধি করে যে, শাসন-ব্যবস্থা-টিকাইয়া রাখিতে হইলে সেনাবিভাগকে ঢালিয়া সাজিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে দেশীয় সৈন্যদের সংখ্যা অর্ধেক এবং ইউরোপীয় সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি, আর গোলন্দাজ বাহিনী পুরাপুরি ইংরেজ সৈন্যে ভর্তি করা হয়। নবগঠিত দেশীয় সৈন্যের মধ্য হইতে উচ্চবর্ণের জাতিদিগকে বাদ দিয়া নিম্নবর্ণের হিন্দু, গুর্খা, শিখ, উপজাতীয় লোক ও পাঠানের মধ্যে রংরুট সীমাবদ্ধ করা হয়। প্রধানত মধ্য-প্রদেশ, অযোধ্যা ও বিহারবাসীদের লইয়া গঠিত 'বেঙ্গল আর্মি' রাতারাতি 'পাঞ্জাবী আর্মিতে' রূপান্তরিত হইয়া যায়। জনসাধারণের বাহিনীতে পরিণত হইবার মত সামান্য মাত্র সম্ভাবনাও না থাকে এমনি করিয়া আঁটঘাট বাঁধিয়া নূতন সৈন্যবাহিনীকে ভাড়াটিয়া সৈন্যে পরিণত করা হয়। মস্তিষ্ক চালনায় সমর্থ কোন শ্রেণীর ইহাতে স্থান হয় না। ভারতীয় বাহিনীতে সামরিক ও অ-সামরিক শ্রেণী-সৃষ্টির ইহাই আদি পর্ব।

ইহাও যথেষ্ট নহে বিবেচনা করিয়া বৃটিশ সরকার ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল ঘাঁটিসমূহ দৃঢ়তর করিবার জন্য সামন্ত নরপতি ও জমিদারদের সর্বোপায়ে

পোষকতা করিতে সঙ্কল্প করে। অযোধ্যার দুই তৃতীয়াংশ তালুকদারকে অভ্যুত্থানদমনে সহায়তার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৫৬ সালের চেয়েও অধিকতর সুবিধাজনক সর্তে জমিদারীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। মধ্যপ্রদেশে মালগুজারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং পাঞ্জাবের একাংশে ৪৬ হাজার চাষীর দুই তৃতীয়াংশকে এক কলমের খোঁচায় ভূমিস্বত্বহীন চাষীতে পরিণত করা হয়। বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যে-সামন্ত শ্রেণী বিদ্রোহ করে তাহাকেই আবার কায়েম করার ব্যবস্থা হয়। ইহাই স্ববিরোধিতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

তাহার পর সামাজিক অগ্রগতির পথেও বাধা স্থাপন করা হইতে থাকে। নারীশিক্ষা ও বহু বিবাহ-নিরোধ ব্যবস্থা প্রভৃতি সমাজ সংস্কারজনক ব্যবস্থাকে সরকার পক্ষ হইতে কোনরূপ উৎসাহিত করা হয় না। পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ-নিরোধ বিধান আইনসভায় গৃহীত হয় নাই। দেশীয় আচার ব্যবহার ও সংস্কারের প্রতি এমনই অহেতুক শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইতে থাকে যে, ইহাকে উপেক্ষা বলিয়া অভিহিত করাই সঙ্গত। বরং জাতীয় ঐক্যের প্রতিবন্ধক বলিয়া শ্রেণীগত মনোভাবে শাসকরা উস্কানিই দিতে থাকে। এদিকে বৈষয়িক দিক হইতে ভারতের সহিত ইংল্যাণ্ডের গাঁটছড়া বাঁধা পড়ে। ভারতে ইংরাজের আর রাজ্যসম্প্রসারণ ঘটে না বটে, কিন্তু তাহার বাণিজ্যের পরিমাণ প্রাক্-বিদ্রোহকালীন অবস্থার চেয়ে শতকরা ৩৬০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ভারতের রাজনীতিক পরাধীনতার সহিত বৈষয়িক পরাধীনতাও কায়েম হয়। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হইতে ভারতের অন্তরাত্মা মুক্তির জন্য আকুলিবিকুলি করিতে থাকে।

## পরিকল্পনা ও ব্যর্থতার হেতু

সিপাহী অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইল কেন, এসম্পর্কে নানা কারণ উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কেহ বলিয়া থাকেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাব—বাহাদুর শাহকে রাজশক্তির প্রতীক করিয়া তোলায় শিখ ও নেপালীদের বিরুদ্ধতা, কেহ বা বলেন, বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থানকারী সেনাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না, দেশের সর্বত্র অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও পারস্পারিক বুঝাপড়ার অভাব দেখা দেয় এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতালিপ্সা মাথা চাড়া দেয় এবং কোন অঞ্চলে আবার জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন সত্ত্বেও অধিকাংশ স্থলে তাহাদের সাড়া পাওয়া যায় নাই।

মোটামুটি এসবই সত্য। তবু ব্যর্থতার কারণ সমূহকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ যথা, (১) external বা বহির্ভারতীয় ও (২) আভ্যন্তরীন। প্রথম কারণসমূহ বিদ্রোহীদের ধারণা ও আয়ত্তের বহির্ভূত ছিল এবং দ্বিতীয় কারণের উদ্ভব হয় বিদ্রোহীদের সমরকৌশল, দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক সংস্কার হইতে।

প্রথমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিপন্ন ইংরেজ রাজশক্তির অবস্থা ১৮৫৭ সালে উন্নতির দিকে যায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সমরনীতিতে তাহাদের যে ঘোরতর সঙ্কট দেখা দিয়াছিল তাহা ক্রিমিয়া ও চীনের যুদ্ধাবসানে দূর হইয়া যায়। তারপর আফগানীস্থানের সহিত মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনে এবং পারস্যের পরাজয়ে তাহাদের অবস্থা আরও ভাল হয়। এ হেন অবস্থায় ভারতীয় অভ্যুত্থানকারীরা আন্তর্জাতিক দিক হইতে একঘরে ও কোণঠাসা হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়ত, বৃটেনের একচ্ছত্র নৌ-প্রাধান্য থাকায় ভারতে সৈন্য ও রণসম্ভার বৃদ্ধির পক্ষে অশেষ সহায় হয়। বিদ্রোহ দমনে প্রায় ৬ লক্ষ ইংরেজ

সৈন্য আমদানী এবং ৩ লক্ষ ১০ হাজার ভারতীয়কে সেনাদলভুক্ত করা হয়। তাহা ছাড়া ইংরেজ পক্ষীয় সৈন্য আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত ছিল। সে তুলনায় সিপাহীরা অস্ত্র ও গোলাগুলির অভাব মিটাইবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্যদলকে রণাঙ্গনে পাঠাইত। শুধু এনফিল্ড রাইফেল ও দূরপাল্লার কামানই নহে, আধুনিকতম যোগাযোগ ও সংবাদ আদানপ্রদানের সুব্যবস্থাও যেমন, টেলিগ্রাফ, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। বস্তুত, বিজ্ঞানে উন্নত ইংরেজগণ মধ্যযুগীয় সিপাহীদের বিরুদ্ধে প্রধানত এই জন্য যুদ্ধে জয়লাভ করে।

কিন্তু সিপাহীরা সমরাস্ত্রের দিক হইতে নিজেদের অসুবিধার বিষয়ে সম্যক অবহিত থাকে। এই হেতু তাহারা প্রধানত অতর্কিত আক্রমণ ও গেরিলা রণকৌশলের উপর জোর দেয়।

তাহারা সরকারী কোষাগার দখল, বন্দীদের মুক্তি দান এবং সুপরিকল্পিত ভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত করিতে থাকে। এগার বার হাজার বন্দীকে তাহারা মুক্তি দেয়; সরকারী কোষাগারের কোটি কোটি টাকা হস্তগত করে; রেললাইন ও টেলিগ্রাফের তার তাহাদের অন্যতম আক্রমণের লক্ষ্যে পরিগণিত হয়। রেলওয়ে জংশন রাণীগঞ্জের উপর বিদ্রোহ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ চালান হয় এবং আনুমানিক ২ হাজার মাইল টেলিগ্রাফ তার বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও নিরাপদ ছিল না। কিন্তু ইংরেজসেনার শ্রেষ্ঠতর রণকৌশল, সেনাসংগঠন এবং রণসম্ভার সম্পর্কে বিদ্রোহীরা সচেতন ছিল। বেরিলীর খাঁ বাহাদুর খাঁ নিম্নরূপ ঢালাও আদেশ জারী করেন :—

"বিধর্মীদের নিয়মিত সৈন্যের মুখামুখী হইতে চেষ্টা করিও না; তাহারা তোমাদের চেয়ে অধিকতর সুশৃঙ্খল ও তাহাদের বন্দোবস্তও পাকা; তাহা ছাড়া তাহাদের বড় বড় কামান আছে। বরং তাহাদের সেনাচালনা পর্যবেক্ষণ কর; নদীর ঘাটসমূহে চৌকী দাও; তাহাদের

চিঠিপত্রাদি হস্তগত কর, খাদ্যাদি সরবরাহ বন্ধ কর। তাহাদের চিঠির থলিয়া ও ডাক কাট, এবং সর্বক্ষণ তাহাদের শিবিরসমূহের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান কর ; তাহাদের বিশ্রাম করিতে দিও না।"

মিঃ এ ডাফ নামক জনৈক অসামরিক ইংরেজ কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণে বলা হইয়াছে, "শত্রুকে সবসময়ই পরাভূত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার কামানসমূহ হস্তগত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও সে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সেনাসন্নিবেশ করিয়াছে এবং নূতন সঙ্ঘর্ষের অন্য তাহাকে প্রবৃত্ত দেখা গিয়াছে। যে মুহূর্তে একটি সহর দখল বা একটি সহর হইতে শত্রুকে বিতাড়িত করা হইতেছে, সেমুহূর্তে আবার অপর দিকে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। একটি জেলা নিরাপদ বলিয়া ঘোষিত হইবার সঙ্গে অন্য একটি জেলা বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে ; গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সহিত যোগাযোগকারী একটি রাজপথ যাতায়াতের পক্ষে উন্মুক্ত ঘোষিত হইবার সহিত উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং এক বছরের মত সমুদয় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। একটি অঞ্চল হইতে যেই বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করা হইল অমনি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তাহাদের পুনরাবির্ভাব ঘটিল। যেক্ষণে একটি সৈন্যদল শত্রু সেনাব্যূহ ভেদ করিল, তাহার পরক্ষণেই তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত ভূমিখণ্ড শত্রুর হাতে চলিয়া গেল। শত্রুসৈন্যের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার সঙ্গে তাহা অবিলম্বে পূরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং স্থায়ীভাবে তাহাদের কোন অঞ্চল হইতে বিতাড়ন অসাধ্য বলিয়া মনে হয়।"

তাহা ছাড়া যে-অভ্যুত্থান যুগপৎ সকল স্থানে ২৩শে জুন (১৮৫৭) পলাশীর শতবার্ষিকীর দিনে ঘটিবার কথা ছিল, তাহা নিতান্তই অসময়ে ১০ই জুন শুধু মীরাটে ঘটে। অসময়ে বিদ্রোহ ঘটায় সমস্ত পূর্ববিন্যস্ত পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যায়। কাজেই উপায়ান্তর না থাকায় যদৃচ্ছ বিপ্লবের প্রসার ঘটাইয়াই অভ্যুত্থানের এই প্রাথমিক অসুবিধা দূর করার চেষ্টা হয়।

মিঃ উইলসন নামক ঐতিহাসিক বলেন,—"...১৮৫৭ সালের ২৩শে জুন সমস্ত সিপাহী সৈন্যের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার দিন স্থির হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে এক সমিতি গঠিত হয়। প্রতি সৈন্য দলের ৩ জন করিয়া সেনা ঐ সমিতির সদস্য ছিল, সমিতি অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের সমুদয় বন্দোবস্ত করিতে থাকে। * * * পূর্বোক্ত দিন সকল স্থানের সমস্ত ইউরোপীয়কে বধ করিতে হইবে, খাজাঞ্চিখানা অধিকার করিতে হইবে, কয়েদীদের খালাস করিতে হইবে,—সমিতি ইহা সমস্ত সিপাহীর গোচরে আনে। দিল্লীতে যে সৈন্য ছিল তাহাদিগকে দিল্লী ও উহার নিকটবর্তী অস্ত্রাগার ও দুর্গ অধিকারের নির্দেশ দেওয়া হয়। সিপাহীরা গোপনে গোপনে যে আয়োজন করিতেছিল ৩ সপ্তাহ পূর্বে তাহার কোনও বিষয় সাধারণকে জানাইতে ইচ্ছা করে নাই। কিন্তু হঠাৎ ১০ই জুন রাত্রে ইহার প্রথম চিহ্ন প্রকাশ পায়।"

ইহাতে সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা বিন্যাসের কথাই প্রমাণিত হয়। সাফল্য লাভ হয় নাই বলিয়াই সুস্থির পরিকল্পনার অভাবের কথা বলা হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকের কথায় প্রকাশ—'ইংরেজরা যেরূপ নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহাতে সিপাহীরা উক্ত নির্দিষ্ট দিনে সহসা ভারতের সকল স্থানে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম করিলে * * * ভারতবর্ষ পুনরায় জয় করা আমাদের পক্ষে দুরূহ হইত। * * * মিরাটের ঘটনার পরই দেশের সর্বত্র এই দুঃসংবাদ প্রচার হইয়া পড়ে; ফলে বিচ্ছিন্ন হইলেও ইংরেজরাও সমবেতভাবে আত্মরক্ষার যথোচিত উপায় অবলম্বন করে।"

আরও কয়েকটি লক্ষণ বিদ্রোহীদের সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার সাক্ষ্য দেয়; যাহাতে এক ঘাঁটি হইতে অন্য ঘাঁটিতে বিদ্রোহের প্রসার হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে একজনের নিকট হইতে অন্য জনের হাতে লাল পদ্ম পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। নিজেদের মধ্যে গোপনে যেসব পত্র চালাচালি হইতে থাকে, তাহাতে

সিপাহীরা নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সচেতন ছিল; এক পত্রে লেখা হয়, "সিপাহীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইলে শ্বেতাঙ্গরা সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ হইয়া পড়িবে। বিদ্রোহ ঘটিলে আমাদের সাফল্য সু-নিশ্চিত। কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত সকল স্থান বিনাবাধায় দখল করা সম্ভব হইবে।" এই প্রাথমিক ব্যবস্থা নিষ্পন্ন হইবার পর নূতন শাসন মানিয়া নিবার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইবার বিষয় স্থির হয়। একটি ঘোষণাবাণীতে বলা হয়, "বিধর্মীদের নির্যাতন ও অত্যাচারে হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। ... হিন্দুমুসলমানের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, তাহাদের ভবিষ্যদ্বক্তা ও ভাগ্যগণকরা এবিষয়ে সকলেই একমত যে, আর বেশিদিন ইংরেজকে ভারতে টি কিয়া থাকিতে হইবে না। * * * এই সুযোগ চলিয়া গেলে সকলকে ভুলের জন্য অনুশোচনা করিতে হইবে। * * * ইংরেজরা ভারতীয়দের প্রতি আদৌ কোন সম্মান দেখায় না, তাহাদিগকে সামান্য বেতন দেওয়া হয় এবং সমুদয় বেশী বেতনের চাকুরী ও প্রভাবপ্রতিপত্তিমূলক পদ ইংরেজদের জন্য নির্দিষ্ট। * * * বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হইলে পাঁচহাজারী (কর্ণেল-জেনারেল) সিপাহশালারী (জেনারেল) জায়গীর সদরওয়ালা (ম্যাজিষ্ট্রেট) প্রভৃতি পদ ভারতীয়দের দেওয়া হইবে।" একমাত্র কৃষকদের ছাড়া অন্য সকল শ্রেণীর অভাবঅভিযোগের বিষয়ই ইস্তাহারে বর্ণিত হয়।

তৃতীয়ত, ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত সমস্ত নৃপতি বৃটিশ পক্ষে যোগ দেয়; অভ্যুত্থানকারীদের শত প্রচেষ্টা এবং ডালহৌসীর নীতি অনুযায়ী স্বত্বলোপের ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও তাহারা অনড় থাকে। অভ্যুত্থানের পূর্বমুহূর্তে লর্ড ক্যানিং গোপনে তাহাদের আশ্বাস দেন যে, সামন্তদের অধিকার স্বীকার করিয়া নেওয়া হইবে এবং উহা কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ করা হইবে না। একটি মাত্র কলমের খোঁচায় সামন্তরা ইংরেজবিরোধিতা পরিহার করিয়া বিপ্লবের

বিপক্ষে যায়। অধিকন্তু, দেশের কায়েমী স্বার্থের পোষকতা ও সহায়তা করায় ( যথা বাংলার চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থা ) তাহারাও বিপ্লববিরোধী বৃটিশ সমর্থক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। অরাজকতা ও উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় হিসাবে তাহারা শাসক শক্তিকে সাহায্য করাই শ্রেয়তর মনে করে। ইহাতে বিপ্লব বিরোধীদের শক্তিবৃদ্ধির দরুণ অভ্যুত্থানকারীদের যেটুকু ক্ষতি হয়, তাহা অনায়াসেই পূরণ করা যাইত, যদি বিদ্রোহী নায়কগণ দেশের আপামর জনসাধারণকে তাহাদের পশ্চাতে টানিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। স্থানবিশেষে অবস্থার চাপে পড়িয়া স্বেচ্ছায় কৃষক ও শ্রমিকগণ বিপ্লবে যোগ দিলেও সমগ্রভাবে তাহাদিগকে সংগঠিত করিবার কোন পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা ছিল না। বিপ্লবের সামন্ততান্ত্রিক রূপই এই জন্য দায়ী। বিদ্রোহীদের তরফ হইতে যে ইস্তাহার জারী করা হয়, তাহাতে একমাত্র কৃষক ছাড়া আর সকল শ্রেণীরই অবস্থার উন্নতির আশ্বাস দেওয়া হয়। বিপ্লবী নেতৃবর্গের এই অদূরদর্শী নীতিই সমগ্র অভ্যুত্থানের পতন ত্বরান্বিত করিয়া তোলে। প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁহারা প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সমাবেশ করিতে ব্যর্থ হন।

এদিকে সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহও সর্বব্যাপক আকার ধারণ করে নাই। বোম্বাই ও মাদ্রাজের সেনাদল বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই; শুধু অযোধ্যা, রোহিলখন্দ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিতস্তাখণ্ড ( Doab ), মধ্যভারত ও বিহারের কোন কোন অঞ্চলে অভ্যুত্থান ঘটে। অশ্বারোহীদলের অধিকাংশই রোহিলখন্দবাসী, পদাতিক দলের অধিকাংশই অযোধ্যা ও বিতস্তা খণ্ডের লোক; আবার ইহারাও প্রভাবশালী উচ্চবর্ণের বা 'কুলাক' শ্রেণীর; কাজেই ইহাদের অভ্যুত্থানে নবাবী আমলের পূর্বগৌরব কথা স্মরণ হওয়ায় এবং কৃষকদের চরম দুরবস্থা ঘটায় এই সব অঞ্চলে ব্যাপক বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর সিপাহীরা সকলেই নিম্নবর্ণের ছিল এবং

দেশের সহিত ইহাদের যোগাযোগও ছিল কম। কাজেই বিদ্রোহের প্রতি ইহাদের আকর্ষণও ছিল না। চূড়ান্ত মাত্রায় ইহার সুযোগ নেওয়া হয়।

## বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ

সিপাহী অভ্যুত্থানকে অনেকে শুধু মাত্র একটি সামরিক শ্রেণীর বিদ্রোহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইহাকে শুধু মাত্র 'সিপাহীদের বিদ্রোহ' বলিয়া বর্ণনা করা যায় কিনা সন্দেহ। কেননা স্থান ও কালবিশেষে বিপ্লবের ধারা ও বৈশিষ্ট্য রূপ পরিবর্তন করিয়া থাকে। সত্য বটে অভ্যুত্থানের সময় সিপাহীরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া উহার নায়কত্ব করিয়াছিল। কিন্তু ইহাও লক্ষ্যের বিষয়, বিস্তৃত ভূখণ্ডে জনসাধারণ ইহাকে নানাভাবে সমর্থন করিয়াছে। তাহারা সক্রিয়ভাবে উহাতে অংশ গ্রহণও করিয়াছে। এমনকি প্রয়োজনমত নিজেরাই অভ্যুত্থান করিয়াছে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাহাদেরও ঘোর বিক্ষোভ ছিল। চাকরির উন্নতি-অবনতি তাহাদের স্পর্শ না করিলেও ভূমিসংক্রান্ত অব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ ও দারিদ্র্য তাহাদের অভ্যুত্থানে প্ররোচিত করে। তাহারা বুঝিতে পারে, বৃটিশ শাসনের অবসান না ঘটিলে তাহাদের দুর্গতির শেষ হইবে না।

অবশ্য সর্বত্রই একটি মাত্র রাজশক্তির প্রতীক দিল্লী ও একটি মাত্র পতাকার নীচে সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। নানাসাহেব, অযোধ্যার বেগম, ঝাঁসীর রাণী, বেরিলীর খাঁ বাহাদুর খাঁ প্রমুখ প্রাক্তন শাসকবর্গ মোগল বাদশাহের প্রতিনিধি হিসাবে স্ব স্ব অঞ্চলে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। অধিকন্তু, প্রত্যেকটি অভ্যুত্থানকারী বাহিনীরই রণহুঙ্কার ছিল 'দিল্লী চলো'; দিল্লীর

বাদশাহকে সকলে কেন্দ্রীয় শক্তি বলিয়া মানিয়া নেয়। তারপর, আগ্রা-অযোধ্যায় ব্যাপকভাবে গণ-অভুত্থান ঘটে। মীরাট ও আলীগড়ে জনসাধারণই সিপাহীদের বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করে। পাটনায় বৃটিশ-পক্ষাবলম্বন-কারীদের সামাজিকভাবে বর্জন পর্যন্ত করা হয়। যেখানেই বৃটিশ ক্ষমতা লোপ পায় সেখানেই জনসাধারণ তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়া শাসন পরিচালনা করিতে থাকে। বৃটিশ সৈন্যকে সর্বত্র নদী পারাপার, মালপত্র স্থানান্তর ও অগ্রাভিযানকালে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়।

শুধু তাহাই নহে। অভ্যুত্থানকালে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ জ্ঞান একেবারে লোপ পায় এবং উহার স্থানে এক নূতন সামাজিক ও দায়িত্ব বোধের স্ফুরণ :হয়। সরকার পক্ষ হইতে আশা করা হয় যে, শ্রেণীসজ্ঘর্ষ, পারস্পরিক শত্রুতা ও সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের তাহারা সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু তাহাদের দূরাশা ব্যর্থ হয়। বেরিলীর নবাব এক ঘোষণাপত্রে বলেন, 'ভারত হইতে ইংরেজ বিতাড়নে হিন্দুরা সহায়তা করিলে মুসলমান সামন্তরা গোহত্যা বন্ধ করিতে রাজি আছেন।' দিল্লীর বাদশাহ দিল্লীতে গোহত্যা বন্ধের আদেশ দেন। তাহা ছাড়া দিল্লী-অধিপতি জয়পুব, যোধপুব, বিকানীর, আলোয়ার প্রভৃতি সামন্ত নৃপতির নিকট লিখিত পত্রে তাঁহাদিগকে সংগ্রামে যোগ দিতে অনুরোধ জানান এবং সাধারণ শত্রুকে বিতাড়নের পর সিংহাসন ত্যাগ করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। হিন্দুরাও অনুরূপ মনোভাব দেখান। কানপুরে নানাসাহেব তাঁহার প্রথম ঘোষণাতে সম্রাটের নিকট আনুগত্য জ্ঞাপন করেন। তাঁহার প্রধান অমাত্যও ছিল মুসলমান। নেপালের জঙ্গ বাহাদুরের নিকট সাহায্যের জন্য লিখিত পত্রে তিনি হিজরী সাল ব্যবহার করেন।

অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান কারণ জাতি ও ধর্মনাশের আশঙ্কা। এইদিক হইতে বলা যায় যে, 'স্বধর্মের' জন্য যুদ্ধ করার ধর্মোন্মাদনা সাধারণের মধ্যে

জাগ্রত হয়। কিন্তু ধর্মীয় কারণ উগ্র হইয়া উঠিলেও বিদ্রোহে ধর্মোন্মাদনাই মুখ্য হইয়া উঠে নাই। বরং রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা ও বৈষয়িক অভাব অভিযোগ ধর্মীয় অভিযোগ দৃঢ়তর করিয়া তোলে। বিদ্রোহে ধর্ম-সম্প্রদায় নেতৃত্ব করে নাই, বিষয়ী লোকরাই ইহা পরিচালনা করেন। শুধু প্রাচীন ও রাজ্যহারা সামন্তরাই ইহাতে যোগ দেন নাই, জমিদার শ্রেণীও উহাতে অংশ গ্রহণ করে। এই হেতু অযোধ্যায় বিপ্লব সর্বব্যাপক রূপ গ্রহণ করে। বৃটিশ অধিকারের সময় অযোধ্যায় ২৭২ জন তালুকদার ছিল, কিন্তু মাত্র ৭ জন বাদে সকলেই অভ্যুত্থানে যোগ দেয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও একই ঘটনা ঘটে। এখানে যেসব জমিদার স্বত্বভ্রষ্ট হন, রাষ্ট্র-বিপ্লবে জনসাধারণ তাহাদেরই খাজনা দেয়। কাজেই ভারতের তৎকালীন অবস্থায় জনসাধারণের বংশপরম্পরাগত নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহ চালনা করেন।

বিদ্রোহকালে প্রজারা নূতন মনিবদের পরিবর্তে বৃটিশশক্তি কর্তৃক বিতাড়িত প্রাক্তন মনিবদের খাজনা দেয়। এই দিক হইতে বিচার করিয়া বলা চলে, সিপাহী অভ্যুত্থান সামন্ত অভ্যুত্থানও বটে। কিন্তু সর্বোপরি ইহাকে কোন এক বিশেষ শ্রেণীর বিদ্রোহ বলা চলে না। সিপাহীদের অভাব অভিযোগ, ধর্ম ও জাতিনাশের আশঙ্কা, আর্থিক দুর্গতি, ও জনসাধরেণের দারিদ্র্য, মর্যাদা ও পদভ্রষ্ট সামন্ত ও বিত্তশালী শ্রেণীর অসন্তোষ—সমস্ত মিলিয়া এক সাধারণ পটভূমিকা রচনা করে। সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়; তাহাই চর্বিমিশ্রিত টোটা উপলক্ষ করিয়া বহ্নিমান হয়—বিদেশী শাসকের ঔদ্ধত্যে এবং পরবশ্যতার হীনতাবোধ হইতে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিচার্য। তাহা হইল এই যে অভ্যুত্থান উত্তর ভারতের প্রদেশবিশেষে প্রচণ্ড ও ব্যাপক হইয়া উঠিলেও ইহাকে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম বলা চলে কিনা। দেখা গিয়াছে যে, উত্তর ভারতে

জনসাধারণ মোটামুটি ইহাকে হয় নৈতিক দিক হইতে, নয় অন্যভাবে সমর্থন ও সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইহা সমগ্রভাবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই; কেননা তৎকালে ভারতবর্ষে বা উত্তর ভারতে জাতীয়তাবোধের বিকাশ হয় নাই এবং জাতিগঠনের উপযোগী মালমসলারও তখন অভাব ছিল। অখণ্ড রাষ্ট্রীয় চেতনা, সামাজিক উত্থান পতন বোধ, আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি গড়িয়া উঠিবার মত অবস্থা তখনও ছিল না। তাহা ছাড়া বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দও প্রাচীন সামন্ত বা মধ্যযুগীয় মনোভাবাপন্ন ছিল বলিয়া নিগৃহীত জনসমাজ বা তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতি উদাসীন ছিল। অবশ্য প্রথম দিকে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে নিঃসন্দেহ, কিন্তু পরবর্তীকালে বিদ্রোহ পরিচালনার ভার তাহাদের হাত হইতে রাজ্যভ্রষ্ট সামন্তদের হাতে চলিয়া যায়। এই হেতু বিদ্রোহ নিছক সামরিক অভ্যুত্থানেও পর্যবসিত হইতে পারে নাই; এই সংগ্রামে যাঁহারা নেতৃত্ব করেন, তাঁহারা সর্বপ্রকার গুণান্বিত হইলেও বৈজ্ঞানিক যুগধারাকে রোধ করিবার মত শক্তি বা কৌশল তাঁহাদের আয়ত্তে ছিল না। কিন্তু ইহাও সত্য, এই অভ্যুত্থানে বিদেশী শক্তিকে বিতাড়িত করিয়া শাসনক্ষমতা হস্তগত করার এক ব্যাপক ও বিপুল উদ্যম হয়।

ফলত, সিপাহী অভ্যুত্থান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও সমাজবিন্যাসের বিরুদ্ধে সামন্ততান্ত্রিক আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের রূপ নেয়। কাজেই ইহার সাফল্যও সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে।

সিপাহী অভ্যুত্থানের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি এইভাবে স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। রাজশক্তি দখলের যে সংঘর্ষ প্রাচীন ও নবীন এবং পুরাতন ভাবধারা ও নূতন বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের মধ্যে রূপান্তর লাভ করে, নব্যসমাজ ও বৈষয়িক ব্যবস্থা এবং শিল্পায়নের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হইলেই তত্ত্ব ও তথ্যের দিক দিয়া সমগ্র বিপ্লবের সুষ্ঠু পরিণতি ঘটিত। কিন্তু বিজেতা ইংরেজ রাজশক্তি নূতনের সন্ধান

লইয়া আসিলেও অভ্যুত্থানের পর সামাজিক সংস্থা এবং শিল্পোন্নয়নে অচলায়তন প্রতিষ্ঠায় তাহারা সহায়তা করে ও উহাতে উৎসাহ যোগায়। কেননা বিজিত দেশে দুর্বল সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পক্ষে সবিশেষ সহায়ক। ইহার ফল দাঁড়ায় এই যে, সামন্ততন্ত্রকে এক নূতন ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া উহাকে প্রতিক্রিয়াশীল ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করা হয়। ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠা না করিয়া উহাকে কাঁচা মাল সংগ্রহের আড়ত করা হয়; পক্ষান্তরে বিলাতী উৎপন্ন পণ্য ভারতের বাজার জাঁকিয়া বসে; নব্য জ্ঞানবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকই এখানে নামমাত্র প্রবর্তিত হয় এবং সামাজিক ব্যবস্থায় রক্ষণশীলতা ও নিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হয়। সর্বোপরি, দেশের সমগ্র জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া ভারতকে ইংল্যাণ্ডের উপর নির্ভরশীল করিয়া ফেলা হয়। ভারতের রাষ্ট্রীয়, বৈষয়িক ও সামাজিক জীবন ধ্বসিয়া পড়িতে থাকে। ইহার রিক্ততা ও অন্তঃসারশূন্যতার উপর বিলাতী সমৃদ্ধির বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। সিপাহী অভ্যুত্থানের ফলে ভারতীয় জীবনে যে গভীর ক্ষত হয়, তাহার উপর প্রলেপ দিবার চেষ্টা হইলেও ক্ষতমুখ হইতে চারিধারে রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস এই, সাম্রাজ্য-স্বার্থের অনুকূলে একদা যাহাদের ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা দিয়া গড়িয়া তোলা হয় সেই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালীই পরবর্তীকালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে ফাঁটল ধরাইয়া দেয়; তাহারাই হইয়া উঠে মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত।

---

# বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলন

১৮৫৮ সালের শেষভাগে সিপাহী অভ্যুত্থানের শেষ স্ফুলিঙ্গও নিভিয়া যায়। কিন্তু এই রক্ত-স্নানের মধ্য দিয়া শাসক ও শাসিতের মধ্যে নূতন সম্পর্কের উদ্ভব ও রূপান্তর ঘটিতে থাকে। স্পষ্টতঃই দেখা যায়, সার্বভৌম প্রভুশক্তি হিসাবে ইংরেজের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে এবং ভারতবাসী পুরাপুরি দাস জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এমনিভাবে শাসনব্যবস্থা, বৈষয়িক সমস্যা ও সামাজিক উন্নয়ন,—সমুদয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় অগ্রগতি বৃটিশ সাম্রাজ্য-স্বার্থের অনুগামী হইয়া পড়ে।

শাসনব্যবস্থার দিক হইতে ভারতে কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটে এবং উহার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় খাস বৃটিশ-প্রভুত্ব। ভারত ইংল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হয়; দেশীয় রাজ্য সমূহের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য গবর্ণর জেনারেলকে 'ভাইসরয়' বা রাজপ্রতিনিধির পদাধিকার দেওয়া হয় এবং ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রীদের মধ্য হইতে ভারত শাসন-সংক্রান্ত ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতসচিব নিয়োগেরও ব্যবস্থা হয়।

১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর বড়লাট লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদে এক বিরাট দরবার অনুষ্ঠান করেন। উহাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণের কথা ঘোষিত হয়; এই উপলক্ষে যুগপৎ ভারতীয় জনসাধারণ ও সামন্ত নৃপতিদের আশ্বস্ত করিয়া জানান হয় যে, শাসন ব্যাপারে সমদর্শিতা এবং জনকল্যাণ, ধর্ম ও সামাজিকক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও উদার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। রাজন্যদের বলা হয়, কোম্পানীর সহিত ইতিপূর্বে সম্পাদিত সন্ধি অনুযায়ী তাহাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করা হইবে এবং সামান্তরাজ্যগ্রাস নীতি ত্যক্ত হইবে। ভারতবাসীদের আরও জানাইয়া

দেওয়া হয়, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে তাহাদের রাজকার্যে নিযুক্ত করা হইবে; আর বৃটিশ প্রজার হত্যায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের ছাড়া কাহাকেও রাজদ্রোহের দায়ে দণ্ডিত করা হইবে না।

মহারাণীর এই ঘোষণাপত্রকে মহাসনদ আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু তৎকালে ইহাকে যাহাই বলা হউক না কেন, ইহা ভারতীয়দের স্বাধীনতার মহাসনদ নহে; তাহাদের পরাধীনতার পরোয়ানা মাত্র। পরবর্তী ঘটনাবলীই ইহার প্রমাণ।

সিপাহী অভ্যুত্থানের পরে ২২ বৎসর ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব দৃঢ়তর করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয়। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ গোড়াতেই বুঝিতে পারেন যে, শাসিতদের মৌন সম্মতি ও সহযোগিতা না থাকিলে শাসন ও শোষণ চালান দুঃসাধ্য। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা শাসন ব্যাপারে ভারতীয়দের সহযোগিতা কামনা করেন এবং বেশী সংখ্যক ভারতীয়কে দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্যে নিয়োগের জন্য বিবিধ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করা হয়। পক্ষান্তরে ভারতীয়দের শোষণের জন্য নব নব উপায়ও উদ্ভাবিত হইতে থাকে। বস্তুত এই সময়কে শাসন ও শোষণের এক নূতন অধ্যায় বলা যাইতে পারে।

এমনি করিয়া ইংরেজদের একচ্ছত্র রাজ্যপ্রতিষ্ঠা হয় বটে, কিন্তু ভারতে তাঁহাদের প্রজাকল্যাণ কামনা শুধু পুথিবদ্ধই রহিয়া যায়। এদিকে সৈন্য-বিভাগ হইতে চিরতরে যাহাতে বিদ্রোহ ঘটিবার সম্ভাবনা লোপ পায়, এমনি করিয়া ভারতীয় সৈন্যবিভাগ পুনর্গঠিত হয়। সমর বিভাগে উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়; তাহাদের পরিবর্তে গুর্খা, উপজাতীয় অঞ্চলের অধিবাসী নিরক্ষর দুর্ধর্ষ পাহাড়িয়া সম্প্রদায়, শিখ ও অনুগত দেশীয় নৃপতিবৃন্দের সৈন্যরা শুধু সেনাবিভাগে স্থান পায়। কৃত্রিম উপায় ভারতীয়দের মধ্যে তথাকথিত সামরিক ও অসামরিক শ্রেণী গড়িয়া তোলার

ইহাই ইতিহাস। তাহা ছাড়া সমর বিভাগে বৃটিশ সৈন্য ও সেনানীর হারও বৃদ্ধি করা হয় এবং ভারতীয় গোলন্দাজবাহিনী সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ সৈন্যদ্বারা পূর্ণ করা হয়। ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায় ও নৌবাহিনী বলিয়া যে সামান্য অংশও এতদিন উপকূল বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল, তাহাও বৃটিশ প্রতিযোগিতায় এই সময় লোপ পায়। যুগপৎ ভারত শাসন ও শোষণ করিয়াই ইংরেজ শাসক তুষ্ট থাকে না। ভারতবাসীদের চিরকাল নির্বীর্য ও শৌর্যহীন করিয়া রাখিবার অভিনব উপায়ও তাহারা উদ্ভাবন করে। অবশ্য জমিদারদের উৎপীড়ন হইতে প্রজাদের রক্ষার জন্য ১৮৫৯ সালে খাজনা আইন সংস্কার এবং নীলকরদের অমানুষিক নির্যাতন রোধের জন্য যে ছোটখাট প্রজাহিতকর সংস্কার প্রবর্তিত না হয় এমন নহে। কিন্তু তাহাও প্রসিদ্ধ নাট্যকার ৺দীনবন্ধু মিত্র-লিখিত 'নীলদর্পণের' জন্য সরকারী দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। উক্ত নাটকে বাঙালী কৃষকের উপর নীলকর সাহেবদের অকথ্য নির্যাতনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এদিকে সিপাহী অভ্যুত্থান দমনে গবর্ণমেণ্টের যে বিপুল ঋণ হয়, তাহা পরিশোধের জন্য ভারতে আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। যুদ্ধবিগ্রহের অবশ্যম্ভাবী আনুষঙ্গিক দুর্ভিক্ষ দেশের নানাস্থানে দেখা দেয়। ১৮৬১ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে ১৩ লক্ষ লোক প্রাণ হারায় এবং ১৮৬৬ সালে বুন্দেলখন্দ ও রাজপুতানায় মন্বন্তর দেখা দেয়; তাহাতেও বিপুল লোকক্ষয় হয়। এমন কি ১৮৭৭—৭৮ সালে যখন মহা সমারোহে লর্ড লিটন দরবার অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন দক্ষিণ ভারতে ভয়াবহ মন্বন্তরে ৫০ লক্ষাধিক লোক প্রাণ হারায়। এই সময় দেশীয় রাজ্যসমূহ বৃটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ অধীন বলিয়া ঘোষিত হয়। ভারতে ইংরেজরাজ রাজচক্রবর্তীর আসনে পুরাপুরি অধিষ্ঠিত হয়।

এতদিন প্রয়োজন বুঝিয়া সিপাহী অভ্যুত্থান দমনের পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজ শক্তি সামন্ত রাজাদের নিজেদের সমকক্ষ বলিয়া মানিয়া নিতেছিল;

কিন্তু অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে বৃটিশ ভারতের প্রজাদের মত দেশীয় নৃপতি বৃন্দকেও সর্বাঙ্গে পরাধীনতার বেড়ি পড়াইয়া দেওয়া হয়; ভারতবাসীর পরাধীনতা কায়েমে তাহারা বৃটিশের সহায়ক হইয়াছিল, পরিবর্তে বৃটিশরাজ তাহাদের উপর প্রভুত্বের বজ্রমুষ্টি দৃঢ়তর করে।

এহেন পরিস্থিতিতেও দেশের অবস্থা বাহ্যত শান্ত বলিয়া মনে হইত। কিন্তু আসলে আগ্নেয়গিরির মতই ছিল উহা বিস্ফোরণশীল। বাহিরের আবরণ দেখিয়া দেশবাসীর ফল্গু মনোধারার গতি বুঝিবার উপায় ছিল না। তবে শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি যে চোরাবালির উপর গড়া, সেবিষয়ে শাসকরাও সচেতন ছিল। এই হেতু দেশবাসীর উত্তরোত্তর বর্ধিত আশা-আকাঙ্খার পূরণে তাহাদের আগ্রহের প্রমাণ দিতে তাহারা ব্যস্ত হয়; পক্ষান্তরে নানারূপ নৈসর্গিক দুর্দৈব ও শাসকসম্প্রদায়ের শ্বেতাঙ্গ পক্ষপাতিত্ব, আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও অযোগ্যতার দরুণ ভারতবাসীর মধ্যে শাসকশক্তির বিরুদ্ধে একটা প্রতিকূল মনোভাব গড়িয়া উঠিতে থাকে; এই মনোভাব তাহাদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়।

ভারতবাসী বিদেশী শাসনকে প্রথমাবধিই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে নাই; ১৮৫৭ সালের সিপাহী অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইবার পরও সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী বিশেষের মধ্যে প্রভুত্ব পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্প প্রকাশ পাইতে থাকে। মুখ্যত যে-মারাঠা ও মুসলমানশক্তি বিপ্লবে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাহারা নিজেদের পূর্বমহিমা ও প্রতিপত্তির কথা ভুলিতে পারে নাই, আর তাহা ভুলিয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। এইজন্য তাহাদের মধ্যে অব-দমিত আকাঙ্খার স্ফুরণ দেখা যায় এবং স্ব স্ব পরিবেশ অনুযায়ী ক্ষেত্রান্তরে উহার ফলাফলও বিভিন্ন ধরণের হইতে থাকে।

বৃটিশ জঙ্গীশক্তির কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা এবং উহার তুলনায় ভারতবাসীর মধ্যে সঙ্ঘশক্তির অভাবহেতু দেশে এক নিষ্ক্রিয় ও অসহায় মনোভাবের সৃষ্টি

হইতে থাকে। বিপ্লবের ব্যর্থতায় তখন সংগঠন শক্তিও আর দেশবাসীর মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না; বরং বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বরাবর শাসনকার্য চালান হইতে থাকে। অবশ্য দেশে তৎকালে যে ধরণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার লেশমাত্র থাকাও সম্ভবপর ছিল না। এই হেতু দেশবাসীর বিহ্বল ঔদাসীন্য ও নিরানন্দ পরিবেশ চারিদিক ছাইয়া ফেলে।

সিপাহী বিদ্রোহের ইহাই নঙর্থক পরিণাম—প্রবল উত্তেজনার পর নিদারুণ অবসাদ।

অবশ্য বিপ্লবের সদর্থক দিকও কম উল্লেখযোগ্য নয়। পরাজয়ের গ্লানিতে দেশবাসী ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে রত হয়। নৈরাশ্যবাদীরা ইংরেজ-শাসনকে বিধিনির্দিষ্ট বিধান বলিয়া মানিয়া নেয়, কিন্তু আশাবাদীরা সুদিনের প্রতীক্ষায় পরিবর্তিত পরিবেশের সহিত নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করিতে থাকে। আবার এমনও একদল লোকের আবির্ভাব হয়, যাহারা নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠে। তাহারা প্রতি-পক্ষের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার প্রতি তেমন লক্ষ্য না রাখিয়া বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ করিবার চেষ্টায় থাকে। ইহাদের মধ্যে মারাঠা বীরপুঙ্গব ফাড়কের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মারাঠীই ভিন্নপথে আত্মবিশ্লেষণ করিতে থাকে; তাহাদের মধ্যে অধিকতর দূরদর্শী ও চিন্তাশীল সম্প্রদায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্তের সাধনায় রত হন। পক্ষান্তরে নিরক্ষর ও দরিদ্র সাধারণ প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রামের মধ্যে তলাইয়া যায়। কিন্তু পরবশ্যতাপ্রসূত ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও গ্লানিতে তাহাদের মধ্যেও চাপা অসন্তোষ প্রকাশ পাইতে থাকে।

এদিকে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয় বিপরীত ও মর্মান্তিক। ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কম বা বেশী পরিমাণে দেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করায় তাহারা নিজেদের ভারতের প্রভুশক্তি

বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; সুতরাং ভারতে পুনরায় মুসলমান প্রভুশক্তির প্রতিষ্ঠা তাহাদের কাম্য হইয়া উঠে। এইজন্য স্বভাবতই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান জন্মে এবং তাহারা অতিমাত্রায় আত্মসচেতন ও স্পর্শকাতর হইয়া উঠে। আর আভ্যন্তরীণ দলাদলি এবং মারাঠা, রাজপুত ও শিখদের সঙ্ঘর্ষে মুসলমান রাজশক্তির ক্রমিক বিলোপ ঘটিলেও সাধারণ মুসলমান নিজেদের মন হইতে পূর্বগৌরবের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই ; সিপাহী অভ্যুত্থানে উত্তর ভারতে বিশেষত আগ্রা ও অযোধ্যায় মুসলমানদের মুখ্য অংশ গ্রহণের উহাই অন্যতম কারণ।

এইরূপ অবস্থায় মুসলমান সাধারণ ইংরেজের নিকট মানসিক বশ্যতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করে। তাহারা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিও বর্জন করে। ইহার ফল দাঁড়ায় এই যে, ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায় বিশেষত বাঙালী, মারাঠী ও মাদ্রাজীরা যখন আধুনিক কর্ম ও ভাবধারায় অগ্রগামী হইয়া পড়ে,তখনও তাহারা অভিমানবশে সম্প্রদায়গতভাবে কল্পনাশ্রয়ী হইয়া উঠে। বস্তুত পারিপার্শ্বিকতা হইতে সর্বোপায়ে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া তাহারা আপনা হইতেই কোনঠাসা হইয়া পড়ে।

ইহার মধ্যেও ব্যতিক্রম যে না ছিল এমন নহে। সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের এই আত্মঘাতী নীতি আলীগড়ের স্যর সৈয়দ আহম্মদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। তাঁহার পূর্ববর্তী বাঙালী-প্রধান নবাব আব্দুল লতিফও ইংরেজী শিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে স্বীয় সম্প্রদায়কে সজাগ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ; কিন্তু উহার পিছনে কোনরূপ সৃজনী প্রচেষ্টা ছিল না বলিয়া তাহাতে সুফল হয় না। পক্ষান্তরে স্যর সৈয়দ নিজে ইংরেজী শিক্ষিত না হইয়াও স্বসম্প্রদায়কে জ্ঞানবিজ্ঞানে কৃতবিদ্য করিয়া তুলিতে যত্নপর হন এবং তাঁহারই চেষ্টায় আলিগড় কলেজ গড়িয়া উঠে। অল্পদিনের মধ্যেই ঐ কলেজ মুসলমানদের মধ্যে নব্য ভাবধারার প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্রভূমিতে

পরিণত হয়। শিক্ষিত মুসলমান নিজেদের গলদ ও অধঃপতনের হেতু বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু প্রথম দিকে পশ্চাদগামী হওয়ায় তাহারা হিন্দু ও অন্য সম্পদায়ের তুলনায় বহু পিছনে পড়িয়া যায়। ইহার জের এখনও তাহাদিগকে টানিতে হইতেছে। সম্প্রদায় হিসাবে তাহাদের অগ্রগতি শুধু মন্থরই হয় নাই, দেশের বৃহত্তর সাধনা ও সিদ্ধিতেও তাহারা বিশেষ সহায়ক হইতে পারে নাই,—যাহারা অগ্রগামী হইবার দুঃসাহস করে তাহাদিগকেও তাহারা পিছনে টানিয়া ধরে। ইহার ফলে ভারতের মুক্তি সংগ্রামও বিঘ্ন-সংকুল হইয়া পড়ে।

সিপাহী অভ্যুত্থানকালে আর একটি সম্প্রদায় উহার নীরব সাক্ষী ছিল। তাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোক শ্রেণী। তাহারা রামমোহন ও ডিরোজিওর ভাব ও শিক্ষায় পুষ্ট, হিন্দু কলেজের অত্যাধুনিক ছাত্রদল; নব্য জ্ঞানবিজ্ঞানের উগ্র সুরায় তাহারা উন্মাদ, ইংরেজী নকলনবীশীতে ওস্তাদ। ইহাদের অনেকে কোম্পানীর চাকরিতে দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল হয়। কোম্পানীর রাজ্যপ্রসারের সঙ্গে তাহারাও ভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং ইংরেজ-বণিকের অনুচর হিসাবে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে রত হয়; অভ্যুত্থানকালে প্রভুশক্তিকে বহু ভাবে সহায়তা করিয়া অনেকে আবার বিস্তর সরকারী অনুগ্রহও পায়। এই হেতু ভিন্ন প্রদেশ-বাসীরা তাহাদের প্রতি কিছুটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করে এবং কিছুটা ঈর্ষাপর হইয়া উঠে। কোম্পানীর অনুচর রূপে অবাঙালীর নিকট একশ্রেণীর বাঙালীর একমাত্র পরিচয় হইয়া পড়ে। ইহা দুঃখের হইলেও সত্য। পক্ষান্তরে আর একদল দুঃসাহসী বাঙালী তৎকালে সরকারী চাকরির মোহ ও জীবন-ধারণের নিরাপদ পথ ত্যাগ করিয়া স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করেন ও বঙ্গেতর প্রদেশসমূহে ছড়াইয়া পড়েন। তাঁহারা ঐসব অঞ্চলের সমুদয় প্রগতিমূলক আন্দোলনে অগ্রণী হইয়া তথাকার বাসিন্দাদের সুখদুঃখে সম-

অংশভাগী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের মারফত বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক জ্যোতির্ময় রূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; এই ভাবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালী অবজ্ঞা ও শ্রদ্ধা দুই-ই লাভ করে।

দুই স্ববিরোধী ভাবধারার সমাবেশে বাঙালী জাতীয় চরিত্র গঠিত। তাহাদের চারিত্রিক দৈন্যও আছে, আবার সম্পদও আছে। ইংরেজের নিকট নিজে আত্মবিক্রয়ই সে করে নাই, অন্ধ অনুকরণে নিজের সমগ্র সত্ত্বাও বিসর্জন দেয় নাই; জাতীয় স্বরূপ উপলব্ধির সাধনায়ও সে আত্মনিয়োগ করে। তাহার সংবেদনশীল মনোজগতে জাতীয় দৈন্যের ছায়া স্পষ্ট ও দীর্ঘতর হইতে থাকে; সর্বপ্রথম ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার ফলে তাহাদের নগ্নরূপও তাহার নিকট প্রকট হয়। আর এই সঙ্গে পাশ্চাত্য মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস ও উহার প্রভাব তাহার মনে গভীর ছাপ রাখিয়া যায়। ক্রমশ আইরিশ ও ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা, স্পেন্সার-শিলারহেগেলের তত্ত্ব ও ম্যাৎসিনীগ্যারিবল্‌দীর বীরত্বকাহিনী, এবং টড-লিখিত স্বদেশী রাজস্থান গাথা ও অল্পকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত সিপাহী-অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া বাঙালী-মানসে চিন্তার বিপ্লব আনে। কিন্তু ধর্মান্দোলনের মধ্য দিয়াই প্রথমদিকে বাঙালী তথা ভারতবাসী আত্মস্থ হইবার উদ্যম করে। একদিকে রামমোহন, দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন প্রভৃতির ব্রাহ্ম-ধর্মান্দোলন এবং কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি ও বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম বিশ্লেষণ, পরমহংসদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা, বিবেকানন্দের হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, উত্তর ভারতে দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যধর্ম প্রচার ও দক্ষিণ ভারতে কর্ণেল অলকট-মাদাম ব্লাভাটস্কীর ব্রহ্মবিদ্যা আন্দোলন, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীর ভাষা ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন ভারতের ধর্ম ও সমাজ জীবনে বৈপ্লবিক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বস্তুত ধর্মান্দোলনের সহিত সমাজ সংস্কার আন্দোলনও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইয়া পড়ে।

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের সহিত রাজনীতিতে শাসনসংস্কারের প্রতিও চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। কিন্তু মজা এই, তৎকালের চাকুরিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহাদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। উহার কারণও ছিল যথেষ্ট; চাকুরিয়া শ্রেণীর লোকই শাসকদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া পরবশ্যতার গ্লানি মর্মে মর্মে অনুভব করিতে থাকে; কিন্তু নিজের গূঢ় অন্তর্বেদনা ও সঞ্জাত প্রকাশের ক্ষেত্র বাহিরে না থাকায় একমাত্র সাহিত্যই হইয়া উঠে আত্মপ্রকাশের মুখ্য অবলম্বন। এই হেতু প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও গল্পে সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতে থাকে, দেশে নবজাগরণের সূচনা দেখা দেয়। সরকারী চাকরিয়া দীনবন্ধু মিত্র, নবীন সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ মনীষী ও কবির লেখনীমুখে দেশের মূক দৈন্যদুঃখ মুখর হইয়া উঠে। সিপাহী বিপ্লবের প্রবল বিস্ফোরণের মুখেও যে-বাঙালীর কালঘুম ভাঙ্গে নাই, তাহাদেরই কণ্ঠে নব্য জাতীয়তার ঋক্‌মন্ত্র ধ্বনিত হয়, তাহাদের মানসনেত্রেই 'বন্দে মাতরম্'-এ বর্ণিত দেশমাতার মূর্তি ফুটিয়া উঠে; পাশ্চাত্য জাতীয়তার সহিত হিন্দু জাতীয় সংস্কারের মিলনে যে নব্য জাতীয় বোধের উন্মেষ হয়, তাহার প্রচার ও প্রসারে তাঁহারাই হন পুরোধা।

ইতিমধ্যে শিক্ষিত বাঙালীপ্রধানগণ সঙ্ঘবদ্ধ রাজনীতিক আন্দোলন চালনার জন্য প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হন। অবশ্য এদেশে অবস্থিত বেসরকারী ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের আন্দোলনসাফল্যে তাঁহারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও নিঃসন্দেহ। ইউরোপীয়দের নিরঙ্কুশ অনাচার হ্রাসকল্পে তাহাদিগকে আইনের আওতায় আনিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এক আইনের খসড়া রচনা করে; কিন্তু তাহাদের আন্দোলনে সরকার নিরস্ত হইতে বাধ্য হয়। কাজেই উহাদের দেখাদেখি পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে ১৮৫১ সালে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের' প্রতিষ্ঠা হয়; এই এসোসিয়েশনের মারফত সমষ্টিগতভাবে ভারতবাসীর অস্ফুট

আকাঙ্ক্ষার কথা আধ আধ প্রকাশ পাইতে থাকে। কিন্তু যাহা সকল শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত. হয়, তাহাই ক্রমশ হইয়া উঠে জমিদার ও সম্পদশালী সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তিদের মুখপাত্রস্বরূপ। ইহা সিপাহী অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী ঘটনা। এই সময় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা। তবে বলাই বাহুল্য, ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গভাষা প্রবেশিকা সভা, ভূম্যধিকারী সভা ও বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রত্যেকটির চেয়ে ইহা অধিকতর প্রতিনিধিমূলক ছিল।

অভ্যুত্থানের পরবর্তী কয়েক বৎসর নানা অশান্তির মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইতে থাকে। জমিদার ও নীলকর সাহেবদের উৎপীড়ন ও অনাচার ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে; বাঙলার নানাস্থানে কৃষকরা প্রকাশ্য বিদ্রোহ পর্যন্ত ঘোষণা করে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' বাংলার তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার নিখুঁত আলেখ্য; কৃষিকুলের দুঃসহ অবস্থার জন্য নানাদিকে আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়া উঠায় সরকার কৃষিব্যবস্থার সংস্কার সামান্য করেন বটে, কিন্তু তাহাও নামমাত্র। সে অবস্থায়ও জমিদার শ্রেণী নিজেদের অধিকার হারাইবার আশঙ্কায় 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মারফত সরকারের নিকট নিজেদের বক্তব্য পেশ করিতে থাকে। আন্দোলনের ইহাই আদিপর্ব, অবশ্য তাহাও কায়েমী স্বার্থ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের।

ইতিমধ্যে বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায় সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করিয়া উহার রস বুঝিতে আরম্ভ করে; তাহারা হইয়া উঠে ইংরেজ-সৃষ্ট এক অভিজাত মধ্যপন্থী শ্রেণী; সরকারী চাকরিতে তখন পয়সা ও প্রতিপত্তি অর্জনের উপায় নিহিত; কাজেই দেশের দৃষ্টিও উহাতে নিবদ্ধ। 'সিবিল সার্বিসের' দ্বার ভারতবাসীর নিকট উন্মুক্ত হওয়ায় তাহাই তখন সকলের কাম্য হইয়া উঠে। অথচ সেই বহু-বাঞ্ছিত 'দেবলোক' হইতে যখন সিবিলিয়ান সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুচ্ছ কারণে পদচ্যুত

করা হয়, তখন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে একটা হতাশার ভাব লক্ষিত হয়। ভারতে ও বিলাতে বহু চেষ্টাচরিত্র করিয়াও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পুনরায় চাকরিতে বহাল করা গেল না। শ্বেতাঙ্গ শাসক সম্প্রদায়ের বর্ণাভিমান ও শ্রেষ্ঠত্ব বোধের নিকট ভারতীয় সিবিলিয়ানের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হইল। এই একটিমাত্র ঘটনায় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে আত্মানুসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতে বাধ্য হয়। পরদেশী শাসক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের স্বার্থ এক নয় বলিয়া তাহাদের ধারণা জন্মিতে থাকে। কিন্তু তেমন অবস্থায়ও দেশের সর্ববাদীসম্মত মুখপাত্রগণ পর্যন্ত প্রতীকারের কোন উপায় স্থির করিতে পারেন নাই; এমন কি সুরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন তমসাচ্ছন্ন বলিয়াও অনেকে অভিমত দেন; কেহবা তাঁহাকে নাম পাল্টাইয়া অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া নূতনভাবে জীবনারম্ভের পরামর্শ দেন। কিন্তু অদৃষ্টবাদী সাধারণ ভারতীয়ের মত এই পুরুষসিংহ ভাগ্যের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া পুরুষকারকেই আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় বলিয়া গ্রহণ করেন। চাকরিজীবী শিক্ষিত বাঙালী ও শাসক গোষ্ঠির মধ্যে ইহাই প্রথম প্রত্যক্ষ স্বার্থের দ্বন্দ্ব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সময় স্বাধিকার অর্জন বা স্বাবলম্বী হওয়ার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যাইতে থাকে। তাঁহাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় গৌরব সভার' পর হিন্দুমেলা বা চৈত্র মেলার প্রতিষ্ঠা হয়। নবগোপাল মিত্র ছিলেন ইহার প্রাণ। ১৮৬৭ সালে উহার প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রতিবছর চৈত্র-সংক্রান্তিতে ইহার অনুষ্ঠান হইতে থাকে। 'এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্র করা। এই মিলন কোন বিষয়সুখ বা আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে—স্বদেশের জন্য, ভারতভূমির জন্য। * * আত্মনির্ভরতা যাহাতে ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, —এখানে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।'

লক্ষ্য করিবার বিষয়, তৎকালে হিন্দু জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনই ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ; ভারতের স্বাধীনতা অর্থে হিন্দুসমাজের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বাধীনতাই বুঝাইত। অবশ্য ইহার কারণও ছিল। হিন্দুসমাজই ছিল তৎকালে শিক্ষাদীক্ষা ও কর্মে অগ্রণী। এইহেতু শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রধানত তাহাদের নালিশই পুঞ্জীভূত হইতে থাকে।

চৈত্র মেলার উদ্যোক্তৃগণ ঐক্যবোধবৃদ্ধি, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় জীবনকে বিভিন্ন দিক হইতে সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টিত হন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর সিভিলিয়ান ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'জয় ভারতের জয়' সঙ্গীতটি প্রতিবার অধিবেশনে গীত হইত। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ইহার নিয়মিত অনুষ্ঠান হইতে থাকে।

১৮৭০ হইতে ১৮৮০ সালের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটে, তাহা নানাভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিকে হিন্দুমেলার আহ্বান, অন্যদিকে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির একরাষ্ট্রভুক্তি, আমেরিকায় নিগ্রোদের স্বাধীনতা লাভ এবং ইউরোপের নবীন ভাবধারার সহিত সদ্য-পরিচিত প্রাচ্য দেশসমূহে সাড়া জাগে। শিক্ষিত বাঙালী অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন অনুধ্যান করিতে থাকেন। তাঁহার সাহিত্যও উহারই অভিব্যক্তি। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজরে শিঙ্গা, বাজ এই রবে,—শুনিয়া ভারত জাগুক সবে' ইত্যাদি, মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন হয়ে পরাধীন', গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কত কাল পরে বল ভারত রে' প্রভৃতি সঙ্গীত শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে নবোদ্যমের সঞ্চার করিতে থাকে। দেশ শনৈ শনৈ একজাতীয়তা ও ভারতীয়তার দিকে আগাইয়া চলে।

কর্মরাজ্যও এই সময় নানা সংঘাতে চঞ্চল হইয়া উঠে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সিপাহী বিপ্লবের পর শাসক ইংরেজ সম্প্রদায় ভারতীয়দের হইতে নিজেদের স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবিতে ও তদনুযায়ী আচরণ করিতে

থাকে। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে জাতিগত স্পর্দ্ধা আকাশস্পর্শী হইয়া উঠে এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল সার্বিস হইতে পদচ্যুত হন। মহারাণীর ঘোষণা অনুযায়ী ভারতীয়দের শাসন ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য আহ্বান করা হইলেও তাহারা শিক্ষিত ভারতবাসী তথা বাঙালীকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, বরং তাহাদের যোগ্যতা ও শাসনকার্যে পটুতাকে তাহারা ভীতির চক্ষে দেখিতে থাকে। চাকরির ক্ষেত্রে তাহারা শিক্ষিত বাঙালীকে প্রতিযোগী বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে হটাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা করে। ১৮৬৯ সালে বহির্বাংলায় কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে এই মর্মে আদেশ জারি হয় যে, উচ্চশিক্ষিত বাঙালীকে পারতপক্ষে সরকারী কাযে যেন নিয়োগ করা না হয়। এদিকে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারেও কর্তৃপক্ষ আর তেমন আগ্রহ দেখায় না। অধিকন্তু সরকারী কলেজের সাহায্যও কমাইয়া দেওয়া হয়। এইজন্য শিক্ষাপ্রচার ব্যপদেশে ১৮৭২ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মেট্রোপলিটান (বিদ্যাসাগর) কলেজ স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে পদচ্যুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও ব্যারিষ্টারী করিবার অনুমতি পান না। তাঁহার প্রতি এজাতীয় ব্যবহারে সমগ্র শিক্ষিত সমাজ বিচলিত হইয়া উঠেন; কিন্তু কেহ তাঁহাকে সক্রিয় সাহায্যও দিতে পারেন নাই। এই সময় একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যাপক পদে বহাল করিয়া সুরেন্দ্রনাথের ভাবী জীবন তথা ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ রাজনীতিক আন্দোলনে সহায়ক হন। * এদিকে

---

* সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭১ সালের ২২শে নবেম্বর শ্রীহট্টে অ্যাসিট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বহাল হন। কিন্তু তাঁহার যোগ্যতায় ঐ স্থানের উচ্চপদস্থ ফিরিঙ্গী সরকারী কর্মচারীরা ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠে এবং তাঁহাকে অযোগ্য প্রমাণের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগে। এই সময় মিঃ সাদারল্যাণ্ড নামক জনৈক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শ্রীহট্টের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই ব্যক্তি সুরেন্দ্রনাথকে অপদস্থ করার এক অপূর্ব সুযোগ পান। যুধিষ্ঠির নামক এক ব্যক্তি নৌকাচুরির অপরাধে গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু আসামী ফেরার বলিয়া উল্লিখিত

অতৃপ্ত বাঙালী-প্রতিভা নানাদিকে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতে থাকে; যুগপৎ তাহার সাহিত্য, ( বিশেষতঃ বঙ্কিম ) রঙ্গমঞ্চ, ( ন্যাশনাল থিয়েটার ) বিজ্ঞানসভা ( ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ) নূতন পথ-রচনায় প্রবুদ্ধ হয়।

লক্ষ্যের বিষয়, বাঙালী শিক্ষিত সমাজ যেমন শাসকদের বিষনজরে পড়ে, তেমনি মুসলমানদের মধ্যে ওয়াহাবী সম্প্রদায়ও তাহাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়। এই ওয়াহাবীরা গোড়া ধর্মসম্প্রদায়; তাহারা একদিকে মুসলমানদের মধ্যে শুদ্ধি আন্দোলন চালাইতে থাকে অন্যদিকে অবিশ্বাসীদের উচ্ছেদে আত্মনিয়োগ করে। ইহাদের আদি বাসভূমি আরবে; কিন্তু ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে তথাকার শাসনকর্তা ইব্রাহিম পাশা উহাদের উৎখাত করার পর তাহারা ভারতে আশ্রয় নেয়। এখানে আসিয়া তাহারা মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের সুযোগ নেয় এবং তাহাদের বিতাড়নের জন্য আন্দোলনের সূচনা করে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাহারা দেশব্যাপী বিপ্লবে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এইহেতু ইংরেজসরকার তাহাদের প্রতি খরদৃষ্টি রাখে এবং তাহাদের নেতা আমীর খাঁকে ১৮১৮ সালের তিন আইনে ভারতরক্ষা বিধান বলে আটক রাখা হয়। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করায় আদালতে শাসকদের বহু গোপন অপকীর্তি ও নগ্নরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। এ ব্যাপারেও দেশের সর্বত্র বিপুল চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। এইভাবে একাধিক ব্যাপারে ইংরেজ-কুশাসন সম্পর্কে ভারতবাসী মাত্রই বেশী মাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিতে থাকে।

---

এক নথিতে সুরেন্দ্রনাথ সহি করেন। এই নামমাত্র ত্রুটির অজুহাতে এক কমিশন বসান হয়। উহার সভ্যরা একযোগে তাঁহাকে দায়িত্বপূর্ণ কাজের অনুপযুক্ত সাব্যস্ত করেন। ভারত সরকারও কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে মাসিক ৫০৲ টাকা মাসোহারা দিয়া চাকুরি হইতে বিদায় দেয়।

এই সময় শিক্ষিত ভারতীয়দের মিলনস্থল 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ক্রমশ শুধু জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ম অবহিত হইতে থাকে। ইহারই প্রতিবাদে ৺শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার ভ্রাতাদের সহায়তায় ১৮৭৫ সালে ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপন করেন। এই লীগের সহিত আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু ইণ্ডিয়ান লীগের দ্বারা কিছু প্রয়োজনীয় কাজ হইলেও শিক্ষিত ভারতবাসীর অভাব অভিযোগ প্রকাশ ও যথার্থ প্রতিকার ব্যবস্থা উহার মারফত হয় নাই; এই জন্ম অল্পকাল মধ্যে নিখিল ভারতীয় আদর্শে ১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ( ভারত সভা ) প্রতিষ্ঠিত হয়। আনন্দমোহন ইহার সম্পাদক পদে বৃত হন। ভারতসভা প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ম্যাৎসিনীর ঐক্যবদ্ধ ইতালীয় প্রেরণা কাজ করে। এদিকে আনন্দ মোহন বসু পুনার ছাত্রসভার আদর্শে কলিকাতায় 'ষ্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন' বা ছাত্রসভা প্রতিষ্ঠা করেন। তখনও সুরেন্দ্রনাথ ইউরোপ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন নাই। প্রত্যাগত সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রসভাকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধের চেতনা জাগাইয়া তুলিতে থাকেন। পূর্ব হইতে দেশে আন্দোলনের অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হয়। সুরেন্দ্রনাথ তাহারই সুযোগে নিজের অপূর্ব বাগ্মীতা বলে দেশের শিক্ষিত মনকে কর্মমুখী করিয়া তুলিতে থাকেন। ম্যাৎসিনীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ বহু যুবক তখন হইতেই গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন। কিন্তু দেশসেবার তখনও কোন সুস্পষ্ট ধারণা বা কর্মপন্থা ছিল না বলিয়া তাঁহারাও ছিলেন নিষ্ক্রিয়।

ভারতসভা প্রতিষ্ঠার পর হইতে সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারতীয় রাজনীতি সর্বপ্রথম অন্তর্মুখী হইয়া উঠে; ইহার একটি সুনির্দিষ্ট গতি ও রীতিক্রমও এই সঙ্গে গড়িয়া উঠিতে থাকে। এইভাবে দেশের অসন্তোষ ও অভাব অভিযোগকে উপলক্ষ করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সুরেন্দ্র

নাথ হন অগ্রণী। পক্ষান্তরে মাদ্রাজে আনন্দ চার্লু এবং মহারাষ্ট্রে বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলঙ্কর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে দেশের দুর্দশার কথা শুনাইয়া তাহাদের আত্মস্থ হইতে আহ্বান জানান।

এস্থানে মনে রাখিতে হইবে, তখন ভারতীয় রাজনীতির ঊষাকাল—কাজেই আবেদন-নিবেদনের যুগ; শাসকের নিকট হইতে কতটা পরিমাণ চাকরি বা ঐজাতীয় সুখসুবিধা আদায় করা যায়, তাহাই হইয়া পড়ে তখনকার দিনের আন্দোলনের সার কথা।

পুনরায় মূল প্রসঙ্গে আসা যাউক। ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হয় চতুর্বিধ উদ্দেশ্য লইয়া যথা (১) জনমত গঠন, (২) রাজনীতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণকল্পে বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির মধ্যে ঐক্যের উন্মেষ, (৩) হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন এবং (৪) সমসাময়িক আন্দোলনের সঙ্গে সাধারণের সংযোগ সাধন।

অবশ্য ভারতের অন্যত্র অর্থাৎ ১৮৭২ সালে স্থাপিত পুনার সার্বজনিক সভা ও ১৮৭৮ সালে স্থাপিত মাদ্রাজের মহাজন সভাও কিছুটা কাজ করিতে থাকে। কিন্তু উহাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক ; ভারত সভার মত নিখিল ভারতীয় উদ্দেশ্য উহাদের ছিল না। বিপিন চন্দ্রের ভাষায় বলা যায় 'সুরেন্দ্র নাথের উদ্যোগ ও প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত ভারতসভাই সর্বপ্রথমে ভারতের রাষ্ট্রীক চিন্তা ও কর্মধারাকে সংহত ও একসূত্রে আবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়।' বস্তুত, ভারত সভার মধ্যেই রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) বীজ নিহিত ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও বেগবৃদ্ধিতে একদিকে যেমন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন সহায়তা করে, অন্যদিকে সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রও জনমত গঠন ও জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষার পূর্তি ও অভিব্যক্তিকল্পে কম সহায়ক হয় না। বরং নানাদিক হইতে উহাদের দানে

জাতীয় জীবনের পুষ্টি ও সমৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার দশ বছর আগেও দেশে ৪৭৮টি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র ছিল। কৃষ্ণদাস পাল ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট', নরেন্দ্রনাথ সেনের 'ইণ্ডিয়ান মিরর', ঘোষ পরিবারের 'অমৃত বাজার পত্রিকা' এবং সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণে ও সরকারী অনাচারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের ধারা প্রবর্তন করে, তাহা নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। পুনার 'মারাঠা' ও 'কেশরী', বোম্বাইয়ের 'রাস্ত গফ্‌তর', 'বোম্বাই সমাচার' এবং মাদ্রাজে আনন্দ চার্লুর 'হিন্দু' বহুভাবে দেশসেবা করিতে থাকে। এদিকে আদালত অবমাননার দায়ে ১৮৮৩ সালের ৫ই মে সুরেন্দ্রনাথের ২ মাস কারাদণ্ড হয়। সুরেন্দ্রনাথের এই নিগ্রহভোগে দেশবাসী বিচলিত হইয়া উঠে; পরবর্তীকালে সংবাদপত্র সেবায় অনেকে দুঃখবরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তৎকালে সুরেন্দ্র নাথই প্রথম এই ব্যাপারে নিগ্রহ ভোগকারী। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার প্রতিক্রিয়া হইতে থাকে, সর্বত্র জনসভায় দণ্ডদানের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত ও সুরেন্দ্র নাথের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সুরেন্দ্র নাথ ছিলেন ছাত্র সম্প্রদায়ের আদর্শ। কাজেই তাঁহার দণ্ডদানকে উপলক্ষ করিয়া কলিকাতার ছাত্রসমাজ বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠে। তাঁহার বিচারের দিন ছাত্ররা ধর্মঘট করিয়া (স্যর) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হাইকোর্টের প্রাঙ্গনে তুমুল বিক্ষোভ প্রকাশ করে। এই ব্যাপার হইতেই ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত।

এমনি ধারা অবস্থায় দেশে আন্দোলনের গতি এক সুনির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হইতে সুরু করে। সরকারী চাকুরী বিশেষত 'লৌহ কাঠামো' (Steel Frame) সিবিল সার্বিসকে উপলক্ষ করিয়া এই আন্দোলন; ভারতে ইহার পূর্বে নবসৃষ্ট শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে যে-আন্দোলনের সূচনা

দেখা যায় তাহা সকল ভারতবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করিবার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না।

১৮৫৩ সালের সনদে শাসনসৌকর্য ও ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজভাবাম্বিত চাকুরিয়া সম্প্রদায় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতামূলক করা হয়; এই সম্পর্কে পরীক্ষার্থী প্রতিযোগীদের বয়স করা হয় অনূর্ধ তেইশ বছর এবং তাহাদের শিক্ষানুবিশীর কাল হয় দুই বৎসর। কিন্তু ছয় বৎসর অতীত না হইতেই ১৮৫৯ সালেই প্রতিযোগীদের বয়স ও শিক্ষানুবিশীর কাল যথাক্রমে এক বছর কমাইয়া বাইশ ও এক বছর করা হয়। আবার উহার দুই বছর পর তাহাদের বয়স অনূর্ধ একুশ ও শিক্ষানুবিশীর কাল ২ বছর করা হয়। ইহা লর্ড মেকলের ব্যবস্থা; তিনি ভারতের প্রথম আইনসচিব। উক্ত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয়রা যাহাতে শাসন বিভাগে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করা; কেননা দেশের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নূতন পরীক্ষায় উল্লিখিত বয়সের মধ্যে প্রতিযোগিতা করা ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এই সম্পর্কে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ১০ বছরে মাত্র ১৩ জন ভারতীয় প্রতিযোগীর মধ্যে এক সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর ছাড়া আর কেহ সিবিল সার্বিসের 'অগ্নি পরীক্ষায়' উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কাজেই শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষের মাত্রা বাড়িতে থাকে; তাঁহাদের ক্রমশ এই সন্দেহই হইতে থাকে যে মহারাণীর ঘোষণাবাণী কার্যকর করা বৃটিশ সরকারের অভিপ্রেত নহে। ভারতশাসন বিধানে ভারতীয়দের অধিকার স্বীকৃত হইলেও কার্যত তাহাদের শাসনবিভাগে প্রবেশাধিকার সর্বোপায়ে সঙ্কুচিত ও খর্ব করিবার ব্যবস্থা হইতে থাকে। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও ভারতশাসনকারী চক্রীরা কঠোরতর নিষেধবিধি প্রবর্তনে ব্যগ্র হইয়া উঠে। রক্ষণশীল ভারতসচিব লর্ড সল্সবেরী ১৮৭৬

সালের ফেব্রুয়ারীতে সিবিল সার্বিস প্রতিযোগীদের বয়স ২১ হইতে কমাইয়া ১৯ করেন। এদিকে ১৮৭০ সালে সিবিলিয়ানদের অনুরূপ পদে ভারতবাসীকে ভারত হইতে নিয়োগের জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহাও কার্যকর করা হয় না। ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিটন ভারত সচিবকে এক গোপন পত্রে লিখেন,—'ভারতবাসীদের সিবিল সার্বিসে নিয়োগ করা সম্পর্কে যে দাবী করা হইয়াছে, তাহা পূরণ করা আদৌ সম্ভব নহে। * * * কাজেই আমাদের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা আছে,—হয় তাহাদের দাবী অস্বীকার করা, নয় তাহাদের প্রবঞ্চনা করা। আমরা দ্বিতীয় উপায়টিই বাছিয়া নিয়াছি।'

এবার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া যথার্থই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। তাঁহারা উপলব্ধি করেন, শাসন ব্যবস্থায় যে সামান্য অধিকার ও সুযোগ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাদের বঞ্চিত করা হইবে। কাজেই ১৮৭৭ সালের ২৪ মার্চ কলিকাতার টাউন হলে ভারত সভার উদ্যোগে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়; উহাতে ভারত সচিবের স্বৈরাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ অসহায় প্রতিবাদ জানান হয়। সভায় স্থির হয় যে, সভার কোন প্রতিনিধির মারফতে পার্লামেণ্টে সিবিল সার্বিস সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিপত্র পাঠান হইবে; আরও স্থির হয়, ভারতের সর্বত্র উক্ত লিপির মর্ম সুরেন্দ্র নাথ বুঝাইয়া দিবেন।

ইহাতেই নূতন ভাবে ও নূতন খাতে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। আবেদন নিবেদন হইলেও ভারতীয় রাজনীতিতে ইহা অভিনব। ইহার পূর্বে আর সর্বভারতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় লইয়া আন্দোলন হয় নাই, আন্দোলন করার মত অনুকূল অবস্থাও ছিল না। এই ভাবে জনসভানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ভারতবাসীকে এক সূত্রে আবদ্ধ করার এক ঐতিহাসিক সুযোগ উপস্থিত হয়।

সভার নির্দেশ অনুসারে সুরেন্দ্র নাথ ১৮৭৭ সালের মে ও জুন মাসে সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করিয়া জনসভার অনুষ্ঠান করেন এবং উক্ত ব্যাপারে

শিক্ষিত ভারতবাসীর দায়িত্বের কথাও সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতে থাকেন। আবার পর বছর ( ১৮৭৮ ) শীত কালে তিনি একই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি প্রায় সর্বত্রই সাড়া জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হন। বোম্বাই-এ কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং, ফিরোজ শাহ মেটা ও পুনার মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে তাঁহাকে এই ব্যাপারে সমর্থন করেন। উত্তর ভারতের সমুদয় প্রসিদ্ধ জননেতার সঙ্গেও তিনি পূর্ববৎসরের ভ্রমণকালে পরিচিত হন। এইভাবে সিবিল সার্বিসকে উপলক্ষ করিয়া ভারতসভার উদ্যোগে সুরেন্দ্র নাথ যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেন, তাহাতে শিক্ষিত ভারত-বাসীর মধ্যে এক আত্মীয়তা-বোধের উন্মেষ হয়; শীঘ্রই তাঁহারা নিজেদের অভাব অভিযোগ আলোচনার উদ্দেশ্যে একত্রে মিলনের উপযোগী এক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব অনুভব করিতে থাকেন।

একদিকে দেশবাসীর চৈতন্য জাগাইয়া তুলিতে যেমন আন্দোলন প্রবর্তিত হয়, অন্যদিকে তেমন পার্লামেণ্টেও শিক্ষিত ইংরেজ সাধারণকে ভারতের সমস্যার প্রতি অবহিত করার চেষ্টা হইতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে বিলাতে বাগ্মীপ্রবর লালমোহন ঘোষ ভারতবাসীর প্রতি অবিচারের কথা উল্লেখ করিয়া নানাস্থানে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেন। দেশে ও বিলাতে একই সময়ে আন্দোলন করায় গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য হয় এবং ১৮৭০ সালের রচিত বিধান কার্যকর করার জন্য তাহারা ১৮৭৯ সালে যত্নবান হয়। ইহার ফলে 'ষ্ট্যাটুটারী সিবিল সার্বিসের' প্রবর্তন হয়; কিন্তু ইহা সত্বেও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার ও অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতবাসীর নিয়োগের পথে কার্যত প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করা হয়। এই হেতু উক্ত ব্যবস্থা শিক্ষিত সাধারণের মনঃপূত হয় নাই।

এদিকে ভারত সরকার ১৮৭৮-৭৯ সালে আফগানীস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; উহার উদ্দেশ্য রাশিয়ার প্রভাব খর্ব করা। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ববর্তী

বৎসর ১৮৭৭ সালে দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক ও মারাত্মক দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হয়; অথচ ইহার প্রতি সরকার যেরূপ উদাসীন ভাব দেখায় তাহাতে দেশবাসী ঘোর বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়ে। এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়াও ভারতে, বিশেষ করিয়া বাংলায় তুমুল আলোড়ন হয়; ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে উহার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা হইতে থাকে। অমৃতবাজার, সাধারণী, সোমপ্রকাশ, চারুমিহির প্রভৃতিতে সরকারী দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য বাহির হয়। সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে দেশের পক্ষে ইহার ফল শুভই হয়। প্রাকৃতিক দুর্দৈবের মধ্য দিয়াও ভারতবাসী নিজেদের অসহায়তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে থাকে।

ইহাতে ভীত হইয়া রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে ১৮৭৮ সালের ১৪ই মার্চ 'ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' জারী করে। উহার প্রতিবাদে নববিভাকর, সাধারণী ও সোমপ্রকাশের প্রকাশ বন্ধ রাখা হয় এবং ইংরেজী ও বাংলায় সম্পাদিত 'অমৃতবাজার পত্রিকাকে' রাতারাতি পুরা ইংরেজী সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত করা হয়। সংবাদপত্রের ইতিহাসে এই জাতীয় প্রতিবাদ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে সমগ্র আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়া যায়।

এহেন অবস্থায় শাসন কর্তৃপক্ষের ধারণা জন্মে যে, ভারতবর্ষে ব্যাপক অভ্যুত্থান আসন্ন। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বে ভারতে যেরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল ভারতের তৎকালীন অবস্থার সহিত তাহার সাদৃশ্য বর্তমান বলিয়া তাহারা অনুভব করে। কাজেই সশঙ্কিত বড়লাট লর্ড লিটন অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করেন। একটি মাত্র কলমের আঁচড়ে ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হিন্দু ও মুসলমানের অস্ত্রব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়া যায়; পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্গদের অস্ত্রব্যবহার পূর্বের মতই বহাল থাকে।

এইভাবে ভারতবাসীকে নিবীর্য করিবার শেষ ব্রহ্মাস্ত্রও সরকারী তূণীর হইতে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার ফলে শিক্ষিত ভারতবাসী বৃটিশ শাসনের পুরা বিরুদ্ধবাদী হইয়া পড়েন।

এইসব ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া ভারত-সভার উদ্যোগে বিরাট আন্দোলনের উদ্ভব হয়। এদিকে বৃটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা মিঃ গ্লাডষ্টোন ভারত-সভার তরফ হইতে বিলাতেও আন্দোলন চালাইতে থাকেন। ইতিমধ্যে ১৮৮০ সালে বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন হয়; নির্বাচনে ভারতীয় প্রশ্নও অন্যতম মুখ্য সমালোচনার বিষয় হইয়া দাড়ায়; উদারনীতিক দল গবর্ণমেন্টের ভারতীয় নীতির তীব্র নিন্দা করে। যেকারণেই হউক নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটে এবং উদারনীতিক দল জয়যুক্ত হওয়ায় গ্লাডষ্টোন নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ইহার ফলে ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন উপায়ন্তরহীন হইয়া পদত্যাগ করেন এবং তাঁহার পরিবর্তে লর্ড রিপন এদেশের বড়লাট নিযুক্ত হন। তিনি ভারতে পদার্পন করিয়াই প্রেস আইন রদ করেন বটে, কিন্তু অস্ত্র আইন বহাল রাখেন। মজা এই, বৃটিশ মন্ত্রিসভা পরিবর্তিত হইলেও ভারতে বৃটিশ অনুসৃত নীতি উদারনীতিক দলের আমলেও অপরিবর্তিত থাকিয়া গেল। বৃটিশ দলগত রাজনীতির ইহাই চিরন্তন মহিমা। শাসনদণ্ড হস্তগত করিবার কৌশল হিসাবে তাহারা যেকোন উপায় গ্রহণ করিতে পারে, ভারতীয় প্রশ্নকেও প্রয়োজন হইলে তাহারা প্রধান আলোচ্য বিষয় করিয়া তোলে,—কিন্তু সাম্রাজ্যিক স্বার্থের খাতিরে উহাকে যেকোন মুহূর্তে বলি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহাতে উদারনীতিক, রক্ষণশীল ও শ্রমিকে কোনরূপ মতভেদ নাই। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

অবশ্য লর্ড রিপনের আমলেও যে কিছু কিছু সংস্কারমূলক ব্যবস্থা না হয় এমন নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ১৮৮৫ সালে বঙ্গে স্থানীয় স্বায়ত্ত

শাসন মূলক আইন প্রণীত হয়; ইহার মধ্যে বাংলায় জেলা ও লোকাল বোর্ডের সূচনা নিহিত। ঐ সালে প্রজাস্বত্ব আইন গৃহীত হয় এবং তদ্দ্বারা জমিতে প্রজার স্বত্ব সুনির্দিষ্ট হয়। কিন্তু ভিন্ন এক কারণে তাঁহার শাসনকাল সমধিক স্মরণীয়। ইতিপূর্বে দেশীয় সিবিলিয়ানরা শ্বেতাঙ্গদের ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় অপবাধের বিচার করিবার অধিকাবী ছিলেন না; বিচার-ব্যবস্থায় ও বর্ণ-বৈষম্যের এমনই প্রকোপ ছিল। লর্ড রিপন তাঁহার আইন সচিব স্যর কোর্টনে ইলাবার্টকে দিয়া এই বৈষম্যমূলক আইন রদের জন্য ১৮৮২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী একটি আইনের খসড়া পরিষদে পেশ করান। ইলবার্ট সাহেবের নাম অনুসারে বিলের নামকরণ হয় ইলবার্ট বিল। এই ব্যাপারে অবস্থা একেবারে চরমে উঠে। যদিও বা এতদিন শাসকসমাজের আসল মনোভাব গোপন ছিল, তাহাও এই বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া নগ্নভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে; কৃষ্ণাঙ্গ বিচারক শ্বেতাঙ্গের বিচার করিবে, এই দুশ্চিন্তায় সমগ্র ইউরোপীয়কুল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে তাহারা এমনই একজোট হয় যে, বড়লাট লর্ড রিপনকে বলপূর্বক বিলাতে পাঠাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত তাহারা করে। আশ্চর্য এই, বাঙলার তৎকালীন ছোট লাট স্যর রিভার্স টমসনের জ্ঞাতসারেই এই ষড়যন্ত্র হয়। শুধু তাহাই নহে; শ্বেতাঙ্গ সমাজ আত্মরক্ষার জন্য 'ডিফেন্স এসোসিয়েশন'ও গঠন করে; ইহাই কুখ্যাত 'ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের' আদি প্রতিষ্ঠান।

ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও পর বছর ইলবার্ট বিল গৃহীত হয় বটে, কিন্তু তাহাও সীমাবদ্ধ আকারে। শ্বেতাঙ্গ আসামীর অনুরোধ মত দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বা দায়রা জজকে অর্ধেক ইউরোপীয় জুরির ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া বিলে ধারা সন্নিবিষ্ট হয়; কাজেই বিচারের ব্যবস্থা কার্যত অচল থাকে। এরূপ অবস্থায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃটিশ সমদর্শিতা সম্পর্কে যেটুকুও বা মোহ ছিল, তাহাও এই ব্যাপারে দূর

হয়। ইউরোপীয় সম্প্রদায় প্রকাশ্যে বলিতে থাকে—ভারতবাসী দাসজাতি ; স্বাধীন মানুষের অধিকার ভোগে তাহারা অযোগ্য।

ইতিমধ্যে 'বেঙ্গলী'তে লিখিত এক প্রবন্ধের জন্য আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্র নাথ দণ্ডিত হন। ভারতের বিভিন্ন অংশের অধিবাসী প্রাদেশিক সীমা বিস্মৃত হইয়া এই দুইটি ব্যাপারকে সর্বভারতীয় অপমান বলিয়া গ্রহণ করে এবং উহার মধ্যে জাতীয় বেদনা ও হীনতা প্রতিফলিত দেখিতে পায়। এইভাবে নানা ঘাত প্রতিঘাতে ভারতীয় ঐক্যবোধ ক্রমশ দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

এহেন অবস্থায় সর্বভারতীয় মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে কৃষ্ণনগরের উকিল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় সঙ্ঘবদ্ধ রাজনীতিক আন্দোলন পরিচালনাকল্পে একটি 'ন্যাশনাল এসেম্বলী' বা অখিল ভারতীয় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় ধন-ভাণ্ডার গঠনের উদ্দেশ্যে পত্র লিখেন। নেতৃবৃন্দের নিকটও উক্ত মর্মে চিঠি দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া কারাগার হইতে মুক্তি-লাভের পর ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বরে কলিকাতায় একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন এবং তিনদিনের অধিবেশনে ( ২৮, ২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর ) শাসন সংস্কার ও রাজনীতিক দাবী সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পর সুরেন্দ্রনাথ ১৮৮৪ সালের মে মাসে ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ রাজনীতিক আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্যে এবং ধন ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তর ভারতের বহু নগরে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান। এইবার তিনি পূর্ববারের চেয়েও শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে অধিকতর রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ দেখিতে পান। এদিকে ১৮৮৫ সালে ২৫, ২৬ ও ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় এবং ইহাতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু প্রতিনিধি যোগ দেন। আশ্চর্য এই, ১৮৭৭ সালের লর্ড লিটনের দরবারে

ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত ব্যক্তিদের দেখিয়াই নাকি এই নিখিল ভারতীয় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গড়িবার কল্পনা নেতৃবৃন্দের মনে প্রথমে উদয় হয়। অবশ্য একথাও সত্য, ১৮৮৩ সালে কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের পর হইতে ভারতের বিভিন্ন সহরে জাতীয় উন্নতির জন্য সাড়া পড়িয়া যায়। তবে ১৮৬৭ সালের হিন্দু বা চৈত্র মেলার বার্ষিক অধিবেশনের মধ্য দিয়াই বাঙালীর মনে সর্বপ্রথম অখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িবার স্বপ্ন জাগে; উহারই পূর্ণ পরিণতি দেখা যায় রাষ্ট্রীয় মহাসভা (কংগ্রেস) প্রতিষ্ঠায়।

কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বৈচিত্রময়। ইহার গোড়ায় ভারতবাসী থাকিলেও সরকারীভাবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন মিঃ হিউম নামক জনৈক 'ভারতবন্ধু' ইংরেজ সিবিলিযান। তিনি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী ছিলেন।

সরকারী কর্মচারী হইয়াও যে কেন তিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন, তাহা অনেকের নিকট দুর্বোধ্য মনে হয়। অধিকন্তু, যে সিবিলিয়ানী চক্র ভারতের অস্ফুট আশাআকাঙ্ক্ষার টুটি চাপিয়া ধরিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়, তাহাদেরই মধ্যে একজন ভারতবাসীর সহিত হরিহরাত্মা হইয়া যাইবে বলিয়া কেহ আশা করিতে পারে নাই। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে সেই অসম্ভবও সম্ভব হয়; তাহার কারণও সুস্পষ্ট।

শাসক হিসাবে লর্ড রিপনের পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড লিটন ছিলেন স্বৈরাচারী, জাঁকজমকপ্রিয় ও বর্ণাভিমানী। তাঁহারই অবিমৃষ্যকারিতায় ভারতবাসী মনে-প্রাণে বৃটিশ বিরোধী হইয়া উঠে; দক্ষিণ ভারতের দুর্ভিক্ষের ফলে যখন ৫০লক্ষ লোক অনশনে প্রাণ হারায়, তখন তিনি ভারতবাসীকে চমক লাগাইবার উদ্দেশ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' উপাধি ধারণ উপলক্ষে ১৮৭৭ সালে দিল্লীতে এক বিরাট দরবার অনুষ্ঠান করেন। দেশের দারুণ দুর্দৈবে তিনি যে শৈথিল্য ও হৃদয়হীনতা দেখান, তাহা অতুলনীয়। একদিকে

অন্নাভাব ও দুর্ভিক্ষের তাড়নায় নিরক্ষর জনসাধারণ, অন্যদিকে দেশীয় সংবাদপত্র দমনে ও অস্ত্র আইন জারীতে বিদ্বিষ্ট এবং চাকরির ক্ষেত্রে সরকারী কৃপণতায় বীতরাগ শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। মুসলমানদের মধ্যে ওয়াহাবীরা ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে গোপন আন্দোলন ও ষড়যন্ত্রে রত থাকে। এইহেতু ইহাদের উপর নানা উৎপীড়ন ও নির্যাতন চলে; এমনকি তাহাদের অনেককে আন্দামানে নির্বাসিতও করা হয়। কিন্তু তাহাতে তাহাদের মনোবল আদৌ নষ্ট হইল না। ১৮৭২ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মেয়ো আন্দামান পরিদর্শনে গেলে তাঁহাকে খুন করা হয়। এদিকে সামন্ত নরপতিরাও নিজেদের অধিকার খর্ব হওয়ায় অসন্তুষ্ট ছিল; সিপাহী অভ্যুত্থানের পর হইতে তাহাদিগকে বৃটিশ রাজের মিত্রশক্তি বলিয়া গণ্য করা হইতে থাকে; কিন্তু দিল্লীর দরবারে অধীন রাজা বলিয়া তাহাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়। দেশের এই জটিল অবস্থায় অনেকে বৃটিশশাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধেও উদ্যত হয়; দাক্ষিণাত্যে বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্রে বলবন্তরাও ফাড়কের নেতৃত্বে ইতিহাস-খ্যাত কৃষক বিদ্রোহ ইহার প্রমাণ। সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ইহাই সর্বপ্রথম সঙ্ঘবদ্ধ অভ্যুত্থান।

ভারত সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল থাকা কালে মিঃ হিউম দেশবাসীর মনোভাব ও দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিলেন। কাজেই তাঁহার ধারণা হয়, অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থার মতই দেশে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ইন্দো-বৃটিশ সম্পর্কের আর যাহাতে অবনতি ঘটিতে না পারে, সে বিষয়ে তিনি চিন্তা করিতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে সরকারী চাকরি হইতে অবসরগ্রহণের পর তিনি বিক্ষুব্ধ ও বিদ্বিষ্ট ভারতবাসীর মনকে বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুকূল করিয়া তুলিতে এবং তাহাদিগকে নিয়মতন্ত্রসম্মত পথে পরিচালিত করিয়া সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা অঙ্কুরেই নষ্ট করিতে যত্নবান হন। কিন্তু তাহা

করিতে গেলে দেশের মুখপাত্র বলিয়া গণ্য একদল শিক্ষিত ভারতবাসীকে স্বমতানুবর্তী করিতে হইবে,—অথচ সুরেন্দ্রনাথ আনন্দমোহন প্রমুখ মুষ্টিমেয় খ্যাতিমান ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ইংরেজী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণের মনে অসন্তোষের বীজ ছড়াইয়া দিতে থাকেন। এহেন অবস্থায় সর্বভারতীয় মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে নিজেদের অভাব অভিযোগ আলোচনা করিতে পারিলে ভারতীয় আন্দোলনের বিদ্রোহাত্মক গতিও সীমাবদ্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া তিনি স্থিরনিশ্চয় হন। তাঁহার প্রচেষ্টার পিছনে সরকারী অনুমোদনও যে না ছিল এমন নহে। তবে ইহাতে তাঁহার পুরা সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা ছিল, ইহাও স্বীকার্য। কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার পটভূমিকা ইহাই।

মিঃ হিউম প্রথমে ১৮৮৩ সালে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন' স্থাপন করেন। ইহা কংগ্রেসের অগ্রজ প্রতিষ্ঠান। ইতিমধ্যে আসল কাজ গুছাইয়া আনিতে তাঁহার দুই বছর সময় লাগিয়া যায় এবং ১৮৮৫ সালের মার্চে ভারতের বিভিন্ন স্থানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে এক সম্মেলন আহ্বানের কথা বিজ্ঞাপিত হয়। এই সম্পর্কে বোম্বাই-এর নেতা কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং সুরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনের কার্যবিবরণ চাহিয়া নেন। এদিকে হিউম সাহেব ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিনের সহিত উক্ত বিষয়ে আলোচনার পর প্রস্তাবিত সম্মেলনকে সাধারণের মতামত ব্যক্ত করিবার উপযোগী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তুলিতে চাহেন।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে বড়লাট ও আমলাতন্ত্রের সম্মতি ও সহযোগিতা বাঞ্ছা করা হয়। শুধু তাহাই নহে, শাসকদের মতামতের বাহন হিসাবেও যাহাতে ইহাকে ব্যবহার করা চলে, তদনুযায়ী বন্দোবস্তও করা হয়। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রথমদিকে বোম্বাই-এর তৎকালীন গবর্ণরকে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি করার কথা স্থির

হয়। কিন্তু তাহাতে উপস্থিত প্রতিনিধিদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে বিঘ্ন ঘটিতে পারে মনে করিয়া বড়লাটের পরামর্শক্রমে উক্ত ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। কাজেই সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজন কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি মনোনীত হন।

প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন পুনায় হইবার কথা হয়; শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতিতে তখন পুনা বোম্বাই প্রদেশে অগ্রণী। কিন্তু অধিবেশনের প্রাক্কালে সেখানে মারাত্মকরূপে কলেরা দেখা দেওয়ায় শেষ মুহূর্তে ১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। উহাতে ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধি যোগ দেন; পুনার সার্বজনীক সভার সভাপতি, মারাঠা ও কেশরীর সম্পাদক গোপাল গণেশ আগরকর, কলিকাতার নরেন্দ্র নাথ সেন, গিরিজাভূষণ মুখার্জি, বোম্বাইএর দাদাভাই নৌরজী, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং, ফিরোজ শাহ মেটা, দীনশাহ ওয়াচা, মাদ্রাজ মহাজন সভার সভাপতি, এস সুব্রহ্মণ্য আয়ার, আনন্দ চার্লু, 'হিন্দুর' সম্পাদক জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয় বটে, কিন্তু ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের নায়ক ও জাতীয় জাগরণের পুরোধা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বা আনন্দ মোহন বসু, শিশির কুমার ঘোষ বা তদীয় ভ্রাতা মতিলাল ঘোষ— যাঁহারা কোনরূপ সরকার-বিরোধী আন্দোলনের সহিত বিন্দুমাত্রও জড়িত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অপাংক্তেয় বিবেচিত হন। ইহার মূল কারণ এই যে, সরকারের সহিত সহযোগিতায় যে কংগ্রেসের জন্ম, তাহাতে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় ও সরকারের বিবেচনায় বিপজ্জনক অথবা প্রগতিবাদী ব্যক্তিদের স্থান হইতে পারে না। সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির বেলায় এই হেতু বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা হয়।

ইহা সত্ত্বেও প্রথম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব বা বক্তৃতাদি একান্ত বশম্বদ-গোছের বা রাজভক্তিমূলক হয় নাই, সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনাও

উহাতে হয়। কিন্তু কংগ্রেসে ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এই মনে স্থির হয় যে, ইংরেজ-শাসনাধীনে শান্তিতে বসবাস করিয়া ভারতবাসী কিঞ্চিৎ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবে। ইহাই তৎকালীন সামান্ত সংখ্যক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্ব-বিরোধী মনোভাব ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি।

এদিকে প্রথম অধিবেশনের পর ভারতের বিভিন্ন সহরে অনুষ্ঠিত জনসভায় কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ আলোচিত ও সমর্থিত হয়। ইহার ফলে জন-সাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের কথা ও বাণী প্রচারের সুযোগ উপস্থিত হয় এবং ক্রমশ সর্বভারতের দৃষ্টি নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিবদ্ধ হইতে থাকে। একদা এমনি করিয়াই ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোকে সতর্ক ও দ্বিধাজড়িত চরণে কংগ্রেসের আবির্ভাব ঘটে।

দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধি-বেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার প্রদত্ত অভিভাষণে তিনি কংগ্রেসকে পুরা রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহার মধ্যে অস্ত্র আইন প্রত্যাহারের দাবী অন্যতম। এইবারের অধিবেশনে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ৪ শতাধিক নির্বাচিত প্রতিনিধি যোগ দেন। কিন্তু মাদ্রাজে তৃতীয় অধিবেশন হইবার পর হইতেই ভারতীয় শাসকগোষ্ঠি কংগ্রেসের প্রতি বাম হইয়া উঠেন। পূর্ববর্তী দুই বছরের অধিবেশনকালে প্রাদেশিক শাসকরা কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিয়া প্রতিনিধিদের উৎসাহিত ও সম্বর্ধিত পর্যন্ত করেন। অথচ এবারে তাঁহারা ঠিক উহার উল্টা পথ ধরেন। ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা কংগ্রেসকে সরকারের তাঁবেদার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে চাহিয়াও ব্যর্থকাম হন। কেননা দেখা যায় যে, একদিকে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় কংগ্রেসকে নিজেদের অবদমিত আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতীক বিবেচনা করিয়া ইহাতে যোগ দিতে থাকে, অন্যদিকে নেতৃবৃন্দও সাধারণের সহিত যোগাযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হন। কাজেই যে-শাসক সম্প্রদায় সিপাহী

অভ্যুত্থানের পর হইতে মুসলমান বিশেষ করিয়া ওয়াহাবী শ্রেণীর মুসলমান-দিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতে থাকে এবং জন-সাধারণকে দূরে সরাইয়া দেয় তাঁহাদেরই সাক্ষাতে যখন তাহারা কংগ্রেসের মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় তখন আর কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বরং তাঁহারা কংগ্রেসের প্রতি বিষম বৈরীভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিনও কংগ্রেসের বামপন্থী প্রবণতা দেখিয়া ভীত ও বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়েন। অথচ বিচার করিয়া দেখিলে বলা যায় যে, কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই বাগাড়ম্বড় ও সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনে একমাত্র বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু শাসনকর্তৃপক্ষের নিকট ইহাও ভাল মনে হয় নাই। তাই প্রথমাবধি ইহাকে পঙ্গু ও নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরকারী তূণীর হইতে নানা অস্ত্র প্রয়োগ করা হইতে থাকে যথা (১) অপ-প্রচার; লর্ড ডাফরিন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন যে, তাঁহারা জনসংখ্যার অনুপাতে নগণ্য অংশমাত্র (microscopic minority); শুধু তাহাই নহে; প্রাদেশিক শাসনকর্তারা পর্যন্ত এই জেহাদে যোগ দেন; উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণর স্যর অলিভার কলভিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন; (২) ভেদ নীতির প্রয়োগ; সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে মুসলমানদের প্রতি সরকারের বিরুদ্ধ মনোভাবের সুযোগ লইয়া অনেক হিন্দু সরকারী চাকুরিয়া এবং পুনরুত্থানবাদী (revivalists) বহু হিন্দু নেতা যেরূপ মনোভাব দেখান ও অসতর্ক উক্তি করেন, তাহাতে মুসলমান নেতাদের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান স্বভাবতই আহত হয়। ইহা সত্ত্বেও বহু মনীষী মুসলমান নেতা কংগ্রেসে যোগ দেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হিন্দু প্রাধান্যকে মনেপ্রাণে স্বীকার করিয়া নিতে পারেন নাই। অথচ সে সময়ের পরিবেশ অনুযায়ী মুসলমানদের যুগপৎ গবর্ণমেণ্ট এবং অগ্রগামী ও প্রগতিপন্থী হিন্দুদের বিরাগ জন্মাইবার মত অবস্থাও ছিল না; কাজেই

প্রকাশ্যে হিন্দুদের বিরুদ্ধতা করিবার মত সাহস তাহাদের ছিল না বটে, কিন্তু তাহারা হিন্দুদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এই অবস্থায় লর্ড ডাফরিন মুসলমানদের ক্ষুব্ধ সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও দুর্বলতার চূড়ান্ত সুযোগ নেন; তিনিই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মারাত্মক ভেদতত্ত্বের সর্বপ্রথম উদ্ভাবক; তিনি এই মতবাদ প্রচার করেন যে, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র জাতি। শুধু তাহাই নহে, গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে আলীগড়ের স্যর সৈয়দ আহম্মদকে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে উদ্যত হয়। তিনি যদিও ওয়াহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত, তথাপি সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরেজদের অশেষ সহায়তা করিয়া তাহাদের বিশ্বাস অর্জন করেন। অধিকন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর ওয়াহাবী আন্দোলনের গতি যাহাতে ইংরেজের বিপক্ষতা হইতে কংগ্রেসের প্রতিকূলে পরিচালিত হইতে পারে, তিনি সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই হেতু কৃতজ্ঞ ইংরেজ সরকার রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে 'কে সি এস আই' এবং 'স্যর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

ইংরেজ সরকারের এই কুটনীতিক খেলার মধ্যেই ভারতে মুসলমান রাজনীতিক বিবর্তনের মূল ধারা নিহিত। ইহা স্বীকার করা বেদনাদায়ক হইলেও অত্যুক্তি নহে বলিয়া নানাকারণে ধরিয়া নেওয়া যায়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সিপাহী অভ্যুত্থানের চরম প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানগণ নেপথ্যে সরিয়া যায়। কিন্তু দূরদর্শী মুসলমান নেতারা অল্পকাল মধ্যেই নিজেদের অবলম্বিত আত্মঘাতী নীতির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন; বাঙ্গলা ও যুক্তপ্রদেশের কেহ কেহ ইহার প্রতিকারের উপায়ও অনুসন্ধান করিতে থাকেন; ইঁহাদের মধ্যে স্যর সৈয়দ আহম্মদ এই ক্ষেত্রে অগ্রণী।

অবশ্য ১৮৭০—৮০ সালের মধ্যে মৌলানা জামালুদ্দিন নামক জনৈক মিশরীয় ধর্মপ্রচারক ভারতে প্যান-ইস্লাম (Pan-Islam) বা অখিল মুসলিম

স্বার্থের অখণ্ডত্ব সম্পর্কে মতবাদ প্রচার করেন। উহার পূর্ব হইতেই ভারতীয় মুসলমানগণ রাজরোষে দিশাহারা হইয়া যখন পথের সন্ধান করিতে থাকে, তখন এজাতীয় তত্ত্বের মধ্যে শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় এক নূতন জগতের আলো দেখিতে পান; তাঁহারা নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে অবহিত হইয়া উঠিতে থাকেন। এই ব্যাপারে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যথা, ১৮৮৩ সালে বাঙলায় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের আলোচনাকালে মিঃ মহম্মদ ইউসুফ নামক জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবী জানান। এদিকে সিবিল সার্বিস সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, তাহাতে ৫ জন ভারতীয় সভ্যের মধ্যে স্যর সৈয়দ আহম্মদ সহ দুইজন মুসলমান অন্তর্ভুক্ত হন। তদন্তকালে বিলাতে ও ভারতে যুগপৎ সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব হইলে স্যর সৈয়দ ও তাঁহার সহযোগী অপর মুসলমান ভদ্রলোক এই বলিয়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন যে, ভারতে পরীক্ষা গৃহীত হইলে অধিকাংশ পদই শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হিন্দুরা অধিকার করিবে। অথচ একসময় তিনিই ভারতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষাগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন।

সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমান মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় এমনি করিয়া হিন্দুদের ভাগীদার হইয়া উঠেন; আসলে ভারতবাসী হিসাবে ইংরেজদের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া নিবার জন্য যেরূপ অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি ও দুশ্চর সাধনার প্রয়োজন, স্যর সৈয়দের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল না বলিয়া তিনি সাম্প্রদায়িক সুযোগসুবিধা আদায়ের খণ্ড প্রয়াসের মধ্যে স্বীয় শক্তি নিয়োগ করেন; শুধু তাহাই নহে; কংগ্রেস সৃষ্টির গোড়া হইতেই তিনি 'পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' (Patriotic Association) বা দেশভক্ত প্রতিষ্ঠান নামক কংগ্রেসবিরোধী এক রাজনৈতিক সংসদ স্থাপন করেন। শুধু একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়াই তিনি চুপ্ করিয়া থাকেন নাই।

১৮৮৮ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনকালে অযোধ্যার মুসলমানগণ যাহাতে কংগ্রেসে যোগ না দেয়, স্যর সৈয়দ সেজন্য বিস্তর চেষ্টা করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল না হইলেও তাঁহার মত প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নক হইতে দেখিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বেদনাবোধ করিতে থাকেন। এই হেতু ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে মূল সভাপতি মহম্মদ রহিমতুল্লা সায়ানি তাঁহার অভিভাষণে মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি এতকাল উত্থাপিত হইতেছিল, তাহা খণ্ডন করেন।

সাম্প্রদায়িক অপকৌশলের আশ্রয় লইয়াও কিন্তু কংগ্রেসকে খণ্ডিত ও শক্তিহীন করা যায় নাই। বরং সময়াতিপাতের সহিত ইহা বিপ্লবধর্মী ও অন্তর্মুখী হইয়া উঠিতে থাকে। এতাবৎকাল কংগ্রেসের মুখ্য কাজ ছিল সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন করা,—প্রতিবৎসর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে উল্লিখিত ভারতবাসীর অস্পষ্ট রাজনীতিক আশাআকাংখা ও সরকারী চাকুরীর রুদ্ধ অর্গল ভারতীয়দের নিকট বেশি সংখ্যায় উন্মুক্ত করার অনুরোধ সরকারের গোচর করা। তারপর বড়দিনের ছুটিতে যে-তিনদিন অধিবেশন হইত, সেই কয়টা দিন ছাড়া দেশে আর কোনরূপ সুনির্দিষ্ট ও সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন দেখা যাইত না। ভারতীয় রাজনীতি তখনও কতকটা সখের পর্যায়ে ছিল, পেশায় পরিণত হইবার মত উপযুক্ত অবস্থা হইতে কিছুটা বিলম্ব ছিল।

ইতিমধ্যে উনবিংশ শতকের শেষ দশকে এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, যাহার জন্য ভারতবাসী আত্মস্থ ও উদ্বুদ্ধ হইবার মত প্রেরণা পায়। এই সময় আমেরিকা হইতে হিন্দুধর্ম প্রচারক রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৯৩-৯৭) বিশ্বধর্ম সম্মেলনে হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া দিগ্বিজয়ীর বেশে ভারতে ফিরিয়া আসেন; ইহার ফলে বিশ্বদরবারে

পরাধীন ভারতের মর্যাদা বাড়িয়া যায়। বিবেকানন্দ দেশবাসীকে অন্তর্মুখী হইবার মন্ত্র শিখান, বলেন—'ভারতের দুঃখদুর্দশার জন্য দায়ী ভারতবাসী নিজে; তাহা দূর করিবার উপায়ও নিজের হাতে।' তাঁহার বাণীর রেশ আসমুদ্রহিমাচল যখন ধ্বনিত হইতেছিল, তখন মহারাষ্ট্রে আর একজন শক্তিধর পুরুষ দেশকে স্বাভিমুখী ও স্বপ্রতিষ্ঠ করিয়া তোলার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। তিনি লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক। ১৮৯৩ সালে তিনি মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসব এবং ১৮৯৫ সালে শিবাজী উৎসব প্রবর্তন করিয়া মারাঠাচিত্ত জয় করেন। এদিকে ১৮৯৬ সালে ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষের সময় মহারাষ্ট্রে প্লেগের প্রকোপ হইলে তিনি স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়াও সরকারকে সহায়তা ও রোগীর সেবা করেন। কিন্তু প্লেগ দমনের নাম করিয়া প্লেগ-কমিটি যে অনাচার ও অত্যাচার করে, তাহারও তিনি ঘোর প্রতিবাদ করেন। ইহাতে সরকার বিশেষ রুষ্ট হইলেও কোনকিছু করিতে পারে না। অবশেষে ১৮৯৬ সালে তাঁহার সম্পাদিত 'কেশরীতে' শিবাজী উৎসবের বিবরণ বাহির হওয়ায় ৮ই সেপ্টেম্বর রাজদ্রোহের দায় তাঁহার দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ইতিমধ্যে প্লেগ কমিটির সভাপতি মিঃ র‍্যাণ্ড ও অন্যতম সদস্য লেঃ আয়ার্সষ্ট গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। এই ব্যাপারের সহিত তিলকের যোগাযোগ আছে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ হয়। বিচারে হত্যার দায়ে দামোদর চাপেকর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন; অধিকন্তু পুরুষানুক্রমে গবর্ণমেণ্টের অনুগত নাটু ভ্রাতৃদ্বয় বিনাবিচারে বন্দী ও তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। তাঁহারা প্লেগদমনে সরকারী অনাচার ও অত্যাচার সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে হুশিয়ার করিয়া দেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রতি উক্ত দণ্ডের বিধান হয়।

সরকারী অনাচারের বিরুদ্ধে ইহাই প্রথম সশস্ত্র প্রতিবাদ। অনেকের অভিমত, ইহাতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রকাশ্য সূত্রপাত দেখা যায়। কিন্তু ইহা দমননীতিরই প্রতিক্রিয়া।

আমলাতন্ত্রের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী প্রতিবাদ উত্থিত হয়; একদিকে ভূমিকম্প (বাংলা), দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, অন্যদিকে নির্বাসন ও কারাদণ্ডে যে বিক্ষোভ জাগিয়া উঠে, তাহারই মধ্যে ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ইহাতে তিলকের গ্রেপ্তার ও দণ্ডের বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বিনাবিচারে নির্বাসন ও ফৌজদারী আইনের প্রস্তাবিত রাজদ্রোহাত্মক ধারা সংশোধনের প্রতিবাদ করা হয়। কিন্তু এই অধিবেশনেই আবার চরম ও নরমপন্থী মতবাদের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। বরিশালের মহামতি অশ্বিনী কুমার দত্ত ত স্পষ্টই বলেন,—'বছরের তিন দিন মাত্র অধিবেশন বা সেই উপলক্ষে সভানুষ্ঠান তামাসা বই আর কিছু নয়। এই জাতীয় ব্যবস্থায় দেশের স্থায়ী উন্নতি হয় না; ইহার জন্য সংগঠন প্রয়োজন।' পক্ষান্তরে, অনাচার ও অত্যাচারের এত জলন্ত দৃষ্টান্ত থাকিতেও একদল বুদ্ধিমান লোক কিন্তু তখনও বৃটিশ সদিচ্ছা ও ন্যায়পরায়ণতায় আস্থা হারাইলেন না। ইঁহারাই পরবর্তীকালে উদারনৈতিক বা নরমপন্থী বলিয়া পরিচিত হন।

এদিকে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী কার্যকলাপের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট শঙ্কিত হইয়া উঠে, তাহারা আর কংগ্রেসের শক্তিকে উপেক্ষা না করিয়া ইহার বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের বাহ্যিক অভিব্যক্তি সমূলে বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হয়।

এই সময় (১৮৯৪—৯৮) ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড এলগিন। তাঁহার আমলে ভারতে ও বহির্ভারতে ভারতীয়দের উপর যে নিগ্রহ ও নির্যাতন আরম্ভ হয়, তাহার চরম অবস্থা ঘটে লর্ড কার্জনের শাসনকালে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্যার কথা ধরা যাক্। নাটাল ও ট্রান্সভালে এই মর্মে এক জাতিবৈষম্যমূলক আইন গৃহীত হয় যে, সহরে ভারতীয়রা বসবাস করিতে পারিবে না। অথচ ভারত সরকার ইহার

বিরোধিতা করা দূরে থাকুক, লর্ড এলগিন উক্ত আইনের প্রতি স্বীয় অনুমোদন জানাইয়া ভারতবাসীকে চূড়ান্ত অপমান করেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়গণ তাঁহাদের নেতা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীর অধিনায়কতায় সঙ্ঘবদ্ধ হন। প্রতিবাদ নিষ্ফল এবং প্রতীকারের আশা নাই দেখিয়া গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে 'নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ' (Passive Resistance) নামক এক নূতন অস্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া প্রবাসে ভারতবাসীর মর্যাদা রক্ষায় সঙ্কল্পবদ্ধ হন। কূটনীতি ও মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে আত্মিক বলের প্রয়োগ ইতিহাসে ইহাই প্রথম।

অথচ তরুণ ব্যারিষ্টার এই মোহন দাসই ১৮৮১ সালে বুয়র যুদ্ধের সময় ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়া ইংরেজদের সহায়তা করেন। পরে শ্বেতাঙ্গদের জঘন্য আচরণে বৃটিশ ন্যায়পরায়ণতার উপর তাঁহার আস্থা লোপ পায়।

প্রথমে ভারতীয়দের অতুলনীয় সংগ্রামের প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টি যথাসময়ে আকৃষ্ট হইলেও সক্রিয়ভাবে কোন সাহায্য করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই; কিন্তু ভারতীয়দের উপর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ জানাইয়া প্রবাসী সন্তানদের সংগ্রামকে নৈতিক সমর্থন করা ছাড়া কংগ্রেসের কোন গত্যন্তর ছিল না।

এইভাবে গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেস যখন নীতি ও স্বার্থের দিক হইতে প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধবাদী হইয়া পড়ে, তখন শাসকমহল নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে নাই। তাহারা বুঝিতে পারে যে, ভারতে শাসন ও শোষণ চালাইতে গেলে কংগ্রেসের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ অনিবার্য। সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতে বাছাইকরা জবরদস্ত শাসনকর্তা আমদানী করিতে থাকে এবং ১৮৯৮ সালে ঝানু সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন।

বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করার কিছুকাল পরই লর্ড কার্জন ভারত সচিবের

নিকট এক পত্রে জানান—'কংগ্রেসের দিন ফুরাইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি ; ভারতে থাকিতেই ইহার মৃত্যুশয্যা রচনা করিতে পারিব, আমার এ ভরসা আছে।'

দূরদর্শী নেতৃমহল লর্ড কার্জনের অভিসন্ধি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইলেও তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে কোনরূপ সময়োচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই ; আর শুধু প্রতিবাদ জ্ঞাপন বা বিলাতে স্মারকলিপি প্রেরণ করা ছাড়া তাহাদের কোন ব্যবস্থা করিবারও ছিল না। এদিকে সরকার পক্ষ প্রকাশ্যে কংগ্রেসের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়। ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌ সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা ; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সহরসীমায় কংগ্রসের অধিবেশন অনুষ্ঠানে অনুমতি না দেওয়ায় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া আট মাইল দূরবর্তী এক গ্রামে অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। সরকারী বিষনজরে পড়িয়া কংগ্রেসকে এই ভাবে গ্রামাঞ্চলে অধিবেশন করিতে হয়। লর্ড কার্জনের ভারতে আসার এক বছর পরবর্তী এই ঘটনা কংগ্রেসের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া আছে।

কিন্তু কার্জন ইহাতেও খুশী হন নাই ; এইজন্ত সর্বোপায়ে কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি নাশে তাঁহার রাজদণ্ড উদ্যত হইয়া উঠে। অধিকন্তু, শাসন ব্যাপারে সর্বময় প্রভুত্ব স্থাপন এবং ভারতবাসীর পৌর অধিকার নির্বিচারে সংকোচ করিতেও তিনি কৃতসংকল্প হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সরকারী দপ্তরে শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব স্থাপন, ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মূলনীতিতে আঘাত, বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী প্রভাব বৃদ্ধি এবং সরকারী গুপ্ত খবর বেফাঁস সংক্রান্ত আইন রচনা প্রভৃতি করিতে থাকেন। সর্বোপরি তিনি বাঙলাভাষী বঙ্গ প্রদেশকে দ্বিধাবিভক্ত করিবার পরিকল্পনা করেন।

সর্বপ্রথম ১৮৯৯ সালে এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিকার হরণ ও উহাতে সরকারী প্রভাব বৃদ্ধি করেন।

ইহার ফলে কর্পোরেশনের সদস্য সংখ্যা কমিয়া ৭৫ হইতে ৫০ হয়। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ( বিশেষ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ) সেনেটে যাহাতে বেশির ভাগ সদস্য সরকারী মনোনীত হইতে পারে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন পাশ করাইয়া নেন। এই দুইটি প্রতিক্রিয়াশীল আইনের বিরুদ্ধে দেশের শিক্ষিত জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে থাকে; তাঁহারা সভয়ে লক্ষ্য করেন যে, এতদিনের আন্দোলনের ফলে যাহাও বা সামান্য কিছু অধিকার অর্জিত হইয়াছিল, কার্জন তাহাও পূর্বসংকল্পিত ও প্রণালীবদ্ধ উপায়ে সঙ্কোচ করিবার চেষ্টায় আছেন। শুধু তাহাই নহে; 'কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত' তিনি শাসকসুলভ শ্রেষ্ঠত্বাভিমানের দম্ভ দেখাইয়া ঘোষণা করেন যে ভারতবাসী উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য নহে। এইভাবে মহারাণীর ঘোষণাবাণী কার্যত অচল করিবার জন্য তিনি উঠিয়াপড়িয়া লাগেন। এদিকে ১৯০৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণে তিনি এশিয়াবাসীদিগকে অসাধুতা, কপটতা ও অনৃত ভাষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেন! তাঁহার ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতায় সমগ্র দেশ স্তম্ভিত হইয়া যায়। ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতিভূর মুখ হইতে নির্গত কটুক্তি ও নির্লজ্জ অভিভাষণ দেশবাসীর নিকট মর্মান্তিক উপহাসের মত শুনায়। কার্জনের এই একটিমাত্র রুচি-বিগর্হিত উক্তিতে তথাকথিত বৃটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির গলিত রূপ সাধারণের প্রত্যক্ষগোচর হইয়া উঠে।

কিন্তু সমগ্র জাতিকে অপমান করিয়া, তাহাদের ন্যায্য অধিকার কাড়িয়া নিয়া, সরকারী চাকরিতে প্রবেশাধিকার সঙ্কুচিত করিয়া এবং উচ্চশিক্ষা বিস্তারের পথ রুদ্ধ করিয়াও কার্জনের গায়ের জ্বালা মিটে নাই। তিনি লক্ষ্য করেন, বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত গোষ্ঠিই ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনের স্রষ্টা, মস্তিষ্ক ও অগ্রণী। কাজেই ইহাদের উপর সুবিধামত আঘাত হানিতে পারিলে এক ঢিলে দুই পাখী মরিবে—একদিকে ভারতবাসীর মধ্যে বৃটিশ

বিরোধী মনোভাব ও বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রবণতা হ্রাস পাইবে, অন্যদিকে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ফলে বাঙালীর অখণ্ড রাজনীতিক সত্তা লোপ পাইয়া তাহার প্রচেষ্টা খণ্ডিত প্রয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইবে; আর তাহাদের মধ্যে আত্ম-বিরোধের সূচনা হইবে। এমনি করিয়া Divide Et Impera বা ভেদ-সৃষ্টি করিয়া শাসন করার চিরাচরিত বৃটিশ কূটনীতি বাঙলাকে উপলক্ষ করিয়া সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। সাম্রাজ্যবাদের প্রথম অতর্কিত আঘাতে বাঙালী হতভম্ব হইয়া যায়।

১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর সরকারী তরফ হইতে বিজ্ঞাপিত হয় যে, বাঙলা দেশকে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য দুইভাগে ভাগ করা হইবে। কিন্তু বাঙলাকে খণ্ডিত করার প্রয়াসের কথা একেবারে সকলের অজ্ঞাত ছিল, এমন নয়। তবে অভিসন্ধিমূলক ব্যবচ্ছেদ করার চেষ্টা হয় নাই বলিয়া বাঙালী এতদিন তেমন উচ্চবাচ্য করে নাই। তাহা ছাড়া বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে ১৮৭৪ সালে শাসনসৌকর্যার্থ যখন আসামকে বাঙলা হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হয়, তখন সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাইবার মত দেশে জনমত সৃষ্টি হয় নাই। আসাম পৃথকীকরণের সময় বাংলা ভাষাভাষী শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে উহার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইলেও উক্ত অঞ্চলসমূহের অধিবাসীরা প্রতিবাদ জানায় নাই; পক্ষান্তরে তিনটি শস্যসমৃদ্ধ জেলা আসামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় শাসনব্যাপারে ঘাটতি পূরণ করা আসামের পক্ষে সুবিধাজনক হয়।

কিন্তু এবার যখন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত জনসমাজ প্রবল প্রতিবাদ জানান। রাজনীতি-সচেতন বাঙালী ইহার মধ্যে নবোদ্ভূত জাতীয় চেতনা খণ্ডিত করিবার প্রয়াস লক্ষ্য করে এবং বুঝিতে পারে যে, বাঙলায় সমাজদেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহাকে ভেদবিভেদে পঙ্কিল ও সংস্কৃতির দিক হইতে জীর্ণ করিয়া ফেলিবার সঙ্গোপন

চেষ্টা ইহাতে নিহিত। কাজেই রাজরোষগ্রস্ত হইলেও বাঙালী ক্ষোভে ও অপমানে গর্জিয়া উঠে; তাহার জপমন্ত্র হয়, 'ভাই ভাই একঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই।"

জবরদস্ত শাসক হইলেও কার্জন একতাবদ্ধ বাঙালীর দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া প্রমাদ গণেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সরকারী সিদ্ধান্তের বিষয় ঘোষণা করার পরই বাঙলা হইতে পূর্ববঙ্গকে ছাঁটাই পূর্বক আসামের সহিত জুড়িয়া দিয়া এক নূতন প্রদেশ গঠন করা সহজ হইবে।

এই সময় বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা সম্মিলিতভাবে একজন লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন থাকায় শাসনকার্যে তেমন শৃঙ্খলা ছিল না; একজন শাসকের পক্ষে এত বড় বিস্তৃত ভূখণ্ডের তত্ত্বাবধান করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতে থাকেন। কিন্তু ইহারই সুযোগে কার্জন যে কূটনীতির আশ্রয় নেন, তাহাতেই সমগ্র জাতি রুখিয়া দাড়ায়।

অবশ্য এই ব্যাপার উপলক্ষে যে আন্দোলনের সূচনা হয়, তাহার পটভূমি আরও বৃহত্তর ও ব্যাপকতর। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙালীর স্বভাবসুলভ ভাবপ্রবণতা এবং মননশীলতার অভিব্যক্তি মাত্রই নহে: ইহার পশ্চাতে আরও গভীরতর সামাজিক, বৈষয়িক ও নৈসর্গিক দুর্বিপাক-সঞ্জাত অন্তর্গূঢ় বেদনাও পূর্ব হইতে আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে লোকমান্য তিলকের আবির্ভাবে একটা নূতন অধ্যায়ের সুরু হয়। এই প্রভাবশালী মারাঠী ব্রাহ্মণের ঋজুদেহ, চরিত্র বল, বিদ্যাবত্তা ও মেধাই শুধু দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, হিন্দু সংস্কৃতি ও আচার বিচারের পুনরুজ্জীবনেও তিনি মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন। এইদিক হইতে তাঁহার সাবেক চালচলন ও অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা পদ্ধতি অন্যান্য ইংরেজ-অনুকারী নেতা হইতে মূলত যে পৃথকই ছিল এমন নহে, তিনি বীরপূজা ও দেবার্চনার মারফতেও জাতীয় ভাব পুনরুজ্জী-

বনের উদ্যম করেন। শিবাজী উৎসব ও গণপতি পূজার প্রবর্তন ইহার দৃষ্টান্ত। এই হেতু দেশবাসী তাঁহার মধ্যে ভারতীয়ত্বের সন্ধান পাইয়া তাঁহার প্রবর্তিত উৎসবাদিতে যোগ দিতে থাকে এবং ইহার ফলে ক্রমশ বিজাতীয় বিশেষ করিয়া ইংরেজীপনা, ইংরেজীখানা, ইংরেজী পোষাকপরিচ্ছদ, দ্রব্য ও শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতির উপরও তাহারা বীতৃষ্ণ হইয়া উঠিতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের সিংহনাদও দেশকে বহির্মুখী মনোভাব হইতে অন্তর্মুখী করিয়া তোলে। মূলত এই সময়কে ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দুয়ানী পুনরুজ্জীবনের যুগ বলা যায় এবং উহা যুগের প্রয়োজন মিটায় বলিয়াও মনে হয়।

দ্বিতীয়ত ১৮৯২ সালের ব্যবস্থাপক সভা সংক্রান্ত আইন গৃহীত হওয়ায় ভারতে যে প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, কার্জন দেশবাসীর সেই নবলব্ধ অধিকার নানারূপে ক্ষুণ্ণ করিবার ফন্দি আঁটেন; তৃতীয়ত, মধ্যবিত্ত নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বেকার সমস্যা ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিতে থাকে; এতদিন সরকারী চাকরি এবং কেরাণীগিরিতে বাঙালীর নিরঙ্কুশ পসার ও পয়সা দুই-ই ছিল; কিন্তু কিছুটা রাজনীতিক কারণে এবং কিছুটা আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় সরকারী চাকরির ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া পড়ায় এবং ওকালতী প্রভৃতি পেশায় অর্থাগম কমিতে থাকায় ক্রমশ বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধিতে থাকে; অথচ নূতন কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি না হওয়ায় বৈদেশিক শাসনকে ইহার জন্য দায়ী করা হইতে থাকে; চতুর্থত, ১৮৯৬ সালে পুনায় প্লেগ দমন কালে গবর্ণমেণ্ট নানারূপ অনাচার করে; ইহাতে হিন্দু সমাজের ধর্মীয় সংস্কার আহত হয়। এই ব্যাপারে তিলক প্রতিবাদ করায় তাঁহার ও অন্যান্য অনেকের উপর রাজরোষ নামিয়া আসে। এদিকে ১৮৯৭ সালে সমগ্র সীমান্ত প্রদেশে যখন যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকে, তখন ১৮৯৯-১৯০১ সালে বাঙলায় দীর্ঘকাল দুর্ভিক্ষের রাজত্ব চলে; দেশবাসী অন্নাভাবে ও মহামারীতে অস্থির হইয়া পড়ে।

অধিকন্তু লর্ড এলগিনের আমলে ( ১৮৯৪—৯৮ খৃঃ ) আমদানী শুল্ক পুনঃ প্রবর্তন করা হয়, আর ভারতীয় কলকারখানাজাত দ্রব্যের উপর উৎপাদন কর স্থাপন করা হয়। ইহার ফলে ল্যাঙ্কশায়ারেব প্রতিযোগিতায় নবজাত দেশীয় বস্ত্রশিল্পের টিঁকিয়া থাকাই দুষ্কর হয়। এদিকে রূপার দাম কমিয়া যাওয়ায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিব্রত হইয়া উঠে; এই হেতু ১৮৯৩ সালে ভারতীয় টাকশালে অবাধ রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত প্রথা বন্ধ করিয়া দিয়া প্রচলিত টাকার মূল্য বাড়ান হয়; কিন্তু তদনুপাতে দেশবাসীর উপার্জন ক্ষমতা মোটেই বাড়ে না। এরূপ অবস্থায়, বৈষয়িক দিকে হইতে ভারতে এক নিদারুণ বিপর্যয় দেখা দেয়। একদিকে ভারতের নবীন পুঁজিবাদী শ্রেণী, অন্যদিকে পেশা ও চাকরিজীবী ভদ্রলোক এবং জনসাধারণ সকলেই আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হয়। কাজেই সর্বাঙ্গীন পরবশ্যতা অবসানের কামনা দেশবাসীর বিশেষত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বভাবতই উগ্র হইয়া দেখা দিতে থাকে। লর্ড লিটনের মত কার্জনও দেশের দুর্গতির মধ্যে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ১৯০৩ সালে দিল্লীতে সাড়ম্বরে দরবার অনুষ্ঠান করেন। সর্বোপরি কার্জনের জাত্যাভিমান ও দম্ভ ভারতবাসীর নিকট তাঁহাকে অপ্রিয়ভাজন করিয়া তোলে এবং তিনি সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক বলিয়া গণ্য হন। এই হেতু বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদও যে তাঁহার দুরভিসন্ধিমূলক ব্যবস্থা, তাহা শিক্ষিত সমাজের বুঝিতে মোটেই বিলম্ব হয় নাই।

ধুরন্ধর কার্জন প্রথমদিকে বাঙালীর নিকট হইতে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ আশা করেন নাই; কাজেই সামলাইয়া উঠিবার জন্য তিনি কিছু সময় নিতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার ভান করিয়া তিনি পূর্ববঙ্গের নেতৃবৃন্দের সহিত সম্মিলিত বৈঠকের ব্যবস্থা করেন এবং আলাপ আলোচনা দ্বারা তাঁহাদিগকে স্বমতে আনিতে সচেষ্ট হন। বেলভেডিয়ার প্রাঙ্গনে ছোট গবর্ণর স্যর অ্যাণ্ড ফ্রেজারের সভাপতিত্বে কয়েকটি বৈঠক হয়; কিন্তু

নেতৃবৃন্দ সরকার পক্ষের যুক্তি উপলব্ধি করিতে পারেন না বলিয়া আলোচনা ফাঁসিয়া যায়।

বড়লাট ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি স্বয়ং পূর্ববঙ্গ সফরে বাহির হন। তিনি মনে করেন যে, তাঁহার ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে জনমত প্রভাবান্বিত হইবে; কিন্তু তাঁহার প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে সরকার-ঘেঁষা অনুগত ব্যক্তিরা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠেন। এই প্রসঙ্গে ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি লর্ড কার্জনের মুখের উপর তুরূপ জবাব দেন যে, তিনি বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাকে বাঙালীর অস্তিত্ব-সঙ্কট বলিয়া মনে কবেন এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি আপ্রাণ ইহার বিরোধিতা করিবেন।

বিরুদ্ধ জনমতের সম্মুখীন হওয়ায় কার্জনেরও জেদ চাপিয়া যায়—বঙ্গভঙ্গ করিতেই হইবে। এই হেতু সফরের সময়ই তিনি পূর্ব-পরিকল্পনা সংশোধন করিয়া সমগ্র উত্তর-বঙ্গ, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলাকে নবগঠিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন। পূর্ব হইতে কেহ ঘুণাক্ষরেও ইহার কথা জানিতে পারে নাই। তিনি আলাপ-আলোচনার পথে আর অগ্রসর না হইয়া বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদকে সোজা বাঙালীর উপর চাপাইয়া দিতে কৃতসংকল্প হন।

বাঙালী প্রথমটায় বিস্ময়বিমূঢ় হইলেও কর্তব্য-নির্ধারণে ত্রুটি করে নাই। ইতিকর্তব্য স্থির করবার উদ্দেশ্যে নেতৃবৃন্দ পাথুরিয়াঘাটায় মহারাজা-যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের রাজবাটীতে এক সম্মেলন করেন। উহাতে বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাইয়া বড়লাটের নিকট এই মর্মে তার পাঠাইবার কথা স্থির হয় যে, সিদ্ধান্ত পাল্টান কোনক্রমেই সম্ভব না হইলে বাংলাভাষাভাষী জনসাধারণকে যেন একটিমাত্র শাসনব্যবস্থার অধীন রাখা হয়। কিন্তু স্বৈরাচারী কার্জন-গবর্ণমেণ্ট এরূপ সঙ্গত অনুরোধেও সম্মত হয়

নাই। এহেন অবস্থায় বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যবস্থা যে রাজনীতিকে অভিসন্ধিমূলক, তাহাতে সকলে নিঃসন্দেহ হন।

শুধু প্রতিবাদ, বক্তৃতা ও আলোচনায় কোন কাজ হইবে না বলিয়া সকলেই অনুভব করেন। এবার বাঁশীর বদলে অসি, কথার বদলে কাজ, শান্তির বদলে সংগ্রামের পালা; ভারত গবর্ণমেণ্টের সংহত শক্তির বিরুদ্ধে শুধু আত্মরক্ষাত্মক ব্যবস্থাই যথেষ্ট নহে, আক্রমণাত্মক কর্মপন্থারও উদ্ভাবন করিতে হইবে। বৃটিশ সিংহের টনক নড়াইয়া দেওয়া, সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি কাঁপাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু জাতি নিরস্ত্র, অপ্রস্তুত, সম্বলহীন হইলেও আত্মিক শক্তিতে, মনোবলে উজ্জীবিত। ইহাই ছিল ঐক্যবাদী জাতির শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

প্রতিকারোপায় চিন্তায় নেতৃবৃন্দ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশন হলে বা ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্তের বাসভবনে নিত্য মিলিত হইতে থাকেন। অতঃপর বহু সলাপরামর্শে স্থির হয় যে ৭ই আগষ্ট (১৯০৫ সন) টাউন হলে এক জনসভার অনুষ্ঠান হইবে এবং উহাতেই কর্তব্য নির্ধারিত হইবে।

প্রসঙ্গত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে বাঙালীর জাতিগত মর্যাদাবোধ ফিরিয়া আসার সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠা বা স্বাধিকার অর্জনের দিকে তাহার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই উদ্দেশ্যে স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের দিকে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ব্যক্তিগতভাবে (যথা ঠাকুর পরিবারের জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্বদেশী বস্ত্র বা গামছা তৈয়ারী এবং ষ্টীমার কোম্পানী প্রতিষ্ঠা ও অর্থনাশ) কেহ কেহ যেমন স্বদেশীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন, তেমনি সমষ্টিগতভাবেও যাহাতে স্বদেশীয়ানা প্রসার লাভ করে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ১৮৬৭ সালে কলিকাতায় হিন্দু মেলায় এবং ১৮৮২-৮৩ সালে কলিকাতা শিল্প-প্রদর্শনীতে দেশীয় শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ইহা সখের ব্যাপার বা

জনকয়েকের ব্যাপার মাত্র ছিল; আদর্শকে বাস্তব রূপ দিবার মত শক্তি জাতি তখনও সঞ্চয় করিতে পারে নাই বা তেমন কোন সঙ্ঘও গড়িয়া উঠে নাই।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাহিরের সংঘাতে জর্জর বাঙালী আত্মরক্ষার তাগিদে ঘর গুছাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠে। অবশ্য পরবর্তীকালে কংগ্রেস স্বদেশীগ্রহণের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রথম সরকারীভাবে স্বদেশী শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। কিন্তু তাহাও কতকটা লোকদেখান ব্যাপার। এদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ৺সরলা দেবীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' এবং ৺সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি' (১৯০৩) স্বদেশী মন্ত্র প্রচারে ব্রতী হয়। 'ভাণ্ডার' ও 'ডন' পত্রিকার মারফৎ দেশজ শিল্পদ্রব্য ব্যবহারের জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা হইতে থাকে; আর এই সময়ই ব্যারিষ্টার ৺প্রমথনাথ মিত্রের উৎসাহে আত্মরক্ষা ও শক্তিচর্চ্চার উদ্দেশ্যে 'অনুশীলন সমিতি' গঠিত হয়। এই ভাবে বৈষয়িক অপচয় ও শোষণ হইতে দেশকে রক্ষার জন্য যেমন স্বদেশীব্রত প্রচার করা হইতে থাকে, অন্যদিকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য সঙ্ঘশক্তির চর্চায় বাঙালী আত্মনিয়োগ করে।

বাঙালীর এহেন আত্মানুশীলনের প্রথম পর্যায়ে সর্বপ্রথম বাঙলার অঙ্গচ্ছেদের কথা জানাজানি হয়; কিন্তু বাঙলাকে সত্যই দ্বিধাবিভক্ত করা হইবে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই। অবশেষে ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই ভারতসচিব বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইবার সঙ্গে দেশবাসী রুদ্ধ আক্রোশে গুমরিয়া উঠে; কিন্তু উপায় কি? প্রতিকারের পন্থা কি?

দেশবাসী আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ "'অবস্থা ও ব্যবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেন—'আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ

ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে বিন্দুমাত্র নৈরাশ্যের কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদের বিচ্ছিন্ন করিবে, একথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিব না। * * * আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। * * * জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একই মাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।' এদিকে চীনে মার্কিন দ্রব্য বয়কটের সাফল্য দেখিয়া 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই (১৩১২ সনের ৪ঠা শ্রাবণ) বিদেশী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করেন; প্রস্তাবটি নেতৃবৃন্দের মনঃপূত হয়। এমনি একটি ব্যবস্থাই তখন একান্ত প্রয়োজন ছিল।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় আন্দোলন যখন নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হইতে না পারিয়া পথের সন্ধান করিতে থাকে, তখন মফঃস্বলবাসীরাই ইহাতে অগ্রণী হইয়া প্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত করে। বাগেরহাটবাসীরা ১৭ই জুলাই এবং মাগুরাবাসীরা ২৩শে জুলাই স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে ২৩শে জুলাই কলিকাতার ছাত্র সমাজও স্বদেশী গ্রহণের সংকল্প করে; আবার ঐদিনই পাবনায় বিদেশী চিনি ও বস্ত্র বর্জনের সিদ্ধান্ত হয়। নির্দিষ্ট কার্যক্রমের সন্ধান পাইয়া এবং পুঞ্জীভূত বেদনা ও রুদ্ধ বিক্ষোভের আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করিয়া দেশবাসী পূর্ণ উদ্যমে কর্মের উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

সাহিত্য, শিল্প ও রাজনীতির মরাগাঙে ভাব ও কর্মের জোয়ার আসিয়া জাতীয় জীবনের দুকূল ছাপাইয়া ফেলে। কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে ও ব্রত কথায় বাঙালীর মর্মকথা ব্যক্ত হইতে থাকে; রবীন্দ্রনাথ, কান্তকবি রজনী কান্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কবিতা ও গানে, বিপিনচন্দ্র পাল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অক্ষয় মৈত্রেয়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি দেশাত্মবোধক প্রবন্ধে, রাজকুমার বানার্জি, হেম সেন ও কানাই গোস্বামী প্রমুখ স্বদেশী সঙ্গীতে,

সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, অশ্বিনীকুমার দত্ত ও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি বক্তৃতায় দেশবাসীকে অভীঃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে থাকেন। এদিকে মফঃস্বলের সহর ও পল্লীতে চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। কৃষ্ণনগরে তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্ত, ঢাকায় আনন্দমোহন রায়, ময়মনসিংহে অনাথবন্ধু গুহ, চট্টগ্রামে যাত্রামোহন সেনগুপ্ত, কুমিল্লায় হরদয়াল নাগ; মালদহে বিপিন চন্দ্র ঘোষ, ফরিদপুরে অম্বিকাচরণ মজুমদার, বহরমপুরের বৈকুণ্ঠ সেন প্রমুখ বিশিষ্ট জননায়ক স্বদেশী প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন।

স্বদেশী বার্তার প্রচার শুধু ফাঁকা কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই; দেশ যাহাতে আর্থিক দিক হইতে স্বয়ম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর হইয়া উঠিতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটিতে থাকে। ইহার জন্য অর্থ ও পৃষ্ঠপোষকতার আদৌ অভাব হয় নাই। ব্যবসায়ে যে অনভিজ্ঞতার ফাঁকি ছিল, তাহা অধ্যবসায়, উদ্যম ও আন্তরিকতার গুণে পূরণ করিয়া নেওয়া হয়। বিদেশী বর্জনের দৃঢ় সংকল্প রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং ইংল্যণ্ডের বৈষয়িক প্রভাব হইতে আত্মরক্ষাকল্পে বাঙালী মরণপণ প্রতিজ্ঞা করে; সাবান ও দিয়াশলাই-এর কারখানা, কাপড়ের কল ( বঙ্গলক্ষী কটন মিল্‌স ), ব্যাঙ্ক ( বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ), বীমাকোম্পানী ( হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ কোং ) প্রভৃতি স্থাপিত হয়। কিন্তু নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প ও স্বদেশী দ্রব্য দেশবাসীর অভাব সামান্যমাত্র মিটাইতে পারলেও এবং তাহা বিদেশী দ্রব্যের তুলনায় অপকৃষ্ট হইলেও সাদরে গৃহীত হয়। পক্ষান্তরে ল্যাঙ্কশায়ারের প্রতিযোগিতায় বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্প স্বদেশীকে উপলক্ষ করিয়াই আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার সুযোগ পায়।

দেশের এহেন পরিস্থিতির মধ্যে ৭ই অক্টোবর ইতিকর্তব্য নির্ধারণের

উদ্দেশ্যে কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে টাউনহলে এক জনসভা আহূত হয়; উহাতে বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া অতি সতর্কতার সহিত বিলাতীবর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সম্পর্কে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কাহাকেও রুষ্ট বা বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন না করিয়া এবং এমনকি ভারত-প্রবাসী ইংরেজ হিতৈষীদের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রস্তাব রচিত হয়। তৎকালে 'স্টেট্সম্যান' ও 'ইংলিশম্যান' প্রথমদিকে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া দেশবাসীর আন্দোলন সমর্থন করে।

প্রস্তাবে বলা হয় যে, বঙ্গ-ভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত বিলাতী বয়কট চলিবে। অর্থাৎ প্রস্তাবটি সাময়িক সর্তসাপেক্ষ। ইহাতে বাঙালীর আত্মরক্ষামূলক মনোভাবই বেশিমাত্রায় প্রকট।

কেননা মৌখিক প্রতিবাদ ও আবেদন নিবেদন যেখানে নিষ্ফল, সেখানে বণিকজাতি ইংরেজের স্বার্থে আঘাত হানিয়া তাহাকে পরাধীন জাতির মর্ম-বেদনার প্রতি সচেতন করিয়া তোলার জন্যই ঐ চরম পন্থা অনুসরণ করা হয়। স্বদেশী গ্রহণ বা বয়কট দ্বিধার অস্ত্র হিসাবে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রথম বার সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করা হয়; ইহাই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বাঙালী প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

আন্দোলনে যখন কমবেশি গোটা হিন্দুসমাজ এবং তাহাদের স্বাভাবিক নেতা হিসাবে জমিদার, উকিল ও ব্যারিষ্টার শ্রেণী যোগ দেন তখন সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানরাও নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। প্রতিষ্ঠাবান ব্যারিষ্টার আব্দুল রসুল ও লিয়াকৎ হোসেন, আব্দুল হালিম গজনভী, বগুড়ার জমিদার আব্দুস শোভান চৌধুরী, ঢাকার নবাব বংশীয় খাজা আতিকুল্লা প্রমুখ মুসলমান নেতা আন্দোলনে শক্তি-সঞ্চার করেন। এদিকে দেশীয় খৃষ্টান এবং নারী সমাজও চঞ্চল হইয়া উঠে। কলিকাতা, নদীয়া, জলপাইগুড়ি ও

ময়মনসিংহে অভিজাত নারীমহলে সাড়া পড়িয়া যায়। ময়মনসিংহ, কাশীম-বাজার, নাটোর, উত্তরপাড়া, টাকী, শ্যামপুকুর (উত্তর কলিকাতা) প্রভৃতির বনিয়াদী শ্রেণীর জমিদারগণও আগাইয়া আসেন।

কিন্তু স্বদেশী যুগে সর্বপ্রথম যে সংববদ্ধ ছাত্র জাগরণ হয়, তাহা অন্যান্য সকলকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া চলে। ছাত্রসমাজই হইয়া উঠে আন্দোলনের মুখ্য ধারক ও বাহক; তাহারাই ইহাতে উদ্দাম গতিবেগ ও প্রেরণার সঞ্চার করে; উহার ফলে আন্দোলনের গতি নরমপন্থা হইতে ক্রমশ চরমপন্থা ও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের দিকে গতি নেয়। যে-কংগ্রেসী আন্দোলন এতদিন শুধু জনকয়েক শিক্ষিত ব্যক্তি ও পেশাদার রাজনীতিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যুবশক্তির যোগদানে তাহার সীমা প্রসারিত হইয়া দেশের সুদূর পল্লীতে পর্যন্ত স্বদেশীর বার্তা প্রচার হইতে থাকে। এমনি করিয়া প্রধানত ছাত্রসমাজের মারফৎ আন্দোলন দেশব্যাপী হয়।

তাহারা বিপুল উৎসাহে বিলাতী বর্জন মন্ত্র প্রচারে লাগিয়া যায়; এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার নানাস্থানে স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপিত হইতে থাকে; মফঃস্বলেও অনুরূপ প্রচেষ্টা শুরু হয়। কলিকাতায় একদল যুবক কান্ত কবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই,'—গাহিতে গাহিতে মাথায় মোট নিয়া দ্বারে দ্বারে স্বদেশী দ্রব্য ফেরি করিতে থাকে।

এদিকে ৬ই আগষ্টের পর হইতে মফঃস্বলের ছাত্রদের মধ্যেও নবজীবনের সাড়া পড়ে। ১৩ই অক্টোবর ঢাকায়, আব্দুল ইউসুফ হাই-এর নেতৃত্বে টাঙ্গাইলে এবং বহরমপুরে ছাত্ররা স্বদেশী প্রচার করিতে থাকে। পক্ষান্তরে কলিকাতায় ছাত্ররা বড়বাজার অঞ্চলের বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং সুরু করে। ইতিপূর্বে এই অস্ত্র আর প্রয়োগ করা হয় নাই। ইহার ফলে পুলিশের সহিত ছাত্রদের সংঘর্ষ বাধে এবং কয়েকজন ছাত্র গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু নেতৃবর্গের সালিশী ব্যবস্থায় একটা সাময়িক মিটমাট হয়।

বয়কটের সাফল্যে গবর্ণমেণ্ট বিলাতী ব্যবসায়ের স্বার্থহানি হওয়ায় আঁৎকাইয়া উঠে। তাহারা দিশাহীন হইয়া পাল্টা আক্রমণ সুরু করে। এই ভাবে ব্যাপক ছাত্রদলন আরম্ভ হয়।

যে সব ছাত্র বড়বাজারের ব্যাপারে লিপ্ত ছিল বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহাদিগকে বিতাড়নের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষায়তনের কর্তৃপক্ষের নিকট সরকারী নির্দেশ পাঠান হয়।

সরকার ইহাতেও ক্ষান্ত হয় নাই। সর্বোপায়ে নবজাত ছাত্র আন্দোলনকে দমন করিতেই হইবে—এই মনোভাব লইয়া বাঙলা সরকারের তরফে তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের কর্তা কার্লাইল সাহেব স্কুলকলেজের কর্তাদিগের নিকট এক হুকুমনামা জারী করেন। উহাতে ছাত্রদের রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া বলা হয় যে, রাজনীতি হইতে ছাত্রদের নিবৃত্ত করা না গেলে শিক্ষায়তনের সরকারী সাহায্য বন্ধ হইবে এবং ছাত্ররা বৃত্তিলাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আর আন্দোলনে যোগদানকারী অবাধ্য ছাত্রদের নামধাম সংশ্লিষ্ট বিদ্যায়তনের কর্তৃপক্ষকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবে। পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের পক্ষ হইতেও কার্লাইল-সার্কুলারের অনুরূপ নির্দেশনামা জারী করা হয়; অধিকন্তু, 'বন্দে-মাতরম'-ধ্বনিতে শংকিত হইয়া তাহারা 'বন্দে-মাতরম সার্কুলার' প্রচার করে।

নেতৃবৃন্দ বুঝিতে পারেন যে, আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিবার জন্যই কার্লাইল-সার্কুলারের উদ্ভব; কাজেই ইহার প্রতিবিধানকল্পে ২৭শে অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। ইহাতে ছাত্রদের তরফ হইতে ঘোষিত হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইলেও স্বদেশী ব্রত ত্যাগ করা হইবে না। এদিকে নভেম্বর মাসের প্রথমদিকে সংবাদ আসে, আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে রংপুরের ছাত্রদের অর্থদণ্ড হইয়াছে;

তাহারা জরিমানা দিতে অস্বীকার করায় তাহাদিগকে বহিষ্কার করা হয়; কাজেই ইহার বিরুদ্ধে কলিকাতায় ছাত্রসমাজ প্রতিবাদ জানায়। অধিকন্তু, ছাত্রদলন নিরোধকল্পে ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের নেতৃত্বে এবং ৺শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর সম্পাদকতায় 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি' (Anti-Circular Society) স্থাপিত হয়।

সরকার পক্ষও মারমুখী হইয়া উঠে; মফঃস্বলে ছাত্রদলনের ধূম পড়িয়া যায়। নানা ছলে ছাত্রদের প্রতি কঠোর দণ্ডের বিহিত হইতে থাকে; নূতন প্রদেশের শাসনকর্তা স্যর ব্যামফিল্ড ফুলারকে অসম্মান করার কাল্পনিক অভিযোগে (১৩১২ সালের ২৩শে কাতিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়) মাদারীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছাত্রদের প্রকাশ্য বেত্রাঘাতের আদেশ দেয়।

অবস্থা সহের সীমা অতিক্রম করার মত হইলে নেতৃবৃন্দ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতে থাকেন। তাঁহারা উপলব্ধি করেন, সরকারী প্রভাব ও গণ্ডীমুক্ত বেসরকারী স্বয়ম্পূর্ণ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ২৩শে কার্তিক পান্তির মাঠে * এক সভা হয়; উহাতে জাতীয় শিক্ষার জন্য সুবোধচন্দ্র মল্লিক একলক্ষ টাকা দেন; তাঁহার অর্থে রংপুর টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিট্যুট স্থাপিত হয়; কৃতি ছাত্ররা নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা ত্যাগ করিয়া উহাতে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। ইহার পর ২৪শে কার্তিক ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী ৫ লক্ষ টাকা দান করেন। তাহা ছাড়া, আরও অনেকের দানে শিক্ষাভাণ্ডার পুষ্ট হয়।

আমলাতন্ত্রের সহিত সংঘর্ষে যে নূতন আত্মশক্তির উদ্ভব হয়, প্রধানত তাহাকেই মূলধন করিয়া ৩০শে কাতিক নেতৃবৃন্দ জাতীয় বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ শিক্ষা প্রণালীর মারফৎ

---

* পান্তির মাঠে অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ হষ্টেল অবস্থিত।

বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও তত্ত্বমূলক শিক্ষাদানের জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ (National Council of Education) গঠিত হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বরোদার রাজকার্য ত্যাগ করিয়া উহার অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করেন এবং বাঙলার রাজনীতিতে তিনি পরিপূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। এতদিনের বৈদেশিক আদর্শপুষ্ট রাজনীতিক কর্মধারার মধ্যে তিনিই প্রধানত নূতন দর্শন ও তত্ত্বের আমদানী করিয়া জাতীয় ভাবধারা পুষ্ট করিয়া তোলেন। এদিকে কলিকাতার অনুকরণে মফঃস্বলেও জাতীয় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে; নানাস্থানে জাতীয় বিদ্যালয়ের শাখাপ্রশাখাও বিস্তৃত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতার অভাবে ইহাদের অধিকাংশেরই অস্তিত্ব লোপ পায়; স্বদেশীর গৌরবস্থল হিসাবে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আজও সাক্ষী রহিয়াছে।

ক্রমশ স্বাদেশিকতা দেশের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; শুধু আহারে বিহারে, শিক্ষাদীক্ষা ও পোষাক পরিচ্ছদেই নহে,—দৈনন্দিন ঘরকন্না, সামাজিক আচারবিচার ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে পর্যন্ত ইহার প্রসার হয়। নূতনধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির ধর্মোন্মাদনার মত সমগ্র বাঙালী জাতি স্বদেশী যজ্ঞে আত্মাহুতি দেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বদেশীয়ানা মূলত এক সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়।

দেখিতে দেখিতে ১৮ই অক্টোবর বা ৩০শে আশ্বিন আসিয়া পড়ে। ঐদিন বাঙলায় দ্বিখণ্ডিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার কথা; কাজেই বাঙালীর পক্ষে উহা শোকের দিন;—আবার উহা আত্মশক্তি উদ্বোধন দিবসও বটে।

ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এক কার্যক্রম স্থির করা হয়; খণ্ডনের দিন যাহাতে বাঙলার অখণ্ড সত্ত্বা পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করা যায়, এরূপভাবে নিম্নোক্ত পঞ্চবিধ অনুশাসন প্রচারিত হয় যথা রাখিবন্ধন, অরন্ধন, প্রতিবাদ

সভা, জাতীয় ধনভাণ্ডার ও মিলন মন্দির স্থাপন। এই সম্পর্কে এদিকে সরকার-শাসিত কর্পোরেশনের পার্কে সভানুষ্ঠান করিতে দেওয়া হইবে না অনুমান করিয়া নেতৃবৃন্দ সভানুষ্ঠানের জন্য নিজস্ব সভাগৃহের অভাব বোধ করেন এবং এই হেতু অখণ্ড বঙ্গ-ভবন বা ফেডারেশন হল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন।

প্রত্যূষ হইতে দলে দলে লোক 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া এবং 'এক দেশ এক প্রাণ, এক জাতি এক ভগবান'—খচিত পতাকা লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইতে থাকে : স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে সংকীর্তন দল রাস্তা প্রদক্ষিণ আরম্ভ করে ; মিলনের চিহ্ন হিসাবে পরস্পর পরস্পরের হাতে রাখি বাঁধিতে থাকে। স্নানের ঘাট পুণ্যার্থী নরনারীর বিপুল সমাবেশে তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। ফিরিবার সময় 'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই' এবং 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি গাহিতে গাহিতে সকলে পূর্ব হইতে ঘোষিত বিডন স্কোয়ারের জনসভার দিকে অগ্রসর হয়।

ঐদিন ব্যাপক ও অভূতপূর্ব হরতাল পালিত হয় ; সহরতলীর মজুররা পর্যন্ত কাজে যায় না।

এদিকে সায়াহ্ন সাড়ে তিনটায় ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা ; সভায় উপস্থিত রোগশয্যাশায়িত আনন্দমোহনের স্বাক্ষরযুক্ত মুক্ত-বঙ্গের শীলমোহরাঙ্কিত এক ঘোষণাপত্র সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজীতে এবং রবীন্দ্রনাথ বাংলায় সমবেত ৫০ হাজার লোকের নিকট পাঠ করেন ; পক্ষান্তরে বেলা ৫টায় বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় জাতীয় ধনভাণ্ডারে ৭০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয় এবং মফঃস্বলে প্রচারের ব্যয়নির্বাহার্থ 'অ্যান্টিপার্টিশন ফাণ্ড' বা 'বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিরোধী তহবিল' স্থাপিত হয়। এই ধনভাণ্ডারের পুষ্টিকল্পে হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবর্গের যুক্ত-স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র প্রচারিত হয়। ইতিমধ্যে ১৬ই

অক্টোবর মিলনমন্দির স্থাপনকালে যে সংকল্পবাক্য পঠিত হয়, তাহা ১লা নভেম্বর মফঃস্বলে পাঠের ব্যবস্থা হয়।

বাঙলার এমনিতর রাজনীতিক দুর্দৈবের মধ্যে ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে কাশীতে গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের গতিবেগ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৃহত্তর রাজনীতিতেও দোলা দেয়; সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাঙলা একাধারে আমলাতন্ত্রের বলি এবং মুক্তি-সংগ্রামের পথপ্রদর্শক হইয়া উঠে। ভারতীয় রাজনীতি আঞ্চলিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া বিবর্তনের ও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের পথে চলিতে আরম্ভ করে। বাঙলাকে উপলক্ষ করিয়াই পরাধীন ভারতের রাজনীতি উগ্র ও সংঘর্ষমূলক কর্মপন্থার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে; ইহার মধ্য দিয়া নেতা ও নেতৃত্বের পরীক্ষা সুরু হয়।

তখন পর্যন্ত কংগ্রেসী আন্দোলনের কোন নির্দিষ্ট কার্যক্রম স্থির হয় নাই।

কিন্তু কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বাঙলা ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতে অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও সাড়া পায় নাই; শুধু মধ্যপ্রদেশ, খোদ মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব বাঙলার সংগ্রামকে সমর্থন করে; পক্ষান্তরে অপর কয়টি প্রদেশ বাঙলার ভাগ্যের সহিত নিজেদের অদৃষ্টকে জড়িত করিতে দ্বিধা করে; অবশ্য নেতাদের নিয়মতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং উগ্র কর্মপন্থার প্রতি স্বাভাবিক বিতৃষ্ণার ফলেই কংগ্রেস বাঙলার অপমান ও বেদনাকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে অক্ষম হয়। এই হেতু আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করিবার এবং বৃটিশ কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসে বিলাতী বর্জনের যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, তাহা পরিত্যক্ত হয়; উহাতে শুধু স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারমূলক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। কংগ্রেসের সেদিনের সেই সতর্ক পদক্ষেপ নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডী অতিক্রম না করিয়া মাত্র আত্মরক্ষাত্মক

ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেই সন্ধিক্ষণে কংগ্রেস যুগপৎ আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সংগ্রাম আরম্ভ করিতে পারে নাই ; কতকটা খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং কতকটা রাজনীতিক চেতনালব্ধ অখণ্ড জাতীয়তাবোধের অভাবই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়।

যাহাই হউক, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ ও ব্রহ্ম-বান্ধব চালিত বাঙালী তরুণ দল কংগ্রেসের এই দোলায়মান মনোভাবে যারপরনাই বিক্ষুব্ধ হন ; শুধু বহির্বঙ্গের মারাঠি তিলক, মধ্যপ্রদেশের মারাঠি মুঞ্জে এবং পাঞ্জাবকুলতিলক লালা লাজপৎ রায় বাঙলা তথা কংগ্রেসের তীব্র জাতীয়তাবোধ ও নূতন ভাবধারার সমর্থন করেন এবং উহাতে সহানুভূতি দেখান। বাঙলার এই দুর্দিনের বান্ধবদের সহিত স্বভাবতই বাঙালী তরুণের ঘনিষ্ট আত্মীয়তার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে প্রবীণ সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নরমপন্থী জাতীয়দলের নেতৃবৃন্দ শুধু বয়কটরূপ মহাস্ত্রকে তরণী করিয়া ঝঞ্চাক্ষুব্ধ জাতীয় সমুদ্র উৎরাইবার উদ্দেশ্যে শাসকদের সহিত আপোষরফার পথে অগ্রসর হন। এইখানেই আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ তরুণ এবং রফাপন্থী পুরাতনের মধ্যে আদর্শ ও কর্মগত বিরোধ স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং সুরাটে ইহার চরম পরিণতি ঘটে।

ভারতীয় রাজনীতিতে এই দুই দলের মধ্যবর্তী আর একদলের আবির্ভাব হয় ; ইহারা অস্ত্রবলে বিশ্বাসী সাগ্নিক বিপ্লবী দল। ১৮৯৪ সালে পুনায় সর্বপ্রথম ইহাদের দল বা সংগঠনের সূচনা দেখা যায়। ঐ সময় চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয় তরুণ সঙ্ঘ নামে এক সঙ্ঘ স্থাপন করেন। উহার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল দেশসেবার জন্য যুবকদের দেহমন গঠন করা। এই উদ্দেশ্যে সভ্যদের মধ্যে শিবাজীর কীর্তিকলাপ আলোচিত হইতে থাকে। তিলক ইহাতে উৎসাহ যোগাইতে থাকেন এবং সঙ্ঘের উদ্যোগে ১৮৯৭ সালে শিবাজী উৎসব পালিত হয়। এই সঙ্ঘের সদস্যরাই সর্বপ্রথম যে সন্ত্রাসবাদী পন্থা অবলম্বন করে তাহাই বাঙলার সন্ত্রাসবাদে চরম পরিণতি লাভ করে।

আপোষরফা বা নরমপন্থা, গলাবাজি বা মৌখিক ভীতিপ্রদর্শন ইহাদের আস্থা লাভ করিতে পারে নাই। পরবর্তীকালে এই দলের মধ্যে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল, শ্রমজীবী সম্প্রদায় ও ছাত্রভাণ্ডার প্রভৃতির সহিত সম্পর্কিত যুবকবৃন্দ বিপ্লব আন্দোলনে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেন। এই যুবসম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বা কর্মপন্থা পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটাইতে সহায়তা করে।

এমনি করিয়া তিনটি ভাবাদর্শ ও কর্মধারা স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া আবর্তিত ও রূপান্তরিত হইতে থাকে। শুধু তাহাই নহে; নেতৃবৃন্দ আবার দেশবাসীকে নিজ নিজ মতানুবর্তী করিবার উদ্দেশ্যে দলীয় সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বিপিনচন্দ্রের সম্পাদকতায় নবীনদলের 'বন্দেমাতম', ব্রহ্ম-বান্ধব সম্পাদিত বিপ্লবীদলের 'সন্ধ্যা' এবং ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের সম্পাদিত 'যুগান্তর' দেশে চাঞ্চল্যের পর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে থাকে। আর সুরেন্দ্রনাথের নরম-পন্থী 'বেঙ্গলী'ত পূর্বাপর দলীয় ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই চলে।

এইরূপে দেশব্যাপী সঙ্কটের মধ্যে যখন আদর্শ ও কর্ম সম্পর্কিত দলগত মতদ্বৈধ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, তখন দেশবাসীও কিছুটা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে; অবশ্য ইহা সত্ত্বেও স্বাদেশিকতার দ্রুত প্রসার হইতে থাকে। পক্ষান্তরে একদিকে দেশনেতাদের মত ও পথের পার্থক্যে এবং অন্যদিকে সরকারী দমননীতির দরুণ আন্দোলন কিছুটা শিথিল হইয়া আসে। এ অবস্থায় বাঙালীর মনোবল যাহাতে আরও কমিয়া যায় এবং ঐক্যবদ্ধ প্রেরণার অভাব ঘটে তদুদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিলাতী মন্ত্রিসভার তরফ হইতে ঘোষিত হয় যে, আন্দোলনের গতি মন্দ হইয়া আসিতেছে, উহাতে ভাটা পড়িতেছে। এই ঘোষণা একাধারে দেশবাসীর প্রতি সঙ্ঘর্ষের আহ্বান এবং কর্তব্য নির্ধারণের ইঙ্গিত বলিয়া বিবেচিত হয়।

কিন্তু ইহার সমুচিত জবাব কি?

দেশবাসী বৃটিশ মন্ত্রিসভার এই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করিয়া নবোদ্যমে আন্দোলনে ব্রতী হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতার গোলদীঘিতে প্রকাশ্যে এক বিরাট বিলাতী বস্ত্রযজ্ঞ হয়; উহার পরদিন বিডন উদ্যানে এবং তার'পর ৪ঠা মার্চ পুনরায় একই সময় প্রতিবাদ সভা এবং বহ্ন্যুৎসব নিষ্পন্ন হয়। এমনিভাবে হয়ত বা যেআন্দোলন আপনা হইতেই প্রেরণা ও উৎসাহের অভাবে স্তব্ধ হইয়া যাইতে পারিত, তাহাই আমলাতন্ত্রী স্পর্ধায় পুনরায় জিয়াইয়া উঠে।

শুধু তাহাই নহে; আন্দোলনের গতিবেগ উত্তরোত্তর তীব্র ও বর্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে নেতৃবৃন্দ উহাকে ব্যাপকতর করিবার প্রয়াস করিতে থাকেন। এই হেতু পূর্ববঙ্গে এবং বিশেষ করিয়া বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। দেশনায়ক আব্দুল রসুলের সভাপতিত্বে ১৪ই এপ্রিল সম্মেলন হইবে বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু এ সময় পূর্ববঙ্গে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া তাহা অমান্যের সিদ্ধান্ত হয়। এই সম্পর্কে বরিশালের রাজার হাভেলি হইতে এক শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং উহা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি সহকারে সম্মেলন মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইয়া যায়। সরকার প্রচুর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করে এবং পুলিশ ও গুর্খা বাহিনী আমদানী হয়। নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের দীর্ঘ শোভাযাত্রার প্রথমাংশ নির্বিবাদে অতিক্রম করিলেও 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির' সদস্য ও অন্যান্য যুবক লইয়া গঠিত অংশের উপর নির্মমভাবে লাঠিপ্রহার চলে। ইহার ফলে চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা ও অপর কয়টি যুবকের প্রাণসংশয় হয়। এদিকে সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হন এবং তাঁহাকে আদালত অবমাননার দায়ে দুইশত টাকা এবং নিষিদ্ধ 'বন্দে মাতরম' উচ্চারণ করায় ও লাইসেন্সহীন শোভাযাত্রা বাহির করার দরুণ আরও দুইশত টাকা জরিমানা করা হয়। পরদিনের অধিবেশনে পুলিশ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি না করার প্রতিশ্রুতি

চাহিলে সভাপতি রসুল সাহেব অসম্মত হন। ইহাতে হতমান পুলিশ ১৪৪ ধারা জারী করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দেয়; কিন্তু সম্মেলনের প্রতিনিধিরা রাজপথে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে আকাশবাতাস কাঁপাইয়া তোলেন; 'বন্দে মাতরম্'-এর শক্তি ও আন্দোলনের প্রচণ্ডতা দেখিয়া পুলিশও আর ইহার বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে সাহসী হয় না।

এমনি করিয়া রাজরোষ ও নির্যাতনের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে বিশুদ্ধ হইয়া 'বন্দে মাতরম' জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে রণহুঙ্কারের মর্যাদায় আসীন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃমন্ত্র ভারতের উত্তর সাধকদের কণ্ঠে ও কর্মে অমরত্ব লাভ করে।

বঙ্গ-ভঙ্গের দরুণ যে বিক্ষোভের অভিব্যক্তি দেখা যায় বরিশালে গুর্খা অত্যাচার ও জুলুমে তাহা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে এবং এই হেতু বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান হইতে থাকে। ইহা সত্ত্বেও প্রাচীনপন্থী নেতৃবৃন্দ এক আবেদন নিবেদন ছাড়া জুলুমের বিরুদ্ধে অন্য কোন সক্রিয় পথের সন্ধান দিতে পারেন না। এই-হেতু নূতনপন্থী তরুণ দল উঁহাদের নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়েন; আবেদন নিবেদনের পরিবর্তে তাঁহারা শক্তি-সাধনে ও প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধ পরিকর হন; এইরূপে তাঁহারা সশস্ত্র বৈপ্লবিক কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে থাকেন।

১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতিত্ব লইয়া উভয় দলের মত-বিরোধ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে। উভয় দলই স্ব স্ব মনোনীত ব্যক্তিকে সভাপতি করিতে মনস্থ করে; তরুণ দলের প্রতিনিধি বিপিনচন্দ্র, উপাধ্যায়, সখারাম গনেশ দেউস্কর প্রমুখ চাহেন, তিলক সভাপতি হউন। কিন্তু সুরেন্দ্র-নাথ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি নরম দলের নেতৃবৃন্দ ইহাতে আপত্তি করেন; তাঁহারা তিলকের চরমপন্থী মতামতের জন্য তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না; অথচ

তাঁহাদের নিজেদের ভিতর হইতে এমন একজনকেও সভাপতি পদের জন্য দাঁড়া করাইতে পারেন না, যিনি তিলকের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচিত হইতে পারেন। এই হেতু তাঁহারা প্রগতিপন্থী দাদাভাই নৌরজীকে বিলাত হইতে আনাইয়া কংগ্রেসের সভাপতি করেন। সভাপতি নির্বাচনে প্রবীন দলের মনোভাবে যে পরিবর্তন দেখা যায়, তাহা দেশের ক্রমবর্ধমান বামপন্থী মনোভাবেরই প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু নির্বাচিত সভাপতিও দেশের বৈপ্লবিক মনোভাব দ্বারা সংক্রামিত হন; তিনিও দেশের পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া রাষ্ট্রপতির আসন হইতে দেশবাসীকে আত্মশক্তির বাণী শোনান, বলেন—'স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার।' এইভাবে প্রাচীনপন্থী নেতাগণ প্রগতি ও বিপ্লব-বিরোধী মনোভাব পোষণ ও ব্যবস্থা করিলেও তাহা প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে উজান বাহিবার চেষ্টার মতই ব্যর্থ হইয়া যায়।

কিন্তু গবর্ণমেণ্টও দেশবাসীর মনোভাব আর উপেক্ষা করিতে সাহস করে না। তবে নরমপন্থা এবং উগ্রপন্থার মধ্যে নীতি ও কর্মগত বিভেদের সুযোগ লইয়া তাহারাও পুনরায় তৎপর হইয়া উঠে; প্রকাশ্য রাজনীতিক আন্দোলন ও ও আলোচনা বন্ধের উদ্দেশ্যে ১৯০৭ সালের ১লা নভেম্বর রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতাদমন আইন বিধিবদ্ধ হয়। উপরন্তু তাহাদের দৃষ্টিতে যাঁহারা বিপজ্জনক ও সরকারদ্বেষী বলিয়া বিবেচিত হয় তাঁহাদের বিরুদ্ধে পুরাদমে দমননীতির ষ্টীমরোলার চালান হইতে থাকে। পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় এবং সর্দার অজিত সিংহ বিনাবিচারে বন্দী হন। *

---

* বাঙলায় যেমন বঙ্গ-ভঙ্গকে উপলক্ষ করিয়া বিপ্লব আন্দোলন গড়িয়া উঠে, তেমনি পাঞ্জাবেও 'চেনাব ক্যানাল' আন্দোলনকে ঘিরিয়া বৈপ্লবিক তৎপরতার প্রসার ঘটে। উহার নেতা ছিলেন লালা লাজপৎ রায় ও সর্দার অজিত সিংহ।

এদিকে বাঙলায় উভয় দলের মূলগত প্রভেদ দলীয় সংবাদপত্রের মারফৎ সকলের নিকট স্পষ্টতর হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্টও চরমপন্থীদের যেকোন রূপে দণ্ডদানের জন্য প্রস্তুত হয়। 'যুগান্তর'-এর সম্পাদক ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৬ সালের ২০শে জুলাই এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন; 'বন্দে-মাতরম'-এর সম্পাদক অরবিন্দ অভিযুক্ত হইয়াও মুক্তি পান; কিন্তু বিপিনচন্দ্র উক্ত মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় তাঁহার ৬ মাস সশ্রম কারাবাস হয়; পক্ষান্তরে ১৯০৭ সালের শেষভাগে 'সন্ধ্যার' সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়' নামক প্রবন্ধের জন্য অভিযুক্ত হন। আদালতে লিখিত জবানবন্দীতে তিনি সগর্বে ঘোষণা করেন—'বিধাতৃ-নির্দিষ্ট স্বরাজ-লাভের প্রচেষ্টায় আমি যে ক্ষুদ্র অংশ গ্রহণ করিয়াছি, তজ্জন্য আমি কোন বিদেশী গবর্ণমেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে প্রস্তুত নই।' অধিকন্তু সমগ্র বৃটিশ বিচারব্যবস্থাকে প্রহসন হিসাবে গণ্য করিয়া তিনি আদালতে বরবেশে আসিতেন ও উহাতে কোন অংশ গ্রহণ করিতেন না। এদিকে মামলার প্রারম্ভে তিনি বলেন,—'ফিরিঙ্গীরাজ আমাকে জেলে দেয়, সাধ্য কি!' সত্যই এই সর্বপ্রথম অসহযোগীর মামলা চলার সময়ে অন্ত্রে অস্ত্রোপচারের ফলে মৃত্যু হয়। এইরূপ জনকয়েক অসমসাহসী ব্যক্তি কর্তৃক বৃটিশ শাসনব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া চলায় এবং কারাবাস বরণ করায় সমগ্র দেশ বিদ্যুৎপৃষ্টের মত বিস্ময়ে চমকিয়া উঠে। এই হেতু তাঁহাদের কার্যকলাপের প্রতি স্বতই দেশবাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া পড়ে।

এমনিভাবে চরমপন্থী দল আপনা হইতেই শুধু যে আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া পড়ে তাহাই নহে, গঠনমূলক কাজেও তাঁহারা নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেন। তাঁহারা উপলব্ধি করেন যে, দেশবাসীর সহিত কর্মের যোগ স্থাপিত না হইলে অন্তরের যোগও প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এই হেতু ১৯০৮ সালে কলিকাতায় অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষে তরুণদল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন

করেন ও অভূতপূর্ব শৃঙ্খলার সহিত সেবাকার্য চালাইয়া অনন্যসাধারণ সংগঠন প্রতিভার পরিচয় দেন। ইঁহাদের সেবা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সংগঠন-দক্ষতার গুণে দেশবাসী ইঁহাদের' অনুরাগী হইয়া পড়ে। সামাজিক দিক হইতে স্বদেশিকতার মূল্য যাচাই করিয়া এবং সংগঠনের মারফৎ দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করিয়া ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়া তরুণ সম্প্রদায় নবোদ্যমে দেশসেবায় প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু বিরুদ্ধপন্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজনীতিক কলকোলাহল উগ্র হইবার সঙ্গে আন্দোলনের শক্তিও হ্রাস হইতে থাকে; সময়াতিপাতের সহিত উহার গতিবেগও কিছুটা শ্লথ হইয়া পড়ে। অবশ্য চরমপন্থী দল নৈরাশ্যকর আব-হাওয়ার মধ্যেও হাল ছাড়েন না, তাঁহারা দেশবাসীর ক্ষীয়মান উৎসাহ বৃদ্ধিকল্পে নূতন পথের সন্ধানী হইয়া পড়েন—বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মধ্যে দলীয় প্রতিষ্ঠা তথা দেশের মুক্তি কামনা করেন। এই উদ্দেশ্যে একদিকে 'বন্দে-মাতরম', 'নবশক্তি' ও 'সন্ধ্যা' ইঁহাদেরই মুখপাত্ররূপে প্রকাশ্যে দেশবাসীকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে থাকে এবং অন্যদিকে তাঁহারা গোপনে গোলাগুলি ও বোমা-বারুদ নির্মাণের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। এবার শুধু উগ্র মতবাদ প্রচারই নহে, উগ্র কর্মচেষ্টাও তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য হয়।

প্রথমে তাঁহারা বিরুদ্ধদলের রাজনীতিক সভাপণ্ডের দিকে ঝোঁক দেন; ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সুরাট কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে চরমপন্থীরা মেদিনীপুর সম্মেলন কার্যত ভাঙ্গিয়া দেন। পক্ষান্তরে বরিশালে সরকারী চণ্ডনীতি অবলম্বিত হইবার পর নূতন প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামের গবর্ণর স্যর বামফিল্ড ফুলার এবং বাঙলার গবর্ণর ও বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনার অন্যতম রচয়িতা স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজারের জীবননাশের জন্য যুবকদল মরিয়া হইয়া উঠেন; কিন্তু সে সময় যেকোন কারণেই হউক, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই।

ইতিমধ্যে বাঙলা ও অন্যত্র কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী বা চরমপন্থীরা দলীয় কার্যকলাপ দ্বারা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কংগ্রেসে মডারেট বা নরমপন্থীদেরই প্রাধান্য অব্যাহত থাকে। অবশ্য বলা যায়, দেশবাসীর উপর হইতে কংগ্রেসের প্রভাব যখন কমিতে থাকে, তখন চরমপন্থীরাই বা কংগ্রেসে থাকিবার জন্য বা উহার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এত উদগ্রীব হয় কেন। ইহার উত্তর এই যে, কংগ্রেস কার্যত না হইলেও নামেও একমাত্র বৃটিশ-বিরোধী প্রতিষ্ঠান বলিয়া তৎকালেও পরিগণিত হইত। কাজেই ইহাকে দখলে রাখার ইচ্ছা উভয় দলের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেয়। এই ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্বে কিন্তু সেদিন চরমপন্থীরা আদৌ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

বলা বাহুল্য, ইহাতে উভয় পক্ষই নানারূপ কৌশল ও চাতুর্য অবলম্বন করেন। ১৯০৭ সালে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা। কিন্তু তথাকার মারাঠীরা চরমপন্থী এবং নাগপুর তাঁহাদের সুদৃঢ় ঘাটি। কাজেই এখানকার অধিবেশন সুবিধাজনক হইবে না বিবেচনা করিয়া নরমপন্থীরা সুরাটে অধিবেশন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। নরমপন্থীদের এই জাতীয় কারসাজিতে চরমপন্থীরা বিক্ষুব্ধ হইয়া কংগ্রেস পর্যন্ত বর্জনের সংকল্প করেন। কিন্তু তিলকের পরামর্শক্রমে এই আত্মঘাতী ব্যবস্থা হইতে তাঁহারা সাময়িকভাবে বিরত হন ; শুধু তাহাই নহে ; পরাজিতের মনোভাব পরিহার করিয়া তাঁহারা কংগ্রেস দখলের জন্যও তোড়জোড় করিতে থাকেন এবং শক্তিপরীক্ষার উদ্দেশ্য সদলবলে সুরাট কংগ্রেসে যোগ দেন।

প্রথমে গোলযোগ বাঁধে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন লইয়া। লালা লাজপৎ রায় অধিবেশনের কিছুকাল আগে অন্তরীণ হইতে মুক্তিলাভ করেন ; কাজেই দেশবাসীর বিশ্বাসভাজন নেতা হিসাবে তাঁহাকে সভাপতি নির্বাচন

করার জন্ম চরমপন্থীরা প্রস্তাব করেন। পক্ষান্তরে রাজরোষগ্রস্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করিলে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের কুনজরে পড়িবে—এরূপ আশংকায় নরমপন্থীরা ডাঃ রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করেন। শুধু তাহাই নহে। সরকারের অনভিপ্রেত কোন বিষয় যেমন বয়কট, স্বরাজ ও জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি প্রসঙ্গও কংগ্রেসে আলোচনা করা চলিবে না বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহাতেই অবস্থা একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠে।

অধিবেশনের প্রাক্কালে চরমপন্থীরা অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হইয়া স্থির করেন যে, কংগ্রেসের এতকালের পোষিত আদর্শকে নগণ্য সুবিধার জন্য কোন ক্রমেই বিকাইয়া দেওয়া চলিবে না। এতদনুসারে চরমপন্থীরা তাঁহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্ম নরমপন্থীদের নিকট অনুরোধ জানান; কিন্তু তাহা নরমপন্থীরা অগ্রাহ্য করেন। ইহার ফলে উভয় দলের মধ্যে এক তুমুল সঙ্ঘর্ষের সূত্রপাত হয় এবং হট্টগোলের মধ্যে অধিবেশন ভাঙ্গিয়া যায়; সুরাট দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়। এতদিন জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে যে ফাঁটল ছিল তাহা এবার বিস্তৃততর হয়,—মতভেদ বিচ্ছেদে পরিণত হয়। চরমপন্থীরা কংগ্রেস বর্জন করিতে বাধ্য হন; ইহার ফলে সাধারণ্যে কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাস পায়; সরকারীভাবে উহার অস্তিত্ব কোনক্রমে বজায় থাকে মাত্র;

সুরাটের অধিবেশন ভাঙিয়া যায় বটে, কিন্তু দেশের অগ্রগামী মতবাদ দ্বারা সমগ্রভাবে কংগ্রেস যে প্রভাবিত না হয় এমন নহে। ভাঙা কংগ্রেস যাহাতে পুনরায় বলসঞ্চয় করিয়া দেশবাসীর হৃদয় অধিকার করিতে পারে এমনিভাবে উহার গঠনতন্ত্রের মুসাবিদা ও লক্ষ্য স্থির করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৮ সালের ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল মডারেট নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের মতানুবর্তীদের লইয়া এলাহাবাদে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। উহাতে

নিম্নোক্ত মর্মে কংগ্রেসের আদর্শ স্থির হয়—"বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্তশাসিত দেশগুলির মত শাসনব্যবস্থা স্থাপনের এবং অধিকার ও দায়িত্বগ্রহণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় মহাসভা গঠিত। ধাপে ধাপে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা সংস্কার করিয়া বৈধ উপায়ে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিতে হইবে। জাতীয় ঐক্যবৃদ্ধি, জাতীয়-ভাবের উদ্বোধন এবং দেশবাসীর নৈতিক, মানসিক, বৈষয়িক ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন করাও মহাসমিতির অন্যতম লক্ষ্য।" অধিকন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভবিষ্যতে আর যাহাতে গোলযোগ না ঘটে, তদুদ্দেশ্যে গঠনতন্ত্রে প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধি সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেস পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সমিতির এই উদ্দেশ্য ও ব্যবস্থা বহাল থাকে।

কংগ্রেসে যখন মত ও পথ, দলগত প্রতিষ্টা ও নেতৃত্বের প্রশ্ন উগ্র হইয়া দেখা দেয় তখন চরমপন্থীদলের বাঙালী প্রধান ও যুবকগণ আমলাতন্ত্রী শাসক-বৃন্দের সহিত চূড়ান্ত বুঝাপড়ার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ইতালীর কার্বোনারী সমিতি ও রাশিয়ার নিহিলিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসীদের অনুকরণে গুপ্ত পথাশ্রয়ী হন। তাঁহারা কথার চেয়ে কাজকে, কড়া প্রস্তাব গ্রহণ করার চেয়ে বোমারিভলভারের তত্ত্বে বেশী বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। কজেই উপাধ্যায়, অরবিন্দ প্রমুখ নেতা ভাবাদর্শের দিক হইতে ইতিপূর্বে বাঙালী তরুণের মধ্যে যে বিপ্লবের সূচনা করেন, বারীন ঘোষ প্রভৃতি একদল আদর্শবাদী যুবক উপায়ান্তরহীন হইয়া তাহারই অভিব্যক্তির পথ সুগম করিয়া তোলেন। বঙ্গে বিপ্লববাদ সন্ত্রাসবাদের আকারে উগ্রভাবে আত্ম-প্রকাশ করে; সরকারী চণ্ডনীতির সমুচিত চণ্ড জবাবে মরণভীত জাতিও যেন মৃত্যুর হোলিখেলার মধ্যে বাঁচিবার উপায় আবিষ্কার করে।

১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাঙলার লাট স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার ট্রেনযোগে

মেদিনীপুর যাইতেছিলেন; বিপ্লবীদের লক্ষ্য, ট্রেনটি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে নারায়ণগড় ষ্টেশনের নিকট বোমা ফাটান হয়। ইহার ফলে ট্রেনের কয়েকখানি গাড়ী লাইনচ্যুত হয়; কিন্তু বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার অন্যতম রচয়িতা ফ্রেজার প্রাণে বাঁচিয়া যান। ইতিমধ্যে ২৩শে ডিসেম্বর ঢাকার প্রাক্তন ম্যাজিষ্ট্রেট এলেনকে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে দিনদুপুরে রিভলভারের গুলিতে সাংঘাতিক আহত করিয়া বিপ্লবী তরুণ অনায়াসে সরিয়া পড়ে। ইহার পর চলে কুষ্টিয়ার পাদ্রী হিকেনের উপর গুলি। বাঙালী জনসাধারণ এতদিন প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মনে মনে যে কল্পনা করিয়া আসিতেছিল, তাহারই বাস্তব রূপ দেখিয়া তাহারা বিস্মিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছু জাতি চরম নৈরাশ্যের মধ্যে মরিয়া হইয়া গুপ্ত হিংসার পথে আত্ম-প্রকাশের পথ খুঁজিতে থাকে।

অতঃপর ১৯০৮ সালের ১১ই এপ্রিল চন্দননগরের মেয়রের গৃহে বোমা ফাটে এবং ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলিকাতার প্রাক্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব ভ্রমে ভারতহিতৈষী নিরপরাধ কেনেডীদম্পতির উপর বোমা মারা হয়; ইহাতে তাঁহাদের মৃত্যু হয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রারম্ভে কিংসফোর্ড সাহেব কলিকাতায় থাকাকালে জনৈক বাঙালী তরুণকে হাঙ্গামার দায়ে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং ভারতীয়দের আশাআকাঙ্ক্ষার বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেন। তাঁহার উপর এই জন্যই বিপ্লবীদের আক্রোশ ছিল। এই শোচনীয় ব্যাপারের জন্য দায়ী প্রফুল্লকুমার চাকী গ্রেপ্তারের হাত এড়াইতে গিয়া আত্মহত্যা করেন এবং ধরা পড়ায় ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়।

এইসব বিক্ষিপ্ত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট সুসম্বন্ধ পরিকল্পনা ও সঙ্ঘবদ্ধ সংগঠনের আভাস পাইয়া বিশেষ শংকিত হইয়া পড়ে। তাহারা বুঝিতে পারে, যেজাতি আত্মদানের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা এত সহজে

আমলাতন্ত্রকে রেহাই দিবে না; তাহাদের সহিত প্রচণ্ড সংঘর্ষ আসন্ন। কাজেই ইহার মূল উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্টও উঠিয়া পড়িয়া লাগে।

বহু চেষ্টাযত্নের পর ১৯০৮ সালের ২রা মে কলিকাতায় বিপ্লবীদের ঘাঁটি বলিয়া কথিত মানিকতলার বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। উহাতে গাড়ীগাড়ী বোমা, রাইফেল, কার্তুজ প্রভৃতি মালমশলা ধরা পড়ে। উহার নায়ক বারীন্দ্র কুমার ঘোষ (অরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর) প্রভৃতি ৩৪ জন যুবক সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধচালনার দায়ে অভিযুক্ত হন; এই মামলাই বিখ্যাত আলীপুর ষড়যন্ত্র মামলা। এক বৎসর ধরিয়া ইহার শুনানী চলে। ইহাতে উদীয়মান কৌঁশুলী চিত্তরঞ্জন দাস আসামী পক্ষ সমর্থন করেন; তাঁহার চেষ্টায় অভিযুক্ত অরবিন্দ বেকসুর খালাস পান বটে, কিন্তু অন্যান্য সকলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইতে বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডিত হন। মামলার সময় একাধিক ঘটনায় সমগ্র দেশে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

আলীপুর মামলায় নরেন গোসাই রাজসাক্ষী হয়। সে যাহাতে স্বীকারোক্তি করিয়া আন্দোলনের বেশি ক্ষতি না করিতে পারে, তাহার জন্য অভিযুক্ত সত্যেন্দ্র বসু ও কানাই দত্ত ১লা সেপ্টেম্বর জেলের মধ্যেই রিভলভার সংগ্রহ করিয়া তাহাকে হত্যা করেন। এই অপরাধে কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রের ফাঁসি হয়। কিন্তু তাঁহারা শহীদ রূপে জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ করেন; এমনকি কানাই-এর অন্ত্যেষ্টির পর পবিত্র বস্তু হিসাবে তাঁহার চিতাভস্ম সকলে কৌটায় সংগ্রহ করিয়া রাখে। সব চেয়ে অশ্চর্যের বিষয় এই যে, তৎকালীন ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র 'পাইওনিয়ার' পর্যন্ত কানাইলালের আত্মোৎসর্গের প্রশংসা করে।

অতঃপর বৈপ্লবিক তৎপরতার ঢেউ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে; রাজনীতিক কর্মতৎপরতা বাঁচাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে একদিকে চলে ডাকাতি প্রভৃতি পথে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা, অন্যদিকে রাজনীতিক হত্যাকাণ্ড একের পর এক অনুষ্ঠিত

হইতে থাকে। ইতিমধ্যে গ্রে ষ্ট্রীটে এক বোমা ফাটে এবং ২রা জুন ঢাকা জেলার বাড়্রা নামক স্থানে এক অসমসাহসিক ডাকাতি হয়। রাজনীতিক উদ্দেশ্যে ইহাই প্রথম স্বদেশী ডাকাতি। ইহাতে ৪ জন নিহত ও বহু লোক আহত হয়। এদিকে নন্দলাল নামক জনৈক গোয়েন্দা কানাইলালের ফাঁসির আগের দিন সকালে গুলিতে নিহত হয়। এই ব্যক্তি ইতিপূর্বে মোকামা ষ্টেশনে প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিয়াছিল। ইহার মাত্র দুইদিন আগে কলিকাতার ওভারটুন হলে আবার ছোট লাট ফ্রেজার সাহেবকে হত্যার চেষ্টা হয়; কিন্তু এবারও বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতঃপর ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী আলীপুর মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস এবং তদ্বিরকারী গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ সুপার সামশুল আলম ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারী বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ হারায়।

১৯০৮ সালে বাঙলায় মোট ২১টি বৈপ্লবিক তৎপরতার অনুষ্ঠান হয়। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্টও ইহাকে পিষিয়া মারিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। এই ভাবে ১৯০৫—৮ সালের মধ্যে বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়।

বিদ্রোহী বাঙলাকে শায়েস্তা করিবার জন্য সরকার বেড়াজাল ফেলে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা ১৮১৮ সালের তিন আইন বলে চরমপন্থী বলিয়া বর্ণিত জননায়ক অশ্বিনী দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সুবোধ মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সতীশ চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, পুলিন দাস ও ভূপেশ নাগকে নির্বাসিত করে।

সরকার ভাবিল, এইবার সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে; গোড়ায় যখন টান পড়িয়াছে তখন শাখাপ্রশাখাও শুকাইয়া যাইবে। কিন্তু বিপ্লববাদ ততদিন দেশের আবহাওয়ার সহিত অনেকাংশে খাপ খাইয়া যায়। নৈরাশ্যপীড়িত দেশবাসীও উহাতে সমর্থন জোগায়। এই হেতু বিপ্লব আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে না। পক্ষান্তরে সহানুভূতিহীন আমলাতন্ত্র কিছুতেই

বুঝিতে চাহে না যে, বাঙলার উপর চাপান অন্যায়ের প্রতিকার না হইলে সন্ত্রাসমূলক আন্দোলন থামিতে পারে না। অধিকন্তু গুপ্তহত্যা বন্ধ না হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট মনে করে যে, দেশে বিপ্লবের বন্যা আসিয়াছে। যেকোন উপায়ে উহাকে প্রতিরোধ করিতেই হইবে। শুধু এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ১৯০৮ সালের ৮ই জুন সরকার আইন পরিষদের একদিনের অধিবেশনেই বিস্ফোরক আইন ও জনমতের কণ্ঠরোধকল্পে সংবাদপত্র দমন আইন পাশ করাইয়া নেয়। উক্ত আইনে বিহিত হয় যে, বিস্ফোরক দ্রব্য যাহার নিকট পাওয়া যাইবে, তাহারই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইবে এবং সংবাদপত্রে হিংসাত্মক কর্মের প্ররোচনা থাকিলে সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ এবং ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হইবে; মুদ্রাকর এবং সম্পাদকও দণ্ড হইতে রেহাই পাইবেনা।

প্রথম চোটে মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও আলীগড় প্রভৃতি স্থানের কয়েকটি সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত এবং কয়েকজন সম্পাদকের কারাদণ্ড হয়। ইহার মধ্যে মহারাষ্ট্রের 'কেশরী' সম্পাদক লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের মামলাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি 'কেশরী'তে একই সঙ্গে মজঃফরপুরে বোমাবর্ষণের এবং পাল্টা সরকারী চণ্ডনীতির তীব্র নিন্দা করেন। এই অপরাধে ১৯০৮ সালের ২৪শে জুন তিলক গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে তাঁহার ছয় বছর কারাদণ্ড ও হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়। দেশবরেণ্য নেতার এই গুরুদণ্ডে দেশবাসী বিশেষ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে; বোম্বাইএর মিলশ্রমিকদের ছয় দিন ব্যাপী ধর্মঘট পালন তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এদিকে বৈপ্লবিক অপরাধের সরাসরি বিচারের জন্য ১৯০৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর ফৌজদারী আইন সংশোধন করা হয়। এতদনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে (ক) ঢাকার অনুশীলন সমিতি, (খ) বাখরগঞ্জের স্বদেশী বান্ধব সমিতি, (গ) ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, (ঘ) ময়মনসিংহের সাধনসমিতি এবং (ঙ) সুহৃৎ সমিতি বেআইনী ঘোষণা

করে। অতঃপর ১৩ই ডিসেম্বর বাঙলার নয় জন বিশিষ্ট নেতা বন্দী হন। এইভাবে জননায়কবর্গ, সংবাদপত্র ও অস্ত্র সরকারী পাল্টা আক্রমণের লক্ষ্য স্থলে পরিণত হয়।

কিন্তু কঠোর দমননীতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও বৈপ্লবিক তৎপরতা কমিবার আদৌ কোন লক্ষণ দেখা যায় না; বরং দেশবাসী ঘোর ইংরেজবিদ্বেষী হইয়া পড়ে এবং তাহারা বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠে। এই মনোভাব গুপ্ত রাজনীতিক কার্যকলাপের প্রসার ও পুষ্টির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়। কাজেই সরকারী বিরুদ্ধতাও আন্দোলনকে দমাইতে না পারায় ১৯০৮ সাল হইতে বিপ্লবীরাও নূতনভাবে তৎপরতা বৃদ্ধির দিকে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদের এই কাজের ধারা ১৯১৪ সাল পর্যন্ত কম বা বেশি মাত্রায় বজায় থাকে। এই সময়কে বিপ্লববাদের দ্বিতীয় অধ্যায় বলিয়া অভিহিত করা যায়।

পূর্বোক্ত কয় বৎসরের একটা মোটামুটি হিসাব লওয়া যাক। প্রথম ধরা যাক ১৯০৯ সালের হিসাব। ঐ বৎসর ১৫টি বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা চলে; গবর্ণমেণ্টও বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কয়েকটি রাজনীতিক মামলা দায়ের করে; উহার মধ্যে ঢাকা ষড়যন্ত্র বা অনুশীলন সমিতির মামলা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত পুলিন দাস প্রমুখ ৪০ জন যুবক এই মামলায় আসামী ছিলেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার মত ইহাতেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস আসামীপক্ষ সমর্থন করেন; তাঁহারই সুযোগ্য পরিচালনার গুণে ১৫ জন আসামী মাত্র বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত হন।

ইহার পর হইতে বিপ্লব দমনের নামে সরকারপক্ষও কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে ১৯১০ সালে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং যুগান্তর প্রভৃতি কয়েকটি সংবাদপত্র ইহার প্রকোপে বন্ধ হইয়া যায়।

১৯১১ সালে পূর্ববঙ্গে ১৬টি এবং পশ্চিম বঙ্গে ২টি বৈপ্লবিক তৎপরতা ঘটে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু আন্দোলনের মূলোচ্ছেদের জন্য সরকারপক্ষও উঠিয়া পড়িয়া লাগে; দলে দলে গুপ্তচর সারাদেশ ছাইয়া ফেলে।

বিপ্লবীরাও আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া এই বৎসর অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশের চরদের খুন করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে দরবার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। বিপ্লবীদের সভায় স্থির হয় যে সাম্রাজ্যের আইনত কর্তা ও প্রতীক সম্রাটকে গড়ের মাঠ দিয়া যাইবার সময় বোমা মারিয়া হত্যা করা হইবে; কিন্তু ইহাও স্থির করা হয় যে ইতিমধ্যে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হইলে এই ব্যবস্থা কার্যকর হইবে না। কাজেই দিল্লীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ রহিতের কথা ঘোষিত হওয়ায় সম্রাটের গাড়ীতে আর বোমা মারা হয় নাই। অধিকন্তু ভবিষ্যৎ নির্ধারণকল্পে যে বৈঠক হয় তাহাতে আন্দোলন বন্ধ রাখা সম্পর্কে বিপ্লবী নেতৃবর্গের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ইহার ফলে দেশে গুপ্ত আন্দোলন মন্দগতিতে চলিতে থাকে; তবে ইহার শাখাপ্রশাখা বঙ্গেতর প্রদেশে বিস্তার লাভ করে।

১৯১২ সালে বাঙলায় যেসব বৈপ্লবিক তৎপরতা চলে, তাহাদের মধ্যে কলিকাতায় রাজাবাজারে বোমা আবিষ্কার ও বরিশাল ষড়যন্ত্রের মামলা উল্লেখযোগ্য। রাজাবাজারে বোমা প্রাপ্তির পর আরও কয়েকটি সূত্র হইতে সংগৃহীত খবরে সরকারপক্ষের ধারণা জন্মে যে, বাংলার বিপ্লববাদ বহির্বঙ্গেও প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা চিরাচরিত চণ্ড ব্যবস্থা তেমন অবলম্বন করে না; পক্ষান্তরে নানা ব্যাপারে তাহাদের মনোভাব পরিবর্তনের সূচনা লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার বিষয় উল্লেখ করা যায়। গবর্ণমেণ্ট উক্ত মামলার আসামীদের সহিত এক আপোষরফা করে। আপোষের

সর্তানুযায়ী ১৬ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে ১২ জন অপরাধ স্বীকার করিয়া বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত হন।

অতঃপর ১৯১৩ সালে বিপ্লব আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়ে; ঐ বছর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। তবে ১৯১৪ সালে আবার বিপ্লবীদের কর্মৎপরতার বেগ বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা এবং পুলিশও বিশেষ তৎপর হইয়া উঠে; ইহার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে ছোটখাট সজ্ঘর্ষ লাগিয়াই থাকে এবং বিপ্লবীরা কয়েকটি রাজনীতিক হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়েন। অনেকে বাধ্য হইয়াই আত্মগোপন করেন। এই সময় প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হয়; ইহার সঙ্গে বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে বহির্বাঙলা বিশেষত পশ্চিম ভারতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক মামলা হয়, তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। হিন্দুমহাসভার প্রাক্তন সভাপতি বিনায়ক দামোদর সাভারকরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাসিকের গণেশ দামোদর সাভারকর 'লঘু অভিনব ভারতমেলা' নামক পুস্তক প্রকাশের দায়ে ১৯০৯ সালে ৯ই জুন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসনের বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া জনৈক যুবক বিদায়সম্বর্ধনা কালে মিঃ জ্যাকসনকে হত্যা করে। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া সমগ্র পশ্চিম ভারতে ব্যাপক দমননীতি প্রয়োগ করা হয় এবং বহুলোক এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকার এক মামলা খাড়া করে; ইহাই বিখ্যাত নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা।

ঐ মামলায় অভিযুক্ত তিন জনের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। কিন্তু ইহাতেও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হ্রাসের কোনই লক্ষণ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে এই ব্যাপারের পর হইতে সমগ্র পশ্চিম ভারতে গুপ্ত আন্দোলনের আরও বিস্তার ঘটে। আমেদাবাদে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর প্রাণনাশের চেষ্টা ইহার প্রমাণ।

১৯০৯ সালে লর্ড মিণ্টো আমেদাবাদ পরিদর্শনে গেলে যুবকদল বোমা দ্বারা তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করে; কিন্তু নিক্ষিপ্ত বোমা ফাটে নাই বলিয়া সেযাত্রা লর্ড মিণ্টো প্রাণে বাঁচিয়া যান।

এই সব ঘটনা ঘটিবার বহু পূর্বে বিনায়ক দামোদর সাভারকর প্রসিদ্ধ ভারতীয় বিপ্লবী-নেতা শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রতিষ্ঠিত বৃত্তি পাইয়া ১৯০৬সালে উচ্চ শিক্ষালাভার্থে বিলাত চলিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশের নির্বাসন-দণ্ডের কথা শুনিয়া বিলাতে শ্যামজীর অন্যতম অনুগামী মদনলাল ধিংরা ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভারত সচিবের পার্শ্বচর স্যর উইলিয়ম কার্জন ওয়াইলীকে হত্যা করে; বিচারে তাহার ফাঁসি হয়; এই সম্পর্কে বিনায়ক গ্রেপ্তার হন এবং তাঁহাকে বিচারার্থে জাহাজযোগে বোম্বাই পাঠান হয়। কিন্তু ফ্রান্সের মার্শেই বন্দরের নিকট জাহাজ ভিড়িলে তিনি দুরন্ত সাহসে ভর করিয়া উত্তাল সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং সাঁতরাইয়া তীরে পৌঁছেন। অতঃপর তিনি বৃটিশ পুলিশের হাত এড়াইয়া ফরাসী পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু তাঁহাকে ইহা সত্ত্বেও বৃটিশ পুলিশের হাতেই সমর্পণ করা হয়।

এই উপলক্ষে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাঁহার বিচারের জন্য দাবী জানান হয়; কিন্তু উহার কোন প্রতিবিধান হয় না। অবশেষে বোম্বাই আদালতের বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদ হইবার পর আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় দেশবাসী ঝিমাইয়া পড়ে; মডারেট-প্রভাবিত কংগ্রেসও নিশ্চল থাকিয়া যায়। কিন্তু বিপ্লব-বাদীরা সর্বব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামে নূতন পথ সৃষ্টি করিয়া চলেন। তাঁহারা একদিকে গুপ্তষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা এবং অন্যদিকে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহযোগিতায় স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতে থাকে।

কাজেই গবর্ণমেণ্টকে সন্ত্রস্ত করিয়া ভারতীয় দাবীর যৌক্তিকতার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতিভূ বড়লাটের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লী দরবার অনুষ্ঠানের সময় বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের গাড়ীতে বোমা মারা হয়। কিন্তু বড়লাট অক্ষত শরীরে রক্ষা পান।

অতঃপর ক্রমান্বয়ে কয়েক স্থানে বোমা বর্ষিত হয়; এই সব কারণে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আতঙ্কিত হইয়া পড়ে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে চারিদিকে ধরপাকড় আরম্ভ হয়। ইহার ফলে নানা গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ পায় এবং সরকার ধৃত ব্যক্তিদের লইয়া এক বিরাট ষড়যন্ত্রের মামলা আরম্ভ করে; ইহাই পরবর্তীকালে দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলা বলিয়া অভিহিত হয়; ইহাতে মাষ্টার আমীরচাঁদ প্রমুখ তিনজনের ফাঁসি হয়। গবর্ণমেণ্টের মতে রাসবিহারী বসু এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। এই হেতু তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য ১২ হাজার টাকার হুলিয়া বাহির হয়। কিন্তু তিনি আত্মগোপন করিয়া কাশী ও লাহোর হইতে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত উত্তর ভারতে বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনা করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনেও এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হয়। একদিকে সরকারী চণ্ডনীতি এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সাধনার ভেদবিভেদের মধ্যে ১৯০৮ সালে মাদ্রাজে দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কিন্তু বামপন্থী দল কর্মগত মতভেদের দরুণ কংগ্রেসে যোগ না দিয়া নিজেদের বাঞ্ছিত পথে আগাইয়া চলেন।

এহেন ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট দেশের ঘরোয়া রাজনীতিক দৌর্বল্যের চূড়ান্ত সুযোগ নেয়; কিন্তু বাঙালী তথা ভারতবাসীর অপরাজেয় মনোভাব ও উত্তরোত্তর উগ্র কার্যকলাপ দেখিয়া তাহারা শঙ্কা গণিতে থাকে। তাহারা বুঝিতে পারে, বাঙলার সীমাবদ্ধ আঞ্চলিক আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ গ্রহণ

করিয়াছে ;—বাঙলাকে নিস্তেজ করিতে গিয়া মুক্তি-সংগ্রামে নূতন শক্তি ও গতির সঞ্চারই করা হইয়াছে। কাজেই রাজত্বের মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী করিতে হইলে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের গতি শ্লথ ও ভিন্নমুখী করার প্রয়োজন বলিয়াও তাহারা মনে করে। এই দিক হইতে বিচার করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে তুষ্ট করিবার উপায় হিসাবে শাসন-সংস্কারে উদ্যোগী হয়। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তদানীন্তন উদারনীতিক ভারত-সচিব লর্ড মর্লে এবং ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টো অবহিত হইয়া উঠেন। তাঁহারা সম্মিলিত পরামর্শক্রমে যুক্ত ও পৃথক নির্বাচনের মাঝামাঝি এক সংস্কার পরিকল্পনা বিন্যাস করেন। ইহাতেই সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রবীন কংগ্রেসী নেতা আশাতীত খুশী হইয়া উক্ত পরিকল্পনা অনুমোদন করেন ; উদীয়মান মুসলমান কংগ্রেসী নেতা ব্যারিষ্টার মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না উহারই মধ্যে জাতির মুক্তি ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনসূত্র আবিষ্কার করেন।

কিন্তু আসল গোল বাঁধে কয়েকজন প্রতিক্রিয়াপন্থী নেতৃস্থানীয় মুসলমানকে লইয়া। ইতিপূর্বে তাঁহারা সরকারী ইঙ্গিতে পৃথক নির্বাচনের সমর্থক হন। মর্লে-মিণ্টো প্রস্তাব তাহাদের মনঃপূত হয় না। শুধু তাহাই নহে। তাঁহারা প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতে ও বিলাতে একযোগে আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই সম্পর্কে স্বর্গত আমীর আলীর নেতৃত্বে এক মুসলমান প্রতিনিধিদল বিলাতে ভারত সচিবের নিকট সাম্প্রদায়িক সুযোগসুবিধার প্রস্তাব-সম্বলিত এক বিজ্ঞপ্তিপত্র পেশ করেন ; পক্ষান্তরে ভারতেও একদল প্রতিক্রিয়াশীল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলমান ইহার বিরুদ্ধতা করিতে থাকেন।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, ১৯০৯ সালে ঢাকায় মুসলীম শিক্ষা সম্মেলন আহূত হয়। উহার মধ্যে ভবিষ্যৎ লীগের বীজ উপ্ত ছিল। কিন্তু ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসেই সর্বপ্রথম অমৃতসরে সরকারীভাবে লীগের অধিবেশন হয়। উহাতে লীগের মূল লক্ষ্য নিম্নরূপ বর্ণিত হয় যথা :—মোসলেম লীগ

বৃটিশরাজের আনুগত্য স্বীকার করে; বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্প্রীতি স্থাপনে লীগ বিশ্বাসী।' অবশ্য মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থসংরক্ষণ ও অভাবঅভিযোগের প্রতিকার ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত সৌহার্দ স্থাপন করাও লীগ স্বীয় উদ্দেশ্য বলিয়া মানিয়া নেয়। *

প্রসঙ্গত বঙ্গভঙ্গের সময় হইতে মর্লে-মিণ্টো শাসনসংস্কার পর্যন্ত ভারতে মুসলমান রাজনীতির বিবর্তন উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় মুসলমানদের প্রতি বিদেশী শাসকগোষ্ঠী যে মনোভাব পোষণ করিত, বঙ্গভঙ্গের সময়ও প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। ঐসময় তাহারা স্যর সৈয়দ আহম্মদের মারফৎ ভারতীয় রাজনীতিক দেহে অকল্যাণবুদ্ধির বিষ প্রবেশ করাইতে সচেষ্ট হয়; কিন্তু সেই অপচেষ্টা সাময়িকভাবে বিফল হইলেও শাসকসম্প্রদায় উত্তরকালে ভেদবুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক তিক্ততা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। সিপাহী অভ্যুত্থানের পর হইতে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত বাঙালী শিক্ষিত হিন্দু বিদেশী শাসকদের প্রিয়পাত্র বলিয়া গণ্য হইত; কিন্তু বঙ্গভঙ্গের সময় হইতে তাহাদের সেই মনোভাবের পরিবর্তন সূচিত হইতে থাকে। একদা শাসন-সৌকর্যার্থ তাহাদের মধ্যবিত্ত হিন্দুর সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হওয়ায় এবং সরকারী চাকরিতে তাহারা অংশগ্রহণ করিতে থাকায় সরকারও হিন্দুদের প্রতি সুযোগ বুঝিয়া অপ্রিয় ব্যবহার করিতে থাকে। ইহার অবশ্য অন্যবিধ কারণও ছিল। তাহারা বুঝিতে পারে যে

---

* লীগ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর অনেক উচ্চপদস্থ ইংরেজ সরকারী কর্মচারী বলেন, "It is nothing less than the pulling back of sixty-two millions of people from going the ranks of the seditious opposition. * * * It is a work of statesmanship that will affect India and Indian history for many a long years."

শিক্ষিত হিন্দু রাজনীতিসচেতন এবং চাকরি ও শাসনব্যাপারে শ্বেতশাসকদের প্রতিযোগী। কাজেই নবসৃষ্ট মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে শিক্ষিত হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করাইতে তাহারা সহায়তা করে। ইহারই ফলে শিক্ষাদীক্ষা ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে অগ্রসর ও প্রগতিশীল হিন্দুর বিরুদ্ধে অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ মুসলমান সম্প্রদায় গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্ভবঅসম্ভব নানা দাবী পেশ করিতে থাকে। সরকারও উহাতে ইন্ধন যোগায়; অধিকন্তু নিজেদের কাজ হাসিলের চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট অভিজাত শ্রেণীর কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান নেতাকে প্রচুর প্রলোভন দেখাইয়া হস্তগত করিবার চেষ্টা করে।

বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালেও বাঙলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল; তৎকালে সাধারণ মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায়গত মনোভাবের স্ফুরণ হয় নাই; তাহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংগঠনও তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কাজ সুরু করে নাই। সংস্কার ও আচারব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাহাদের ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামি বেশী কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না; বরং ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সংযোগ বজায় ছিল; আর্থিক উত্থানপতনেও উভয় সম্প্রদায়ের অনগ্রসর ও নির্যাতিতগণ একাত্মতা ও সমবেদনা বোধ করিত।

কিন্তু ইহাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধির উন্মেষ হইল কি করিয়া? সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরই বা কিরূপে সূচনা হইল?

নূতন প্রদেশ গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গশাসক শ্রেণী মুসলমানদের ভিতর এইভাব জাগাইয়া তোলে যে তাহাদের সুবিধার্থই বঙ্গ ভঙ্গ করা হইয়াছে এবং তাহারা সরকারের অনুগৃহীত। নূতন প্রদেশের শাসনকর্তা স্যর বামফিল্ড ফুলার প্রকাশ্যে বলেন,—মুসলমানরা শাসকদের 'সুয়ো রাণী' এবং হিন্দুরা 'দুয়ো রাণী'। তবে এ কথাও ঠিক, আমলাতন্ত্র

বাংলাকে খণ্ডিত করিয়া মুসলমান-প্রধান প্রদেশরূপে গড়িবার পরিকল্পনা ও সংকল্প করে। এই সম্পর্কে বঙ্গ-ভঙ্গের পূর্বে গবর্ণমেণ্ট সিবিলিয়ান রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পরামর্শ পর্যন্ত গ্রহণ করে; কিন্তু তিনি সরকারী ভেদনীতির বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিলেও গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কথায় কর্ণপাত করা যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই।

বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পর পূর্ববঙ্গের সিরাজগঞ্জ, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও অনাচার অনুষ্ঠিত হয়। ইহা নিতান্ত বিচ্ছিন্ন, আকস্মিক ও আঞ্চলিক ঘটনামাত্র ছিল না। উহার পিছনে জনকয়েক সরকার-অনুগৃহীত মুসলমান নেতার অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিত ও প্ররোচনা ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু তৎকালে সাম্প্রদায়িক উস্কানির প্রতি সাধারণ মুসলমান উদাসীন ছিল এবং তাহারা সম্প্রদায়গত ভাবে সঙ্ঘবদ্ধও ছিল না; কাজেই সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা ও আবেদন তাহাদের মনে তেমন সাড়া জাগাইতে অসমর্থ ছিল বলিয়াই হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ ব্যাপক হইয়া উঠিতে পারে নাই।

পরিতাপের কথা, ঢাকার ঋণভারগ্রস্ত নবাব সলিম উল্লা সরকারদত্ত প্রসাদ লাভ করিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষসৃষ্টির ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের হাতে খেলার সামগ্রী হইয়া পড়েন। এই কথা এখন আর গোপন নাই। পক্ষান্তরে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে তিনিই ঢাকায় মুসলীম শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান করেন। মাননীয় আগাখাঁ প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলমান নেতা উহাতে যোগ দেন। অধিবেশনে লীগের গোড়া পত্তন হয়। কিন্তু উহার পশ্চাতে যে সরকারী ইঙ্গিত ও পোষকতা ছিল, তাহা সর্বজনবিদিত।

ইতিপূর্বে ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর মাননীয় আগা খাঁয়ের নেতৃত্বে কয়েকজন মুসলমান নেতা সিমলায় বড়লাট লর্ড মিণ্টোর নিকট এক লিপি

পেশ করেন। উহাতে প্রচলিত শাসন পদ্ধতিতে মুসলমানদের আস্থা প্রকাশ করা হয় এবং এই মর্মে দাবী জানান হয় যে প্রস্তাবিত ভাবী শাসনসংস্কার অনুযায়ী যেসব আইন পরিষদ গঠিত হইবে, তাহার প্রত্যেকটিতে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার ও সমস্ত জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের চেয়েও সংখ্যাতিরিক্তি আসন দিতে হইবে।

এই সম্পর্কে উল্লেখ প্রয়োজন, ১৯০৬ সালের প্রারম্ভে ভারতসচিব লর্ড মর্লে ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টোর নিকট শাসনসংস্কারের প্রস্তাব করিয়া মন্তব্য করেন যে, প্রস্তাবিত শাসন ব্যবস্থায় মুসলমান, জমিদার ও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের সরকারের মতানুবর্তী করা যাইবে। *

ভারতের আমলাতন্ত্রও মর্লের এই উক্তির সুযোগ লইয়া দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধির প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করে। তাহাদের প্ররোচনায়ই পূর্বোক্ত মুসলমান প্রতিনিধিদল বড়লাটের সহিত দেখা করেন এবং লর্ড মিণ্টো সরকারীভাবে তাঁহাদের দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করিয়া তাহা পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহা মর্লে-মিণ্টো শাসনসংস্কারে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের গোড়ার ইতিহাস।

প্রথম দিকে লর্ড মর্লে পৃথক নির্বাচনের ঘোর বিরোধিতা করেন; তিনি বলেন 'we are sowing dragon's teeth'—আমরা বীষবৃক্ষ রোপন করিতেছি। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধতা স্থায়ী হয় নাই; বড়লাট লর্ড মিণ্টোর

---

* কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান প্রভাব খর্ব করার ও উহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিণ্টো যে সব উক্তি করেন, তাহাও লক্ষ্যের বিষয়। একস্থানে তিনি বলেন, "As to congress there is much that is absolutely disloyal in the movement and that there is danger for the future I have no doubt. * * * I have been thinking a good deal lately of a possible counter-poise to congress aims,"

প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথক নির্বাচনের স্বীকৃতি সহ ১৯০৯ সালের ২৫শে মে শাসন সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই ভাবেই সরকারী আওতায় ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে পৃথক নির্বাচন ও ভেদবুদ্ধি আইনগত মর্যাদা লাভ করে। সম্প্রদায়গত ভেদনীতি আমদানী করিয়া এবং সম্প্রদায় ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্দল বাধাইবার ফ্যাঁকড়া তুলিয়া তাহারাই তৃতীয় পক্ষ হিসাবে ভারতের পুরাদস্তুর মুরুব্বি বা সালিশ সাজিয়া বসে।

যেখানেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়াছে, সেখানেই তাহাদের শাসন ও শোষণ কায়েম রাখিবার ব্রহ্মাস্ত্র হইয়াছে সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি ও উহাতে উস্কানিদান। প্যালেষ্টাইনের আরব-ইহুদি, মিশরে কপটিক-খৃষ্টান-মিশরী সংঘর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধও একই নীতি ও উদ্দেশ্যের রাজসংস্করণ মাত্র।

কংগ্রেস নরমপন্থী হইলেও এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়া ১৯১০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর মর্লে-মিণ্টো ভুয়া শাসন-সংস্কার ভারতে চালু করা হয়।

গভর্ণমেণ্ট মনে করে, আর যাহাই হউক না কেন, ভারতবাসী রাজার প্রতি অনুগত; এই হেতু সম্রাটের ক্ষুদ্র দানও প্রজাপুঞ্জের তুষ্টির হেতু হইবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহারা নিজেদের গলদ সম্পর্কে বিশেষ সজাগ ছিল। পার্লামেণ্টের লর্ড সভায় ভারতীয় শাসনসংস্কার বিল পেশ করিয়া ভারত সচিব লর্ড মর্লে স্পষ্টই বলেন যে, এব্যবস্থার দ্বারা ভারতে পার্লামেণ্টারী শাসন প্রথা প্রবর্তিত হইতেছে না। শুধু সাধারণের কল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়ে পরিষদের বেসরকারী সদস্যগণ প্রস্তাব উত্থাপনের এবং ঐ সুযোগে সরকারী কাজের সমালোচনা করিবার অধিকারী হন মাত্র। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থা কার্যত নিরঙ্কুশ থাকিয়াই যায়। এরূপ অবস্থায় নরমপন্থীরা পর্যন্ত উহা সমর্থন করিতে পারেন নাই;—বামপন্থী ও আত্মনির্ভর যুবকদল এবং

তাহাদের প্রশংসামুখর দেশবাসী ত রীতিমত বিক্ষুব্ধ ও অধিকতর উত্তেজিত হইয়াই উঠেন।

একমাত্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন জনকয়েককে খুশী করা ছাড়া যখন শাসনসংস্কারে কোন ফল হয় নাই বলিয়া বুঝা গেল তখন হইতে শাসকগোষ্ঠি ভারতবাসীর ক্ষোভে প্রলেপ দিবার উপায় খুঁজিতে থাকে। কিন্তু ভেদ ও দণ্ড তাহাদের চিরাচরিত নীতি; পুণ্যাত্মারূপে তাহারা যেহাতে পুণ্য বিতরণ করে, দণ্ডধররূপে সেই হাতেই তাহা কড়িয়া নেয়। শুধু তাহাই নহে; তাহাদের সৎপ্রেরণার পিছনে শঠবুদ্ধি কাজ করিয়া থাকে। এই হেতু নিজেদের চ্যুতিবিচ্যুতি সম্পর্কে তাহারা অতিমাত্রায় সজাগ। প্রজাসাধারণের হিত ও তুষ্টির জন্য যে শাসনসংস্কার প্রবর্তন, তাহা তাহাদের আদৌ সন্তোষের কারণ হইবে না বলিয়াই তাহারা ধরিয়া নেয় এবং সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পূর্ব হইতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করে। এক্ষেত্রেও উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। একদিকে পৃথক নির্বাচন সহ শাসনসংস্কার প্রবর্তন, অন্যদিকে নবোদ্ভূত অসন্তোষ ও আন্দোলন দমনকল্পে তাহারা দমন-নীতির ব্যাপক প্রয়োগ আরম্ভ করে; সভাসমিতির মারফৎ যাহাতে অসন্তোষের বাহ্যিক অভিব্যক্তি না ঘটে, তজ্জন্য সভানুষ্ঠান বন্ধ এবং বিপ্লবীদের গুপ্ত ও হিংস কার্যকলাপ নির্মূলের উদ্দেশ্যে বিপুল তোড়জোড় করা হয়। অথচ ইহা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন ঘটনাবলীর চাপে গবর্ণমেণ্ট আদৌ স্বস্তি বোধ করে না। এই হেতু নিজেদের গরজেই তাহারা ভারতবাসীর সহিত নূতন করিয়া সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে কিছুটা অগ্রসর হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথম কিস্তিতে নির্বাসিত ও কারান্তরিত বাঙালী প্রধান ও যুবকদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় দফায় ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর রাজা পঞ্চম জর্জের ভারতে আগমন উপলক্ষে সমস্ত আন্দোলনের মূল উৎস বঙ্গ-ভঙ্গ রদের কথা এক রাজকীয় ঘোষণায় সরবে ঘোষিত হয়। সমগ্র

বৃটিশ শাসনের উদ্ধত দম্ভ ও রোষের বিরুদ্ধে একক ও আত্মনির্ভরশীল বাঙলার আন্দোলন জয়যুক্ত হয়; অবশেষে মর্লের 'কায়েমী ব্যবস্থাও' (Settled fact) সজ্ঘর্ষের মুখে বানচাল হইয়া যায়; গবর্ণমেণ্টকে নিজেদের অভ্রান্ত ব্যবস্থাও পাল্টাইতে হয়; ভাঙ্গা বাঙলা জোড়া লাগে। ইহাই বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত শক্তিপরীক্ষায় বাঙালী তথা ভারতবাসীর প্রথম বিজয়। বীরের আত্মত্যাগ ও মাতা, জায়া ও কন্যার অশ্রুধারার বিনিময়ে 'বাঙালীর পণ' 'বাঙালীর আশা সত্যে' পরিণত হয়।

## উপসংহার

কিন্তু সত্যই কি তাই? ভাঙ্গা বাঙলা কি জোড়া লাগিয়াছে?

বঙ্গ-ভঙ্গের সিদ্ধান্ত যখন ঘোষিত হয়, তখন সমগ্র বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর বাঙলা প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। ইতিপুর্বে আসামও শাসনব্যাপারে বাঙলার সহিত যুক্ত ছিল; কিন্তু ১৮৭৪ সালে বঙ্গভাষী জেলা শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে আসামের সহিত একত্র করিয়া এক নূতন প্রদেশ গঠিত হয়। বৃটিশ শাসনের সেই প্রথমাবস্থায় ইহার সুদূরপ্রসারী কুফল বাঙ্গালী উপলব্ধি করিতে পারে নাই প্রথমত রাজনীতিক সচেতনতা ও আন্দোলনের অভাবে এবং দ্বিতীয়ত বাঙলার বৈষয়িক, সাম্প্রদায়িক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা তখনও তত উগ্র ও জটিল হইবার অবকাশ হয় নাই—এই জন্য। শিক্ষার প্রসারের সহিত স্বাভাবিকভাবে যখন সাধারণের আশাআকাঙ্ক্ষার বিস্তার ঘটিতে থাকে অথচ তাহার আত্মপ্রকাশের সামান্য পথও অবরুদ্ধ এবং শাসকদের বিরোধিতায় তাহা অধিক মাত্রায় সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, তখনই রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তিভূমি গড়িয়া উঠে। কিন্তু বাঙলার সাধারণ হিন্দু বা মুসলমান একভাবে গড়িয়া উঠে

নাই, তাহাদের স্বার্থও এক ছিল না ; উভয়ের শিক্ষাদীক্ষা ও বৈষয়িক অগ্রগতিও সমভাবে হয় নাই ; কাজেই পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে রাজনীতিক আন্দোলন খণ্ডিত হইয়া পড়ে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উহারই সুযোগ লইয়া বাঙালী তথা ভারতবাসীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষ ঢুকাইয়া দেয় এবং উহাকে নানাভাবে পুষ্ট ও প্রসার করিতে থাকে। ইহারই প্রথম দফা হিসাবে মর্লে-মিণ্টো শাসনসংস্কার রূপ সাম্প্রদায়িক মাকাল ফল ভারতীয় রাজনীতিতে আমদানী করা হয়।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন বুঝিতে পারে যে, শাসনসংস্কার বিলম্বিত এবং এমন-কি দেশবাসীর পক্ষে বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছে, অধিকন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনই ভারতের বৃহত্তর স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হইয়াছে, তখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বদ করা ছাড়া তাহাদের আর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্য-রক্ষার ব্যাপারে সর্বত্র ঘোরতর কূটকৌশলের পরিচয় দিয়াছে, প্রতিকূল অবস্থার সহিত অবস্থানুযায়ী সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে। তাই 'কায়েমী ব্যবস্থা' রদ করিতে সম্মত হইয়াও তাহারা বাঙলাকে জোড়া দিবার অছিলায় পঙ্গু করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করে। উহার একই সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে যেমন তাহারা সাম্প্রদায়িক ভেদ-রেখা টানিয়া দেয়, তেমনি বঙ্গভঙ্গ রদের কথাও ঘোষিত হয়। বঙ্গ-ভঙ্গের সময় রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সহিত যুক্ত করিয়া পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয় এবং অবশিষ্ট প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ সহ বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর বাঙলা নামে পরিচিত হয়। এবার পাঁচটি বিভাগ সহ অখণ্ড বাঙলা প্রদেশ গঠিত হয়। অথচ ইহারও মধ্যে বিরাট ফাঁকি থাকিয়া যায়। বাঙলাকে ভাষা, নৃতত্ত্ব বা সংস্কৃতির দিক হইতে প্রদেশ হিসাবে আদৌ গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হয় না ; পক্ষান্তরে বাঙলাকে খণ্ডিত ও বিভক্ত রাখিয়া উহাকে সমগ্রভাবে নিস্তেজ এবং বাঙালীর অখণ্ড মানসসত্ত্বা ও জাতীয় চেতনা বিনাশের ভূমিকা

রচনা করা হয়। বাঙলার উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় তিনটি বঙ্গ-ভাষী জেলা যথা শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া পূর্ববৎ আসামের মধ্যেই থাকিয়া যায়। ঐ গুলিকে বাঙলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগসুবিধা উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার সদ্ব্যবহার করা হয় না; আবার উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম বাঙলার পূর্ণিয়া, মানভূম, সিংভূম, সাওতাল পরগণা প্রভৃতিকে বিহারের সহিত জুড়িয়া রাখিয়া নূতন প্রদেশ গঠনের সহায়তা করা হয়। কিন্তু ইহার ফল দাঁড়ায় এই যে, বাঙালী জাতি ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিতত্ত্বের দিক হইতে তিনটি স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত হইয়া যায়। তাহারা অখণ্ড জাতীয় ক্রমবিকাশের উৎসধারা হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজেদের না পারে অনগ্রসর গোষ্টির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইতে, না পারে নিজেদের সাংস্কৃতিক সত্তাব বিকাশ ও বিস্তার করিতে; মূল বাঙলা দেশের বাঙালীরাও ইহাদিগকে আর আত্মজ বা আত্মীয় বলিয়া অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়া নিতে দ্বিধা করে। ইহাতে ভিন্ন প্রদেশে বাঙালীপণার প্রতিষ্ঠাও যেমন সম্ভবপর হয় নাই, তেমনি বাঙালীপণার পূরা উচ্ছেদও ঘটে নাই। ফলত ইহাদের ত্রিশঙ্কুর অবস্থা ঘটিয়াছে। মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে কাণ্ডের যে রূপান্তর ঘটে, আসাম বা বিহারের বাসিন্দা বাঙালীদেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। অধিকন্তু বাঙালী চরিত্রে নূতন পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের নানা সদগুণ বর্তমান থাকিলেও তাহার পক্ষে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পরিহার করা অথবা বিহারী বা অসমিয়াদের অনুকারী হওয়া তেমন পোষায় নাই। কিন্তু বাঙলার মাটির সহিত যোগসূত্র সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিতে পারে নাই বলিয়াও তাহারা খাঁটি বঙ্গীয় সংস্কৃতি ও ভাষা অমলিন রাখিতে পারে নাই। বঙ্গভঙ্গ রদ হইলেও বাঙালী জীবনে ইহাই সর্বাপেক্ষা ক্রূর অভিশাপ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও উল্লেখ প্রয়োজন। আসামের অন্তর্ভুক্ত বাঙলার তিনটি জেলা শস্য ও জনসমৃদ্ধ এবং বিহারের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল সমূহও

খনিজ সম্পদ ও লোকসংখ্যায় পূর্ণ। কাজেই এই সব অংশকে বাঙলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখায় ঘাটতি প্রদেশ বাঙলার রাজস্বের ক্ষতিও যেমন হইয়াছে, তেমনি হইয়াছে তাহার শিল্পোন্নয়নে ও স্থায়ী উন্নতি বিধানের পথে অন্তরায়। এদিকে যে-কলিকাতা বৃটিশশাসনের গোড়া হইতেই ভারতের রাজধানী বলিয়া কীর্তিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় প্রাদেশিক রাজধানী হিসাবে উহার মর্যাদা ও গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়।

এই সব কারচুপির দিকে কাহারও দৃষ্টি যে না পড়িয়াছিল, এমন নহে। কিন্তু তখন দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন, সরকারী অত্যাচার ও রক্তমোক্ষণে বাঙ্গালী জাতি অবসন্ন; আর নূতন করিয়া আন্দোলনের ক্ষমতাও জাতির ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই অনুকূল অবসরে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হওয়ার কথা ঘোষিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসী তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে; এমনকি অনেকে জয়ের গর্বেও উল্লসিত হইয়া উঠে; কিন্তু প্রকৃত বিচারে এবং এমন-কি আধুনিক মানদণ্ডেও ইহার গলদ সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। অবশ্য বলাই বাহুল্য, বাঙ্গালী বিপ্লবী তরুণ দল ইহার মধ্যে বৃটিশ শাসকের শঠতা ও কারসাজি ধরিয়া ফেলেন; কিন্তু নরমপন্থীরা ইহাকেই আন্দোলনের সাফল্য বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করেন ও দেশবাসীকে ধৈর্য ধরিতে অনুরোধ জানান; কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির মাহেন্দ্রক্ষণ তখন অতিক্রান্ত। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও উত্তরোত্তর জটিলতর হইতে থাকে; প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের নানা লক্ষণ তখন হইতে প্রকট হইতে সুরু করে। এহেন অভূতপূর্ব সুযোগ দেখিয়া তরুণ সম্প্রদায়ও ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপক প্রচেষ্টায় নবোদ্যমে আত্মনিয়োগ করেন।

এই দিক হইতে বিচার করিয়া বলা যায় যে, সিপাহী অভ্যুত্থানের পর স্বাধীনতা আন্দোলনে ইহা এক নূতন ধাপ।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় মোহাবিষ্ট যে-বাঙ্গালী সিপাহী অভ্যুত্থানকালে

স্বসমাজের চাকরিবাকরি ও সাংসারিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া নিবার চেষ্টা করে, তাহাকেই সারাভারতে নূতন আন্দোলন ও শাসকশক্তির সহিত প্রকাশ্য সজ্ঘর্ষে পথপ্রদর্শক হইতে হয়। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ, বয়কট, সরকারী শিক্ষায়তন বর্জন ও জাতীয় ভাবধারাপুষ্ট নূতন শিক্ষামন্দির গঠন, শিল্পসংগঠন ও স্বদেশীমন্ত্র প্রচার তাহারই মস্তিষ্ক-সম্ভূত। অধিকন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে সাফল্য লাভ করিয়া এবং উহাকে উপলক্ষ করিয়া ভারতবাসী বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রতী হইবার দুঃসাহসিক উপায় অবলম্বন করে। এই দিক হইতে বাঙালী যুবকরা গুপ্ত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মারফৎ সমগ্র উত্তর ভারতে স্বাধীনতার হোমশিখা প্রজ্বলিত করেন। ইহার ফলে বাঙলার সহিত বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের ধীরে ধীরে রাজনীতিক ও সামাজিক একাত্মতা ও সখ্যবন্ধন দৃঢ়তর হইতে থাকে।

এইভাবে মুক্তি আন্দোলনে নব রূপায়ন ঘটে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সমগ্র-ভাবে উহা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আন্দোলন। বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের হিন্দু ও মুসলমান ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দুরা বেশিসংখ্যায় উহাতে যোগ দেয়। ইহার কারণ এই যে, শাসক সম্প্রদায়ের সহিত চাকরি ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তাহাদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হয় এবং পরোক্ষেও সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে নূতন উমেদার ও প্রতিযোগীর আবির্ভাব ঘটায় তাহাদের মধ্যে বেকার সমস্যা ও আর্থিক অনটন দেখা দেয়। ইহারই সহিত সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি যুক্ত হওয়ায় অবস্থা অসহ হইয়া পড়ে। অবশেষে হতমান বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী বঙ্গ-ভঙ্গকে উপলক্ষ করিয়া বৃটিশের চাপান অন্যায় ও অপমানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়।

উল্লেখ প্রয়োজন, সরকারী চাকরিতে শুধু মাদ্রাজী বা বোম্বে-ওয়ালাই শিক্ষিত বাঙালীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করেন না; পাঞ্জাবী

শিক্ষিত মুসলমানও উঁহাদের সহিত এই ব্যাপারে যোগ দেন। অর্থাৎ প্রতিযোগিতা ত্রিমুখী হয়। সরকারও শাসন-ব্যবস্থায় ভেদনীতির প্রয়োগ-কালে ইঁহাদের স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধিকল্পে নিয়োগ করে এবং তাঁহাদিগকে বাঙলার শাসনক্ষেত্রে আমদানী করিয়া সাম্প্রদায়িকতা প্রসারের ব্যবস্থা পাকা করে। কাজেই দেখা যায় যে প্রথমদিকে বাঙলায় ভেদনীতি প্রচারের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন চাকুরিয়া শিক্ষিত পাঞ্জাবী মুসলমান যতটা দায়ী, অনগ্রসর বাঙালী মুসলমানকে ততটা মোটেই দায়ী করা যায় না। শুধু তাহাদের মধ্যে অভিজাত জমিদার শ্রেণীভুক্ত মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ গবর্ণমেণ্ট-ঘেঁষা ব্যক্তি সরকারী ইঙ্গিতে সমগ্র জাতিকে ভেদপঙ্কিল করিয়া তুলিবার প্রয়াস করে; কিন্তু সাধারণ মুসলমান তখনও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে সমগ্র বিষয় দেখিতে অভ্যস্ত হয় নাই বলিয়া আত্মপরায়ণ জনকয়েক অভিজাত মুসলমানের দুরভিসন্ধিও ব্যর্থ হইয়া যায়।

যাহা হউক, স্বদেশী আন্দোলনের জন্যই দেশের শিল্পোন্নয়ন ও বৈষয়িক প্রগতির পথও প্রস্তুত হয়। আন্দোলন না হইলে মানচেষ্টারের সহিত প্রতি-যোগিতায় বোম্বাই-এর নবীন বস্ত্র-শিল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত না; বাঙলা ও অন্যান্য প্রদেশের স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠার আদৌ উদ্যম দেখা যাইত কিনা সন্দেহ।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রথমদিকে বৃটিশ শাসনের নাগপাশ হইতে বন্ধন-মুক্তির আন্দোলন ছিল বলিয়া মনে হয় না; আন্দোলনের স্বরূপ ধাপে ধাপে স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে মাত্র; মুখ্যত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সহিত শাসক সম্প্রদায়ের বিরোধের মধ্যেই ইহার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটে। সিপাহী অভ্যুত্থানকালে যেমন শাসনক্ষমতা দখলের জন্য একটা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন ও অভ্যুত্থান হয়, বঙ্গ-ভঙ্গে তেমন কোন অখণ্ড প্রচেষ্টা ছিল না, সর্বভারতীয় আন্দোলনেও উহা রূপান্তরিত হয় নাই। ইহা প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক

সংগ্রাম ছিল। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন শাসকদের হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের অভিযান; কিন্তু কালক্রমে ইহাই মুক্তি-আন্দোলনের পটভূমি হইয়া দাঁড়ায়। বাঙলার দুঃসাহসী তরুণ সম্প্রদায় এই হেতু 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার'-এর উত্তাল তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া অজানার সন্ধানে পাড়ি জমায়। সেদিনের যাত্রাপথ একান্তভাবে কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্যোগময় ছিল।

---

# অহিংস অসহযোগ আন্দোলন

বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হওয়ায় আমলাতন্ত্রের চাপান স্বেচ্ছাকৃত একটা অন্যায়ের প্রতিকার হয় বটে, কিন্তু মুক্তি-পথাশ্রয়ী বাঙালী সাধকরা ইহাতে আদৌ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদের অন্তরে স্বাধীনতালাভের যে অংমলিন হোমশিখা একদা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই তাঁহাদিগকে আরও সম্মুখপানে পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। এই হেতু নবোদ্ভূত আন্দোলনের গতিতে সাময়িকভাবে কিঞ্চিৎ ভাটা পড়িলেও সমগ্রভাবে মুক্তি-আন্দোলনের গতিবেগ স্তব্ধ হইয়া যায় না। বরং বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়া যেসব শক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল, তাহার সহিত নূতন পরিকল্পনার সংযোগ ও সমন্বয় ঘটায় আন্দোলনের আঞ্চলিক রূপ সর্বভারতীয় মর্যাদা লাভ করে; অর্থাৎ অন্যায় প্রতিকারের আন্দোলন মুক্তি-আন্দোলনে পর্যবসিত হয়; জাতির খণ্ড কর্ম-প্রচেষ্টা অখণ্ড জাতীয় জীবনধারার মধ্যে বিস্তার লাভ করে। জাতিদেহে নূতন শোণিত সঞ্চার হয়।

ভারতীয় রাজনীতিক আন্দোলন যখন নূতন কর্ম ও ভাবধারাকে আশ্রয় করিয়া পুষ্ট হইতেছিল, তখন বাহির-বিশ্বের প্রবাসী ভারতসন্তানদের অবস্থা যৎপরোনাস্তি শোচনীয় হইয়া উঠে। অবশ্য এই অবস্থা একদিনে হয় নাই, তাহাও সত্য। তাহাদের শ্রমজাত সম্পদে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার লাভবান এবং সেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও তাহারা কদাপি শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নিকট বাঞ্ছিত শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইতে পারে নাই; পক্ষান্তরে তাহাদিগকে শাসক সম্প্রদায়ের প্রতিযোগী ও তাহাদের বৈষয়িক উন্নতির পরিপন্থী বিবেচনা করিয়া ভারতীয়দের উচ্ছেদের ব্যবস্থা হইতে থাকে। এই ব্যাপারে একদিকে

কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন তাহাদিগকে অনাহূত অতিথি বলিয়া গণ্য করিতে থাকে অন্যদিকে তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে মোটেই সুনজরে দেখিতে পারে নাই; বরং প্রবাসী ভারতীয়দের উপর উত্তরোত্তর আইনের নামে চূড়ান্ত জুলুমবাজী ও বর্ণবিদ্বেষের প্রশ্রয় দেওয়া হইতে থাকে। ইহার জন্য মূলত ভারতের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও আন্তর্জাতিক স্বার্থসঙ্ঘাতই দায়ী।

এই সময় ইউরোপে ইংল্যাণ্ড ও জার্মানী প্রথম শ্রেণীর শক্তি; তাহাদের মধ্যে তখন স্বার্থ-বিস্তার ও প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অথচ স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যেই শুধু কমবেশি হইয়া প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকে নাই; তাহাদের অনুচর, প্রভাবাধীন এবং পরাধীন দেশগুলিও উহা দ্বারা কম প্রভাবিত হয় নাই। আত্মরক্ষা ও আত্মস্বাতন্ত্র্যের ভাব প্রত্যেক রাষ্ট্রে প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের জাতিগত স্পর্ধাই হইয়া উঠে সর্বাধিক প্রবল। অথচ অনুন্নত ও কৃষ্ণাঙ্গ-অধ্যুষিত দুর্গম এই দেশের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি প্রধানত ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্যোগ, অধ্যবসায় এবং সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হয়। কিন্তু সম্পদলাভের পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইবার সঙ্গে সেই ভারতীয়দিগকেই নানাভাবে হতমান এবং বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে পক্ষপাতমূলক বিধান রচিত হইতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ক্ষতিপূরণ বা জাতিগত মানঅপমানের প্রশ্নে স্বাধীন রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট দেশের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারে। কিন্তু দাসজাতি সেসুবিধায় বঞ্চিত; প্রতিকারের জন্য প্রভুশক্তির উপর সে একান্ত নির্ভরশীল। এদিক হইতে ঘরোয়া সমস্যায় বিব্রত ভারতবর্ষ প্রবাসী সন্তানদের সমস্যায় ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই অসঙ্গত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হোয়াইট হলের এজেণ্ট ভারত সরকার ত নহেই, সার্বভৌম বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও তেমন কোন সক্রিয় ব্যবস্থা

অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করে নাই। ইহার ফলে নিগ্রহকারী শ্বেতাঙ্গ দেশগুলি পরোক্ষে প্রবাসী ভারতীয়দের উপর অত্যাচারের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়াইতে বরং উৎসাহিতই হয়।

পক্ষান্তরে একই সময়ে এসিয়াবাসী অন্যান্য স্বাধীন জাতিগুলির প্রতি পূর্বোক্ত সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্টগুলি সন্ত্রমপূর্ণ আচরণ করিতে বাধ্য হয়।; অথচ সমগ্রভাবে এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে আইনের খসড়া রচিত হইলেও তাহা কার্যত ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইতে থাকে। কেননা চীনা বা জাপানীরা এশিয়াবাসী হইলেও তাহাদিগকে স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়; এবং আইনের প্রয়োগক্ষেত্রেও তাহারা সুবিচার ও সঙ্গত ব্যবহার দাবী করিতে সক্ষম হয়। অথচ প্রাচীনতর ও শ্রেষ্ঠতর সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ভারতীয়রা সে সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়। কাজেই জাতি হিসাবে তুলনামূলক বিচারে প্রবাসী ভারতীয়রা নিজেদের অসহায় অবস্থা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে থাকে এবং প্রতিকারের উপায় অন্বেষণে রত হয়; তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, স্বদেশ পরবশ বলিয়াই দেশে ও বিদেশে ভারতবাসীর অপমান ও লাঞ্ছনা। কাজেই ভারতীয় সমস্যা সর্বত্র এক এবং ভারতের দাবীও অখণ্ড বলিয়া তাহাদের নিকট প্রতিভাত হয়। তাহাদের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিতে থাকে যে, ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি অর্জনের সঙ্গে সকল দুঃখের অবসান ঘটিবে।

বৈদেশিক রাষ্ট্রে দাস-ভারতের অমর্যাদা এবং প্রবাসী ভারতবাসীর দুর্গতি সম্পর্কে কংগ্রেস যে অবহিত না ছিলেন এমন নহে। কিন্তু নরমপন্থী-কবলিত কংগ্রেস শুধু প্রবাসী সন্তানদের দুরবস্থার প্রতি সমবেদনা এবং ক্ষেত্রবিশেষে কাগজেপত্রে প্রতিবাদ জানান ছাড়া অন্য কোনরূপ ব্যবস্থাই করিতে পারেন না। অবশ্য এ সম্পর্কে ভারত সরকারকে সজাগ করিবার সাধু প্রচেষ্টাও হয়। কিন্তু ভারত সরকারের নিকট কংগ্রেসের তৎকালে কোন

প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা ছিল না; অধিকন্তু হোয়াইট হলের নির্দেশে চালিত ভারত গবর্ণমেণ্ট শ্বেতাঙ্গস্বার্থের যূপকাষ্ঠে প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থবলি হইতে দেখিয়াও তেমন উচ্চবাচ্য করে নাই।

একদিকে কংগ্রেসের আত্মবঞ্চনা এবং অন্যদিকে ভারত সরকারের প্রবঞ্চনা যাহাদের তৃপ্তি দিতে পারে নাই, সেই মুক্তিকাম নবীন-প্রবীণের দল সুরাটের দক্ষযজ্ঞের পর হইতে সংঘর্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের পথে ভারতের রাষ্ট্রিক মুক্তি-সাধনার স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করেন। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধীনতালাভের চেষ্টা তাঁহারা সর্বোপায়ে পরিহার করেন। উহার পরিবর্তে রক্তক্ষয়ী আহবের পথই তাঁহাদের নিকট প্রশস্ততর বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই শস্ত্রপাণি মুক্তি-সাধকের দল বাঙলার সজ্ঘর্ষকে ভারতের সংগ্রামে রূপান্তরিত করার আয়োজন করিতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা দেশের সমুদয় বৈপ্লবিক শক্তি ও বহিরাগত বিদ্রোহী অংশকে একত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া উহাদের সমন্বয় সাধন করেন; তাঁহারা দেশব্যাপী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মারফৎ বৃটিশ শক্তির নিকট হইতে শাসনক্ষমতা দখল করার বিপুল উদ্যম করেন। এইভাবে সিপাহী অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া হইতে উদ্ভূত সমুদয় অবসাদ ও বিভ্রম পরিহার করিয়া ভারতবাসী রাজশক্তি অধিকারের সংগ্রামে মরণপণ করে।

এই ব্যাপারে তাঁহারা যে উদ্যোগ আয়োজন করেন তাহার ফলেই মুক্তি আন্দোলন কয়েক ধাপ আগাইয়া যায়; প্রকৃতপক্ষে একথা বলা হয়ত অত্যুক্তি হইবে না যে, পরবর্তীকালে বৃটিশ-বিরোধী তৎপরতার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের যে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তৎকালে কংগ্রেস নিষ্ক্রিয় থাকায় বিপ্লবীরাই সেই মহৎ কর্তব্য সাধনের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টার জন্যই বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা মূলত একটা অখণ্ড আন্দোলনের রূপ

পরিগ্রহ করে। ইহার ফলে একদিকে তৎকালীন কংগ্রেসী নেতৃত্বের ব্যর্থতা অন্যদিকে বিপ্লবী শক্তির চূড়ান্ত অভ্যুদয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ভারতে যখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই, তেমনি সময়ে শ্রেষ্ঠতর মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা মুক্তি-অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ইহাই বিপ্লবীদের সর্বোত্তম অবদান, ইহাই তাঁহাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা।

## বিভিন্ন বৈপ্লবিক ধারার মিলন

যে-শক্তিনিচয়ের সমবায়ে জাতীয় আন্দোলনে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাদের উৎপত্তি ও পরিণতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

এই সময় চারটি প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক ধারা মুক্তি-আন্দোলনের সাগর সঙ্গমে আসিয়া মিলিত হয়। ইহাদের দুইটি আসে বহির্ভারতীয় প্রবাসী ভারতবাসীদের নিকট হইতে, এবং অপর দুইটির উদ্ভব হয় আভ্যন্তরীন রাজনীতির ঘাতপ্রতিঘাত হইতে। একদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাপ্রবাসী ভারতবাসী, অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারত-সন্তান বৈদেশিক রাষ্ট্রে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইয়া পরাধীনতা হইতে চিরতরে মুক্তির আশায় সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দল সশস্ত্র বিপ্লবে এবং দ্বিতীয়োক্ত দল অভিনব নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বা গবর্ণমেন্টের সহিত অসহযোগের পথ গ্রহণ করেন। কার্যক্রমের দিক হইতে উভয় দলের মধ্যে মূলগত প্রভেদ থাকিলেও ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁহাদের শক্তি-সংযোগ ঘটায় আন্দোলনের গতিবেগ দুর্বার হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে তৎকালীন কংগ্রেসের মধ্যে যেসব বামপন্থী ছিলেন, তাঁহাদের সহিত অ্যানি বেশান্তের 'হোমরুল' আন্দোলনের যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় কংগ্রেসী আন্দোলনও

নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমান শ্রেণীর মধ্যেও নবচেতনার উদ্ভব হওয়ায় ভারতীয় রাজনীতিতে এক নূতন পর্যায় আরম্ভ হয়।

পরবর্তীকালে বহিরাগত ও আভ্যন্তরীন এই চারিটি নবোদ্ভূত শক্তি কংগ্রেসের মধ্যে নিজেদের সত্ত্বা মিশাইয়া দেয়; কংগ্রেসও উহাদের সকলকে গ্রহণ ও আত্মসাৎ করিয়াই বিপুল গণ-আন্দোলনের পীঠস্থানে, জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকল মুক্তিকাম ভারতবাসীর সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

## গদর আন্দোলন

এই সম্পর্কে প্রথমেই গদর আন্দোলনের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য।

বৃটিশ-শাসিত ভারত সিপাহী অভ্যুত্থানের পর হইতে নির্মমভাবে শোষিত হইতে থাকে। ইহার ফলে ভারতবাসীর বৈষয়িক জীবন অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে। এই হেতু বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে পাঞ্জাবের বহু কিষাণ শিখ বিদেশে, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জীবিকান্বেষণে ছড়াইয়া পড়ে।

বৈদেশিক শাসনের বন্ধ্যারূপ তখন ভারতের সর্বত্র পরিস্ফুট: কৃষিপ্রধান পাঞ্জাবের দুর্গতি নানাভাবে প্রকট, তাহার আর্থিক ও সামাজিক বনিয়াদ বিধ্বস্তপ্রায়; গ্রাম্য ও সহুরে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংসমুখী; লোকের জীবিকার উপায় সঙ্কুচিত; এই হেতু কৃষির দিকে সকলে বেশিমাত্রায় ঝোঁক দেওয়ায় জমির উপর স্বভাবতই অতিরিক্ত চাপ পড়ে। কিন্তু জমির উৎপন্ন ফসলে অনেকেরই পেট ভরে না। ইহার উপর খাজনার বোঝা, সাবেক ঋণের সুদ, আর নূতন কর্জে কষ্টসহিষ্ণু সাধারণ কিষাণও অস্থির হইয়া উঠে। বাধ্য হইয়াই বহুশতাব্দীর ভিটামাটির মায়া ছাড়িয়া বহুদুঃখে মধ্য পাঞ্জাবের কিষাণরা

কর্মতৎপরতা প্রসারকালে তাঁহারা সকল শ্রেণীর ভারতীয়ের সংস্পর্শে আসেন এবং বুঝিতে পারেন যে, পাঞ্জাবী কিষাণরাই সর্বাধিক রাজনীতি-সচেতন। কাজেই শিখ গুরুদ্বারগুলি শীঘ্রই ভারতীয়দের রাজনীতি আলোচনার ও কর্মের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। কানাডার ষ্টকটন, ভ্যাংকুবার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্ণিয়া, ওয়াশিংটন, ওরেগন প্রভৃতি স্থানের ভারতবাসীরা এক নূতন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে থাকে। উহাকে কার্যক্ষেত্রে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য এক সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়।

১৯১৩ সালের ১৩ই মার্চ; মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল; অ্যাষ্টোরিয়াতে ১২০ জন ভারতবাসীর এক সভায় নূতন আন্দোলনের কার্যক্রম স্থির হইবার পর পুনরায় ১লা নভেম্বর সান ফ্রান্সিস্কোতে এক অধিকতর প্রতিনিধিমূলক বৈঠক হয়। তাহাতে পূর্ববৈঠকে গৃহীত কার্যসূচী অনুমোদিত হয়; আর সুচারুরূপে কার্য-নির্বাহকল্পে সভাস্থলে ১৫ হাজার ডলার চাঁদা সংগৃহীত এবং আমেরিকার হিন্দীসঙ্ঘ স্থাপিত হয়। অধিকন্তু, ১৮৫৭ সালের ভারতে সিপাহী অভ্যুত্থানের নামানুকরণে উর্দু, হিন্দী, গুরুমুখী ও মারাঠী ভাষায় 'গদর' নামক দলের এক মুখপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। সোহন সিংহ ভাখ্না এবং লালা হরদয়াল যথাক্রমে দলের সভাপতি ও সম্পাদক এবং লালা হরদয়াল পত্রিকার সম্পাদক পদে বৃত হন। ইহাই 'গদর দল' প্রতিষ্ঠার ইতিকথা।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় দলের ৭২টি শাখাসমিতি স্থাপিত হয় এবং কানাডা, মালয়, জাপান, চীন, ফিলিপাইন ও আর্জেন্টিনার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে 'গদর' পত্রিকার বিপুল প্রসার ঘটে। পত্রিকা পরিচালনা করিয়াই দল সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই, অন্যান্য দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সহিতও দলের যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। এমনি করিয়া গদর দল এক বিরাট আন্দোলনের রূপ ও ভূমিকা গ্রহণ করে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রথমাবধি গদর আন্দোলনকে আদৌ সুনজরে দেখিতে পারে নাই ; কাজেই উহার উপর তাহাদের শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। প্রথম দিকে তাহারা দলকে লোকচক্ষে হেয় ও নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে চিরাচরিত নানা জঘন্য উপায় অবলম্বন করে। ঐসব অপকৌশল ব্যর্থ হওয়ায় তাহারা দলের অন্যতম নায়ক লালা হরদয়ালকে ১৯১৪ সালের মার্চে 'অবাঞ্ছনীয়' বলিয়া গ্রেপ্তার করায়। এই সময় মহাযুদ্ধ আসন্ন।

কিন্তু লালাজীকে জামিনে খালাস করিয়া কৌশলে সুইজারল্যাণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে দল হইতে প্রদত্ত জামানতের টাকা জব্দ হয় বটে, কিন্তু দলের উপর বৃটিশ সরকারের প্রথম আঘাতও ব্যর্থ হইয়া যায়।

এই ব্যাপারের পর হইতে আরম্ভ হয় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ও শক্তি-পরীক্ষার পালা। এক্ষেত্রে কানাডার বিদেশী নিয়ন্ত্রণ আইন উপলক্ষ হইয়া উঠে।

কানাডায় যেসব ভারতীয় বসবাস করিতেছিল, তাহাদের ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন কানাডায় পৌছিলে তাহাদিগকে বিদেশী নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ভারতে ফেরৎ পাঠান হইতে থাকে। ভারতবাসী এই অসঙ্গত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় ; কিন্তু কোন ফল হয় না। এদিকে বিশিষ্ট জনকয়েক ভারতীয়কে লইয়া গঠিত এক প্রতিনিধিদল এই ব্যাপার সম্পর্কে ভারত সচিবের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করেন ; কিন্তু তাঁহাদিগকে সাক্ষাতের অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হয় না। ইহাতে ভারতবাসীর আত্মমর্যাদায় নিদারুণ আঘাত লাগে, তাহাদের জাতীয় সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। এমনকি এই বিষয় তাহাদের নিকট জাতীয় প্রশ্নরূপে দেখা দেয়।

প্রবাসী ভারতীয় মাত্রই এই ব্যাপারকে ভারতের প্রতি 'চ্যালেঞ্জ' বলিয়া গ্রহণ করে। তাহারা কিছুতেই ইহাকে নতমস্তকে মানিয়া নিতে পারে না। কাজেই দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চলের বহু ভারতবাসী মালয়ের বিখ্যাত ঠিকাদার বাবা গুরুদিৎ সিংহের নেতৃত্বে 'কোমাগাতা মারু' নামক এক

৮ হাজার গদরী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন ; কিন্তু সরকার ইঁহাদের সায়েস্তা করিবার উদ্দেশ্য ৪ শত জনকে আটক ও ২৫ শতকে অন্তরীন করে এবং অবশিষ্টের পিছনে চর লাগায়। কাজেই গদরীরা ভারতে ফিরিয়া যেভাবে প্রথমে কার্যারম্ভ করিবেন বলিয়া পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা সরকারের আকস্মিক আঘাতে বিপর্যস্ত হইয়া যায়।

ইহাতে তাঁহারা কিন্তু আদৌ দমেন নাই ; বরং প্রত্যাগত গদরীদের মধ্যে অনেকে আত্মগোপন করিয়া বৈপ্লবিক সংগঠন করিতে থাকেন। এই হেতু অর্ধেক গদরীর খোঁজ পুলিশ রাখিতে পারে নাই। আর কর্তার সিংহ, পিংলে, কাশীরাম, জগৎরাম প্রভৃতি এবং ট্রেন হইতে পলায়িত পৃথ্বীসিংহ এবং অন্তরীনাবদ্ধ নেতৃবর্গ বিপ্লবের প্রসার ও সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন।

ধীরে ধীরে পাঞ্জাবের শিখ গুরুদ্বারসমূহ বৈপ্লবিক ঘাঁটিতে রূপান্তরিত হইতে থাকে। তাহা ছাড়া গ্রাম্য সংগঠন ও গেরিলা দল গঠনের মধ্য দিয়াও বিপ্লবীদের তৎপরতা বাড়িয়া চলে। এহেন অবস্থায় সৈন্যদলে বিপ্লব প্রসারের এক অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হয়।

সিপাহী অভ্যুত্থানের পর পাঞ্জাবী সৈন্যবাহিনীই প্রধানত ভারতীয় বাহিনীর মেরুদণ্ড বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে পেশাদার বা বংশপরম্পরায় সৈনিক। কাজেই দেশের স্বার্থের চেয়ে বৃটিশ আনুগত্যই তাহাদের অনেকের নিকট অধিকতর মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এরূপ আজ্ঞাবহ সৈন্যদলও বিচলিত হইয়া উঠে ; তাহাদের মধ্যেও প্রবল অসন্তোষ প্রকট হয়।

য়ুরোপীয় রণাঙ্গনে তখন নিদারুণ সঙ্কট ; মেসোপটেমিয়ার অবস্থা মন্দ ; জার্মাণ আক্রমণের মুখে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনা টলটলায়মান : কাজেই ভারতীয় সৈন্যদিগকে সঙ্কটত্রাণের জন্য সম্মুখ সমরে পাঠাইবার প্রয়োজন হয়। ইহাতে তাহাদের মধ্যে একদিকে যেমন প্রাণসংশয়ের প্রবল সম্ভাবনা দেখা

দেয়, অন্যদিকে তেমনি সরকারী পক্ষপাতমূলক নীতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহাতে ভারতীয় সৈন্যরা চঞ্চল হইয়া পড়ে ; কাজেই বিদেশীর জন্য বিদেশে প্রাণত্যাগের চেয়ে স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ হওয়া তাহারা শ্রেয়তর বলিয়া বিবেচনা করিতে থাকে। এদিকে দক্ষিণপূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের মধ্যেও নানাকারণে বিক্ষোভ জন্মে।

সৈন্যদল ও পাঞ্জাবী কিষাণদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে কী করিয়া মুক্তি আন্দোলনের অনুকূল খাতে প্রবাহিত করা যাইতে পারে, তাহার প্রতি প্রবাণ বিপ্লবী ও বিশেষভাবে গদরীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

পাঞ্জাবী হিসাবে পাঞ্জাবী সৈন্যদলে বিদ্রোহাত্মক ও বৃটিশবিরোধী চেতনার প্রসার ঘটাইবার সুযোগ গদরীদের যেমন ছিল, প্রদেশান্তর হইতে আগত বিপ্লবীদের তেমন সুবিধা ছিল না। কাজেই বাঙলা ও যুক্তপ্রদেশের অভিজ্ঞ বিপ্লবী দলসমূহ তাঁহাদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সেনাবাহিনীর মধ্যে অভ্যুত্থানের পথ সুগম করিতে থাকে।

বঙ্গ-ভঙ্গ রদের পর বাঙলার বিপ্লবীরা কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতাদের মত আত্মতুষ্টিবশে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকেন নাই। তাঁহারা মহাভারতের মুক্তি-কল্পে বৈপ্লবিক চিন্তা ও তৎপরতার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। এদিকে আসন্ন মহাযুদ্ধের ঘনঘটা দেখিয়া পূর্বাহ্ণে দ্রুততালে প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজনও তাঁহারা উপলব্ধি করেন। এই হেতু কার্যসিদ্ধিকল্পে তাঁহারা প্রধানত উত্তর ভারতের যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে ছড়াইয়া পড়েন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের এহেন সন্ধিক্ষণে অনুশীলন ও যুগান্তর দল সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রয়োজন বুঝিয়া অদ্ভুতকর্মা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির ( 'বাঘা যতীন' ) নেতৃত্ব মানিয়া নেয় এবং নরেন্দ্র ভট্টাচার্য ( মানবেন্দ্র নাথ রায় ), রাসবিহারী বসু ও শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁহার অন্যতম প্রধান

সহকারী হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। শেষোক্ত দুই জনের উপর উত্তর ভারতের দল সংগঠনের ভার অর্পিত হয়। তাঁহারা যুদ্ধারম্ভের কিছুকাল পূর্ব হইতেই পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে পূর্ণোদ্যমে বৈপ্লবিক সংগঠনে লিপ্ত হন।

এতকাল বিপ্লবীরা মধ্যবিত্ত ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যেই কাজ করিয়া আসিতেছিলেন; এবার তাঁহারা নবাগত শক্তি গদরীদের সংস্পর্শে আসেন এবং সম্মিলিতভাবে সৈন্যবাহিনী ও কিষাণদের মধ্যে বৈপ্লবিক সংগঠন শুরু করেন। কিন্তু পূর্বপূর্ববারের চেয়ে তাঁহাদের কার্যপ্রণালী এবার ভিন্নপথ ধরিয়া চলে। গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসমূলক তৎপরতার পরিবর্তে তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাইবার উদ্যম করেন। সিপাহী অভ্যুত্থানের প্রায় ৬০ বৎসর পর ইহাই রাজশক্তি হস্তগত করার প্রথম ব্যাপক আয়োজন।

পুরাতন বিপ্লবীদের অভিজ্ঞতার সহিত নবীন বিপ্লবীদের উদ্যম যুক্ত হওয়ায় সৈন্যদলে দ্রুত বিদ্রোহাত্মক মনোভাব গড়িয়া উঠিতে থাকে। এমনকি নানা ঘাঁটিতে মোতায়েন সৈন্যদল নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্রোহে যোগ দিবে বলিয়া বিপ্লবী নেতাদের নিকট কথা দেয়। এমনি করিয়া পাঞ্জাবের ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি ও লাহোর এবং যুক্তপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও এলাহাবাদ, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর এবং বাঙলার ঢাকায় অবস্থিত সৈন্যদল বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। শুধু তাহাই নহে; সুদূর ব্রহ্ম ও মালয়ের গদরীরা পর্যন্ত বাঙালী বিপ্লবীদের সহিত সম্মিলিতভাবে বৈপ্লবিক সংগঠনে রত হন।

চারিদিকেই শুভলক্ষণ; অভ্যুত্থানের পক্ষে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থা বিশেষ অনুকূল। অধিকাংশ বৃটিশ সেনা তখন ফ্রান্সের রণাঙ্গনে এবং ভারতে মোতায়েন দেশীয় সৈন্যরা বিক্ষুব্ধ ও বিদ্বিষ্ট। যুদ্ধের দরুণ জিনিষপত্রের দর চড়া; সাধারণের আর্থিক অবস্থাও মন্দ; কাজেই অসন্তোষ ও অশান্তি বাড়িয়াই চলিতে থাকে।

এই সময় গুজব রটে, হিমালয়ে জনৈক সন্ন্যাসী তপস্যায় মগ্ন আছেন; তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাঁহার তপস্যার তের বছর পূর্ণ হওয়ার পর ভারত স্বাধীন হইবে। তিনি যেকোন দিন হিমালয়ের গুহা ছাড়িয়া প্রান্তরে নামিয়া আসিতে পারেন বলিয়া শুনা যাইতে থাকে। কলিকাতায় গুজব রটে, শীঘ্রই পাঞ্জাবে গুরুতর ধরণের একটা কিছু ঘটিবে।

ভারতে এই জাতীয় জনরব সিপাহী অভ্যুত্থানের প্রাক্কালেও রটিয়াছিল। লক্ষ্যের বিষয়, ভারতবর্ষে আবহমান কাল কোন কিছু ঘটিবার পূর্বে গুজবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই ব্যাপারে এদেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বিপ্লবীরা সমস্ত আঁটঘাট বাঁধিয়া কাজ করতে থাকেন; ইতিপূর্বে তাঁহারা যেসব ছোটখাট ভুল করিয়াছিলেন, তাহা যাহাতে এবার না হইতে পারে, এমনভাবে সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব হইতে তোড়জোড় চলিতে থাকে। তাঁহারা আসন্ন বিপ্লবের জন্য ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর হইতে প্রারম্ভিক ব্যবস্থা সুরু করেন। সুচারুরূপে কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহার্থ বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী খাজাঞ্চিখানা, ডাক ও ষ্টেশনসমূহ লুণ্ঠন করা হইতে থাকে। এদিকে বিপ্লব প্রচারের সুবিধার্থ অমৃতসরে ছাপাখানা এবং অস্ত্রের অভাব পূরণ কল্পে লোহাৎবর্দি ও ঝাড়েবালেতে বোমার কারখানা স্থাপন করা হয়।

মহাযুদ্ধের দুর্যোগে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের ধূমায়িত অসন্তোষ বহ্নিমান হইয়া উঠিলে ভারতীয় বিপ্লববাদীরা সুযোগ বুঝিয়া জার্মানীর সহযোগিতায় ভারতের মুক্তিলাভের প্রচেষ্টায় অগ্রণী হন।

এই সময় আমীর আমানুল্লা-শাসিত কাবুলে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়। নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, ওবেদুল্লা সিন্ধী, বরকতউল্লা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উক্ত গবর্ণমেণ্টের নেতৃত্ব করেন এবং বৃটিশ-বৈরী জার্মানী ঐ প্রচেষ্টায় সর্বপ্রকারে সমর্থন ও সাহায্য যোগাইতে থাকে।

এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জগৎরাম কাবুলে এবং ঝাঁসীর পরমানন্দ বাঙলায় যান। পূর্বাহ্ণে বাঙলার বিপ্লবীদের সহিত পিংলের মন্ত্রণা হয়। অভ্যুত্থানের দিনক্ষণের সংবাদ শুনিয়া বাঙালী বিপ্লবীরা উৎসাহিত হইয়া উঠেন। স্থির হয় যে, একদিকে সৈন্যদল বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে, আর অন্যদিকে বাঙালীরা ট্রেজারী আক্রমণ করিয়া টাকা ও রাইফেল্‌স লুটিয়া লইবে।

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বন্দী-ভারতের পক্ষে স্মরণীয় দিবস; ঐদিন যুগপৎ ভারতের সর্বত্র বৃটিশশাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিবে বলিয়া নিম্নোক্ত পরিকল্পনা সুস্থির হয়, যথা:—নিশীথে আকস্মিক আক্রমণ চালাইয়া সহর ও সেনাবারিকগুলি দখল করা হইবে, বিদ্রোহী সেনাদের সাহায্যে সমুদয় বারুদখানা, অস্ত্রাগার ও খাজাঞ্চিখানা হস্তগত করিতে হইবে এবং বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে। ইহার পর সমুদয় বিপ্লবীদল ও সৈন্য পাঞ্জাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে এক বছর যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে পারিবে বলিয়া হিসাব করিয়া দেখা হয়। সর্বপ্রথম আক্রমণ করা হইবে পাঞ্জাবের সেনাবারিক-গুলির উপর; উহাতে সফল হইলে বিপ্লবীরা ক্রমশ পূর্বাঞ্চলের দিকে ছড়াইয়া পড়িবেন।

অভ্যুত্থানের সমুদয় খুঁটিনাটি ব্যবস্থা পর্যন্ত ঠিক; কিন্তু উহারই প্রাক্কালে গবর্ণমেণ্ট পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিয়া বিপ্লবীদের সমস্ত পরিকল্পনা বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। বিপ্লবী দলে কৃপাল সিংহ নামক জনৈক পুলিশের চর ছিল; সে গবর্ণমেণ্টের নিকট সমস্ত গুপ্ত বিষয় ফাঁস করিয়া দেয়; ইহার ফলে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব হইতে হুঁশিয়ার হইয়া আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে ও পরদিন প্রত্যূষে গোরা সেনাদল পাঞ্জাবের সবকয়টি সহর ছাইয়া ফেলে এবং সহরের রোখের স্থান ও রাস্তায় রাস্তায় পাহারা মোতায়েন হয়; তাহা ছাড়া ইংরেজ সেনারা সেনাবারিক ও অস্ত্রাগারগুলির দখল লয়।

জনসাধারণ এজাতীয় অভূতপূর্ব ব্যবস্থায় সন্ত্রস্ত হইলেও মনে ভাবে যে ইহা য়ুরোপীয় সংগ্রামেরই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু বিপ্লবী সৈন্যদলগুলি ব্যাপক ধরপাকড় ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থায় নিরাশ হইয়া পড়ে। ইহা সত্ত্বেও ১৯শে ফেব্রুয়ারী পুনরায় যুদ্ধোদ্যমের তোড়জোড় করা হয়; কিন্তু তাহাও জানাজানি হইয়া যায়।

ভারতের গুপ্ত বৈপ্লবিক সংগঠন ও প্রচেষ্টা এমনি করিয়া বারবার সরকারী গোয়েন্দা ব্যবস্থার নিকট হার মানে। ইহাতে দলের আভ্যন্তরীন দুর্বলতাই প্রমাণিত হয়।

যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট উহাতেও নিশ্চিন্ত হয় না; সমগ্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা, সেনাদলে বিদ্রোহ, বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা ও বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাহায্যগ্রহণের সুযোগ যাহাতে সমূলে নাশ করা যায়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট চূড়ান্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে; ইম্পেরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে ভারতবাসীদের কবল হইতে ভারতকে রক্ষার সুমহান উদ্দেশ্য লইয়া ভারত রক্ষা আইন ( Defence of India Act ) নামক এক বেড়াপাক অস্ত্র পাশ করাইয়া নেওয়া হয়। এই বে-আইনী আইনের কবলে ব্রহ্ম হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বৃটিশ শাসনের বিরোধী বলিয়া অভিহিত অসংখ্য ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়। তাহা ছাড়া, এই আইন অনুযায়ী বিপ্লবীদের বিচারের জন্য গবর্ণমেণ্টকে ট্রাইব্যুনাল নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং উহার রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া বিহিত হয়।

ভারত রক্ষা আইন প্রণীত হইবার পর বন্দী ও ফেরার বিপ্লবীদের তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বিচার করিবার ব্যবস্থা হয়। প্রথম ভাগে বিদ্রোহের উদ্যোক্তা ও নেতাদের লইয়া, দ্বিতীয় ভাগে তাঁহাদের সহকারীদের লইয়া এবং তৃতীয় ভাগে বিভিন্ন প্রদেশবাসী দলের লোকদের লইয়া মামলা চলে। এই মামলাই প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র নামে খ্যাত; ১৯১৫ সালের ২৭শে মার্চ এই

মামলা সুরু হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধচালনা, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির অভিযোগ আনীত হয়।

প্রথম দফায় ৬১ জন, দ্বিতীয় দফায় ৭৪ জন এবং তৃতীয় দফায় ১২ জন বিপ্লবী লাহোর মামলায় আসামী ছিলেন। দীর্ঘ ৫ মাসাধিক কাল পর ১৩ই সেপ্টেম্বর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের রায় বাহির হয়। সব কয়টি মামলায় অভিযুক্ত পাঞ্জাবী, যুক্তপ্রদেশবাসী, বাঙালী ও ব্রহ্মবাসীর মধ্যে ২৮ জনের প্রতি ফাঁসির আদেশ হয়, ২৯ জন মুক্তিলাভ করেন এবং অবশিষ্ট সকলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড বা বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহা ছাড়া জনকয়েক বিদ্রোহী সৈন্যকে সামরিক আইনে এবং কয়েক জন বিপ্লবীকে সাধারণ আদালতের বিচারে দণ্ডিত করা হয়। ডাঃ হরনাম সিংহ ও সোহনলাল পাঠককে চারজন সঙ্গী সহ মান্দালয় ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি দেওয়া হয়।

জবরদস্ত ও'ডায়ারের শাসিত পাঞ্জাবে বিপ্লব দমনের নামে অকথ্য অত্যাচার চলিতে থাকে। কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান ও প্রভাবশালী শিখ এই ব্যাপারে সরকারকে সর্বোপায়ে সহায়তা করিয়া চলেন। এমনকি তাঁহাদেরই প্ররোচনায় (যথা, স্যর সুন্দর সিংহ মাঝদিয়া ও সর্দার বাহাদুর গজ্জন সিংহ) শিখদের শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রতিষ্ঠান আকাল তখ্‌ত পর্যন্ত ফতোয়া দেয় যে, বিপ্লবীরা শিখ নয়! তাহা ছাড়া জনমতের কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হয় এবং লোকমান্য তিলক ও বিপিন চন্দ্র পালের মত জননেতাকে পর্যন্ত পাঞ্জাবে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।

প্রথম পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলা চলিবার সময় গদর গেরিলা দলের লোকজনকে সরাসরি বিচার করিয়া ফাঁসি দেওয়া হইতে থাকে; লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ইঁহাদের ৩০ জনের ফাঁসি হয়। এদিকে কানাডার গদর দলের নেতা বলবন্ত সিংহ গ্রন্থীকে সিঙ্গাপুরে এবং ডাঃ মথুরা সিংহকে ইরানের মেসেদে বৃটিশ

দূতাবাসে ফাঁসি দেওয়া হয়। এমনি করিয়া 'ভারত সাম্রাজ্যরক্ষী' পাঞ্জাবের বিপ্লব আন্দোলন দমাইয়া দেওয়া হয়।

সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রে যাহারা লিপ্ত ছিল, তাহাদিগকে মীরাটে গুলি করিয়া মারা হয়; ৭নং রাজপুত পদাতিক বাহিনীর কয়েক-জনকে দিল্লীতে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং ২৩ নং রিসলা সৈন্যদলের ১৩ জনের আম্বালা জেলে ফাঁসি হয়। ইতিপূর্বে ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ-ভাগে ১৩০নং বেলুচ রেজিমেন্ট রেঙ্গুনে অভ্যুত্থান করে; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহার পর ফেব্রুয়ারী মাসে ৫নং পদাতিক বাহিনী সিঙ্গাপুর দুর্গ এক সপ্তাহ দখল করিয়া রাখে; কিন্তু ইংরেজ সৈন্যরা জাপ ও রুশদের সহায়তা লইয়া বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করে। এই ব্যাপারে বহু বিদ্রোহী সেনাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে রাউলাট কমিটিতে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নোক্ত অংশ সঙ্কলিত হইল:—'কোমাগাতা মারুর' যেসব যাত্রীকে আটক করা হইয়াছিল, তাহারা ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে মুক্তি পায়; এই সময় আমেরিকা হইতে ভারতে ইংরেজ বিদ্বেষমূলক এবং জার্মানীর বিজয়সূচক বহু উত্তেজনাপূর্ণ চিঠিপত্র আসিতে থাকে। সরকার অবগত হয় যে গদরীরা বাঙলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। ১৯১৪ সালে আমেরিকা-প্রত্যাগত গদরী বিষ্ণু গণেশ পিংলে নামক জনৈক মারাঠী যুবক পাঞ্জাবে আসেন। তিনি বাঙালী বিপ্লবীদের সহযোগিতা পাওয়া যাইবে বলিয়া গদরীদের এক গুপ্তসভায় কথা দেন। ঐ সভায় সরকারী খাজাঞ্চি-খানা লুঠ, ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটান, অস্ত্র সংগ্রহ ও বোমা প্রস্তুত করা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। পিংলে বোমা প্রস্তুতে সুদক্ষ একজন বাঙালী বিপ্লবীকে আনিতে পারেন বলিয়া প্রস্তাব করেন। তাঁহার

প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বোমা তৈয়ারীর উপকরণ সংগ্রহার্থ লোক নিযুক্ত হয়। কাশী হইতে রাসবিহারী বসু লাহোর আসেন; তাঁহার জন্য অমৃতসরে একটি বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়; কয়েকজন বাঙালীর সহিত ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি ঐ বাড়ীতে বাস করেন। ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া তিনি শিখ বিপ্লবীদের সহিত একযোগে কাজ করিতে থাকেন। তাঁহারা স্থির করেন যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখ ভারতের সর্বত্র অভ্যুত্থান করা হইবে এবং লাহোর হইতে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হইবে। যাহাতে নির্ধারিত দিবসে ভারতীয় সৈনিকরা অভ্যুত্থানে যোগ দেয়, এজন্য রাসবিহারী উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে লোক পাঠান এবং নিজে লাহোর আসেন। গ্রামবাসীদের বিদ্রোহের পক্ষে টানিবার জন্যও তিনি উপায় উদ্ভাবনে রত থাকেন। এদিকে বিপ্লবকালে হাতিয়ারের অভাব ঘটিতে না পারে এমন ভাবে বোমা তৈয়ারী করা হইতে থাকে এবং যুদ্ধঘোষণার উদ্দেশ্যে একটি খসড়া করা হয় এবং চাররঙা পতাকা প্রস্তুত রাখা হয়। তাহা ছাড়া টেলিগ্রাফ তার নষ্টের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি হইতে থাকে।

কিন্তু গোয়েন্দা পুলিশ গুপ্তচরের নিকট হইতে আসন্ন অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া রাসবিহারীর ঘাঁটিতে আকস্মিক হানা দেয়। ঐ স্থানে ৭জন বিপ্লবী রিভলভার, বোমা, বোমা তৈয়ারীর সরঞ্জাম ও বিপ্লবী পতাকা সহ ধরা পড়েন। উহার পরদিন আরও দুইজন এবং নানাস্থানে তল্লাসীর ফলে অপর ৪জন গ্রেপ্তার হন; অধিকন্তু ১২টি বোমাও পুলিশের হস্তগত হয়। প্রাপ্ত বোমাগুলির মধ্যে ৫টি ছিল 'বঙ্গীয় ধরণের'। এই সব ব্যাপারে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, লাহোর, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, কাশী, জব্বলপুর ও পূর্ববঙ্গে একসঙ্গে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট নূতন সূত্র আবিষ্কারের আশায় তন্ন তন্ন করিয়া সারাদেশ চষিয়া ফেলিতে থাকে। পাঞ্জাবকে কার্যত পুলিশের বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কিন্তু এহেন বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যেও রাসবিহারী ও পিংলে বৃটিশ শাসনের সর্বজ্ঞ ও সহস্রচক্ষু বলিয়া কথিত গোয়েন্দা পুলিশকে ফাঁকি দিয়া সরিয়া পড়েন। শচীন সান্যালও আত্মগোপন করিয়া থাকেন।

১৯১৩ সালে দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলার পর হইতে রাসবিহারী গা-ঢাকা দিয়া চলিতেছিলেন; তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্য ১২ হাজার টাকা হুলিয়া ঘোষিত হয়; উহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি কাশী ও লাহোর ঘাঁটি হইতে বৈপ্লবিক আন্দোলন চালনা করিতে থাকেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে বৈপ্লবিক সংগঠন ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, উহাকে পুনরুজ্জীবিত করার কোন আশাই নাই, তখন তিনি কৌশলে জাহাজযোগে দেশত্যাগী হন; পক্ষান্তরে পিংলে মীরাটের এক সেনাবারিকে কয়েকটি বোমাসহ ধরা পড়েন। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, উহার এক একটি বোমায় এক একটা ঘাঁটি উড়াইয়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এদিকে কর্তার সিংহ সারাভা ওয়াজিরাবাদে সেনাদের মধ্যে কাজ করিবার সময় এবং জগৎরাম পেশোয়ারে ধরা পড়েন।

এমনি করিয়া বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা বা সৈনিক অভ্যুত্থানের মারফৎ স্বাধীনতা অর্জনের দ্বিতীয় চেষ্টা অকালে ব্যর্থ হইয়া যায়; পাঞ্জাবে রক্তস্রোত বহে এবং প্রচণ্ড সরকারী চণ্ডনীতির ফলে দেশবাসী বিমূঢ় ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

## বাঙালী বিপ্লবীদের ভূমিকা

এই প্রসঙ্গে বাঙলার বিপ্লব আন্দোলন প্রসারের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেখা গিয়াছে, বাঙলার সহিত পাঞ্জাব তথা সমগ্র উত্তর ভারতের

যোগাযোগ কমবেশি বরাবরই ছিল। তবে একথাও সত্য, গত শতকের শেষপাদে মহারাষ্ট্রেই সর্বপ্রথম গুপ্তপথে সন্ত্রাসমূলক আন্দোলনের স্ফুরণ দেখা যায়; কিন্তু পরবর্তীকালে এক্ষেত্রে বাঙলাই অগ্রণী হইয়া যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিলে বাঙালী বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চিত্র কল্পনা করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং নিজেদের দলগত বিভেদ যাহাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে অন্তরায় না হইতে পারে, সেদিক লক্ষ্য রাখিয়া যুগান্তর দল ও অনুশীলন সমিতি সম্মিলিতভাবে কার্যক্রম স্থির করে।

কিন্তু দলচালনা ও পুষ্টিকল্পে যে পরিমাণ অর্থ ও অস্ত্রের প্রয়োজন, তাহা তাহাদের ছিল না। কাজেই নানাস্থানে ডাকাতি ও সরকারী অর্থ লুণ্ঠন করিয়া অর্থাভাব পূরণের ব্যবস্থা হয়; এদিকে অস্ত্রসংগ্রহ ব্যপদেশে ১৯১৪ সালের ২৬শে আগষ্ট কলিকাতার প্রসিদ্ধ অস্ত্রবিক্রেতা রডা কোম্পানী হইতে ৫০টি মসার পিস্তল ও ৪৬ হাজার কার্তুজ কৌশলে হস্তগত করা হয়। উহা নয়টি কেন্দ্রে বিলি করিয়া দেওয়ায় বিপ্লবীরা নববলে বলীয়ান হইয়া উঠেন এবং তাঁহাদের আন্দোলনে জোর বাঁধে।

শুধু ইহাতেও তাঁহারা আদৌ তুষ্ট থাকেন না; বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাহায্যলাভের চেষ্টাও তাঁহারা করিতে থাকেন। সরকারও কিন্তু তাঁহাদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতায় শঙ্কিত হইয়া উঠে এবং সরকারী চররা বিপ্লবী বলিয়া সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ছায়ার মত অনুসরণ করিতে থাকে; 'টিকটিকিরা' বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনাভেদের জন্য উঠিয়াপড়িয়া লাগে, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। অবশ্য বিপ্লবীদের কাজ ইহাতে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে; এই হেতু গুপ্তচরদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য অনেক সময় তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া গুলি চালনা করিতে হয়; ইহার ফলে বহু চর নিহত হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রেপ্তারের জন্য গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশ আয়োজনের অন্ত রাখে না। দেশে ধরপাকড়ের ধুম পড়িয়া যায়; অধিকন্তু

গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে আশংকা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা বিধান বলে অনেককে আটক করে।

এরূপ বিপত্তিকর অবস্থার মধ্যে দলনেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জনৈক পুলিশের চরকে গুলি করিয়া হত্যা করেন এবং বাঙলায় থাকা বিপজ্জনক মনে করিয়া কয়েক জন সঙ্গীসহ উড়িষ্যার বালেশ্বরে আশ্রয় নেন। অবশ্য পূর্বপরিকল্পনানত বালেশ্বরে অস্ত্রাদি নামাইয়া লইবার উদ্দেশ্যেও তিনি তথায় যান। মহানদীর মোহানার নিকট জার্মানদের প্রেরিত বন্দুক ও গোলাগুলি পাওয়ার কথা ছিল। ঐদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিপ্লবীরা পূর্ব হইতে বালেশ্বরে 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' নামক এক দোকান খোলেন।

পুলিশ উক্ত দোকান তল্লাস করিয়া বহু মূল্যবান তথ্য হস্তগত করে; এদিকে বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট খবর পায় যে, প্রধান প্রধান বিপ্লবীরা ময়ূরভঞ্জের পার্বত্যাঞ্চলে আশ্রয় নিয়াছেন।

কিন্তু পুলিশ তাঁহার পিছু ছাড়ে না। অনন্যোপায় যতীন্দ্রনাথ মহানদী পার হইয়া এক জঙ্গলে প্রবেশ করেন। তৎকালীন কলিকাতা পুলিশের কর্তা কুখ্যাত স্যর চার্লস টেগার্ট সহস্রাধিক লোক সহ ঐ জঙ্গল ঘিরিয়া ফেলেন; অধিকন্তু পুলিশবাহিনীর সহিত এক দল অশ্বারোহী সেনা যোগ দেয়। পক্ষান্তরে মাত্র পাঁচ জন অসমসাহসী সহযোগীর সহিত ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বুড়িবালামের তীরে পরিখার আশ্রয়ে তিনি, সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হন। যতীন্দ্রনাথ ও চিত্তপ্রিয় এই দুঃসাহসিক সংগ্রামে বীরের মৃত্যু বরণ করেন; আর ধরা পড়ায় ইংরেজ আদালতের বিচারে নরেন ও মনোরঞ্জনের প্রতি ফাঁসির আদেশ হয় এবং জ্যোতিষ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পরে বহরমপুর কারাগারে জ্যোতিষের মৃত্যু হয়।

যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্যর চার্লস্ টেগার্ট বলেন—"আমাকে আমার কর্তব্য

সম্পাদন করিতে হইয়াছিল। তথাপি আমি যতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবান। বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সম্মুখ যুদ্ধ করেন।"

যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সহিত বিপ্লব আন্দোলনের তৃতীয় বা শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় শেষ হইয়া যায়।

এস্থলে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পুষ্টিকল্পে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহায়তা লাভের প্রচেষ্টার কাহিনী বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমেই ভারত-জার্মানী যোগাযোগের কথা উল্লেখ প্রয়োজন। ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবে বৈদেশিক সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যেই এই যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ইঙ্গ-জার্মান যুদ্ধারম্ভের পর জার্মাণীতে অবস্থিত নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীরা ১৯১৪ সালের শেষভাগে 'ভারতীয় স্বাধীনতা সমিতি' নামে এক কমিটি স্থাপন করেন; এই সমিতি পরে 'বার্লিন সমিতি' নামে পরিচিত হয়। উহাতে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, লালা হরদয়াল, ডাঃ মনসুর, বরকত উল্লা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ছিলেন। সমিতি দেশবিদেশের ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে এবং বহু বিপ্লবী ছাত্রকে বিপ্লব প্রসারের জন্য ভারতে পাঠায়; এই প্রচেষ্টায় আমেরিকার 'গদর দল'ও তাহাদের সহিত সর্ববিধ সংযোগিতা করিতে থাকে। পিংলে গদর দলের তরফে বার্লিন ঘুরিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

'বার্লিন সমিতি' জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের সহযোগিতায় (১) বাটাভিয়া, (২) চীন, (৩) জাপান, (৪) ব্যাংকক, (৫) ভারতের পূর্ব প্রান্ত, (৬) কানাডা ও (৭) জার্মাণীতে ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি ও পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপন করে। স্থির হয় যে জার্মাণীর নিকট হইতে জাতীয় ঋণ হিসাবে অর্থ গ্রহণ করা হইবে; তবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর উহা শোধ করা হইবে। অধিকন্তু জার্মাণী অস্ত্র যোগাইবে এবং তাহা বিভিন্ন দেশে অবস্থিত জার্মাণ কন্সালগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া বিলিব্যবস্থা করা হইবে। যুদ্ধারম্ভের পর

১৯১৫ সালের প্রথমদিকে জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী নামক জনৈক বিপ্লবী য়ুরোপ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে পৌঁছিয়া তিনি বাঙালী বিপ্লবী নেতাদের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন; তিনি জানান যে, জার্মানী তাঁহাদিগকে বৃটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত। তদনুসারে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্র রায়) দলের পক্ষ হইতে বাটাভিয়ায় প্রেরিত হন। তিনি সি মার্টিন ছদ্ম নামে তথায় যান, এবং অবনী মুখার্জি নামক অপর একজন বিপ্লবী জাপানে যান।

বাটাভিয়ায় পৌঁছিয়া নরেন্দ্রনাথ জার্মান দূত ফন হেলফেরিকের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাঁহাদের মধ্যে আলাপআলোচনায় স্থির হয় যে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যার্থ অস্ত্রশস্ত্র-ভর্তি একটি জাহাজ সুন্দরবনের রায় মঙ্গল নামক স্থানে খালাস করা হইবে। ঐ জাহাজে ৩০ হাজার রাইফেল এবং প্রতি রাইফেলের জন্য চারশত করিয়া কার্তুজ এবং ২ লক্ষ টাকা থাকার কথা ছিল।

সমস্ত বিষয় স্থির হইবার পর নরেন্দ্রনাথ জুন মাসের মাঝামাঝি বাঙলায় প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে পৌঁছিয়া তিনি নেতা যতীন্দ্রনাথের সহিত মন্ত্রণা করেন এবং বিভিন্ন স্থানে বণ্টনের জন্য কয়েকটি স্থানে মাল খালাসের প্রস্তাব হয়। স্থির হয় যে, পূর্ববঙ্গের জন্য কিছু অস্ত্র হাতিয়া দ্বীপে, পশ্চিম বঙ্গের জন্য রায়মঙ্গলে এবং অবশিষ্ট অস্ত্রাদি ও মালপত্র বালেশ্বরে নামান হইবে।

১৯১৫ সালের ১লা জুলাই অস্ত্রভর্তি 'মাভেরিক' জাহাজ রায়মঙ্গলে পৌঁছিবার কথা ছিল; কিন্তু দশদিনের মধ্যে উহা নির্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছায় প্রতীক্ষমান বিপ্লবীরা ফিরিয়া আসেন। পরে জানা যায় যে, 'মাভেরিক' জাহাজ আমেরিকায় আটক পড়িয়াছে।

অস্ত্র পাওয়ার আশায় বিপ্লবীরা পূর্ব হইতে ব্যাপক পরিকল্পনা করেন; তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, জার্মানীর নিকট হইতে অস্ত্রপ্রাপ্তির পর বিপ্লব

আরম্ভ হইবে। তবে তাঁহারা ইংরেজদের শ্রেষ্ঠতর সংগঠন, সেনা ও অস্ত্রবল সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। এই হেতু বাহির হইতে যাহাতে সৈন্য আমদানী করা সম্ভব না হইতে পারে তজ্জন্য কলিকাতার পথে অবস্থিত প্রধান তিনটি রেলপথ ধ্বংসের কথাও স্থির হয়।

কিন্তু দলের আভ্যন্তরীন গলদ হেতু পূর্ব হইতে সব বিষয়ই শাসকগণের কর্ণগোচর হয়; এই হেতু তাহারা পূর্বাহ্নে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করে এবং ফলে বাহির হইতে অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

১৯১৬ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত সময়কে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার চতুর্থ অধ্যায় বলা যায়। এই সময় ভারত রক্ষা আইনের বলে * বহু বিপ্লবীকে আটক বা অন্তরীন রাখা হয়। ইহা সত্ত্বেও যাঁহারা পুলিশকে ফাঁকি দিয়া বাহিরে থাকিতে সক্ষম হন, তাঁহারা মুহূর্তের তরেও বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টায় ক্ষান্তি দেন নাই। তবে একথাও সত্য, পুলিশ ও গোয়েন্দা চরদের হত্যা করা ছাড়া আর কোন দিকে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহার ফলে বহু ধরপাকড় ও মামলা রুজু করা হয়। যাঁহারাও বা এতকাল কোনক্রমে বাহিরে আত্মগোপন করিয়া কাজ চালাইয়া যাইতে-ছিলেন, তাঁহারা ত রক্ষা পাইলেন-ই না, পরন্তু এবার প্রায় অধিকাংশ বিপ্লবীই আটক হন। ইঁহাদের ছাড়া আর অল্প যে কয়জন বাহিরে থাকেন, তাঁহারাও যোগাযোগবিহীন হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন।

১৯১৭ সালে অবশিষ্ট বিপ্লবীদের পক্ষে বাঙলায় অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; তাঁহারা এই হেতু আসামের গৌহাটীতে আশ্রয় নেন। কিন্তু পুলিশ তাঁহাদের ঘাঁটির খোঁজ পাইয়া ৯ই জানুয়ারী তাহা ঘেরাও করিয়া ফেলে। বিপ্লবীরাও আত্মসমর্পণ না করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে দেহত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করেন।

---

* ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে ভারতরক্ষা আইন ( Defence of India Act ) প্রণীত হয়।

বিপ্লবী ও পুলিশ দলের মধ্যে দুই ঘণ্টাকাল গুলি বিনিময় চলে। বিপ্লবীদের অনেকে আহতাবস্থায় বন্দী হন; কিন্তু নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কয়েকজন পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করিতে সমর্থ হন; ইঁহাদের মধ্যে নলিনী গুপ্ত অনেক স্থান ঘুরিয়া ঢাকায় আসিয়া আশ্রয় নেন। কিন্তু পুলিশ ১৯১৮ সালের ১৪ই জুন তাঁহার বাসা ঘিরিয়া ফেলে। তারিণী মজুমদার নামক জনৈক সঙ্গী সহ তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে পিস্তল লইয়া যুঝেন; নলিনী গুলিতে আহত হইয়াও পুলিশ ব্যূহ ভেদ করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ধরা পড়েন। পরে তাঁহার হাসপাতালে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিশ তাঁহার নিকট হইতে একটি গুপ্ত কথাও ফাঁস করিতে পারে নাই। অন্তিম নিঃশ্বাস গ্রহণের সময়ও তিনি পুলিশকে বলেন—'আমায় শান্তিতে মরিতে দাও।'

১৯১৭ সালের শেষ ভাগ হইতে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত বাঙলার বিপ্লব আন্দোলনের পঞ্চম অধ্যায়। এই সময় বিপ্লবীদের সংগঠন ও সংস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে; অধিকাংশ দলনেতা আটক, কর্মীদের অনেকে হতাহত, ফেরার ও অন্তরীন; দেশবাসীও দোমনা; মহাযুদ্ধের সমাপ্তিও আসন্ন।

মণ্ট-ফোর্ড (মণ্টেগু+চেম্‌সফোর্ড) শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার পর বিপ্লবীদের অনেকে আর দলগঠন ও গুপ্ত সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পূর্বের মত উৎসাহী ছিলেন না; আটক থাকার সময় আন্তর্জাতিক, আভ্যন্তরীন ও ব্যক্তিগত কারণে অনেকের মতামত পরিবর্তন হইতে আরম্ভ করে; কেহবা নূতন পথের সন্ধানী হইয়া পড়েন।

ভবিষ্যতে বিপ্লব আন্দোলন বন্ধের উদ্দেশ্যে স্বৈরাচারী আমলাতন্ত্র অস্থায়ী ভারতরক্ষা আইনকে স্থায়ী আইনে পরিণত করার ব্যবস্থা করে। ইহার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমত বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। অত্যাচারে

রাখা হয়। ১৯০৯ হইতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত উহার কাজ নির্বিঘ্নে চলিতে থাকে। কিন্তু সদস্যদের মধ্যে কার্যপ্রণালী সম্পর্কে মতভেদ হওয়ায় শচীনবাবু একটি পৃথক সমিতি স্থাপন করিয়া কলিকাতার বিপ্লবীদের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন। এদিকে ১৯১৪ সালের প্রথম ভাগে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু কাশীতে গিয়া এই আন্দোলনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি তখন দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলায় ফেরার ছিলেন। রাসবিহারী বিপ্লব প্রসারের জন্য শচীনবাবুকে পাঞ্জাব পাঠান; শচীন্দ্রনাথ পাঞ্জাবের গদরীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ভারতব্যাপী অভ্যুত্থানের পথ রচনা করেন।

সেনা অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার পর শচীন বাবু প্রভৃতিকে লইয়া এক বিরাট ষড়যন্ত্রের মামলা হয়। এই মামলার আসামী শ্রেণীভুক্ত অধিকাংশই ছিলেন বাঙালী; তাঁহাদের অনেকের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হয়। কিন্তু শচীন্দ্রনাথকে আটক রাখা হয়; মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তনের পর তিনি রাজানুকম্পায় মুক্তিলাভ করেন।

মধ্যপ্রদেশে বৈপ্লবিক তৎপরতার প্রসার হয় বটে, কিন্তু সেখানে আন্দোলন তেমন শিকড় গাড়িতে পারে না। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাসবিহারীর নির্দেশে নলিনী মোহন মুখার্জি কাশী হইতে জব্বলপুরে গিয়া সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। পক্ষান্তরে ঢাকার নলিনী ঘোষ এবং মধ্যপ্রদেশের বিনায়ক রাও কাপলে মধ্যপ্রদেশে যান এবং শেষোক্ত ব্যক্তি সেখানে একটি ক্ষুদ্র সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই উহার কার্যকলাপ পুলিশের নিকট ধরা পড়ে।

বিহারেও বিপ্লব আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে বটে, কিন্তু উহা তেমন প্রবল হয় নাই। ঐ প্রদেশে অর্জুন শেঠ, মতিচাঁদ, মাণিকচাঁদ, জয়চাঁদ ও

জোরাবার সিংহের চেষ্টায় বিপ্লব আন্দোলন গড়িয়া উঠে। কিন্তু শচীন্দ্রনাথ সান্যালের প্রচেষ্টায়ই প্রথমে ইহা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পরিচালিত হয়; তিনি ১৯১৩ সালে বাঁকীপুরে দলের একটি শাখা স্থাপন করেন। বিহার ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র বঙ্কিম মিত্র পরে এই শাখাসমিতির ভার গ্রহণ করিয়া কাজ চালাইতে থাকেন। কিন্তু কিছুকাল পর কাশী ষড়যন্ত্রের মামলায় তাঁহার কারাদণ্ড হয়। ইহার পর সমিতির কার্যকলাপ স্তিমিত হইয়া পড়ে এবং অবশেষে যাহাও বা কিছু কাজকর্ম চলিতেছিল ভারত রক্ষা বিধানের প্রয়োগে তাহাও একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

১৯০৮ সালে মাদ্রাজে বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম সূচনা দেখা দেয়। সুব্রহ্মণ্যম্ শিব ও চিদম্বরম্ পিলে মাদ্রাজের নানাস্থানে পরাধীনতার মর্মান্তিক অভিশাপের কথা জনসভায় বক্তৃতা মারফৎ ব্যক্ত করিতে থাকেন। ১৯০৮ সালের ৯ই মার্চ চিদম্বরম্ পিলে এক রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতা করেন; এই হেতু তিনি ও সুব্রহ্মণ্যম্ শিব গ্রেপ্তার হন। ইহাতে তিনেভেলির জনসাধারণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। উত্তেজিত জনতা বহু সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে; সহরের প্রত্যেকটি সরকারী ভবন আক্রান্ত এবং সরকারী দলিলপত্র ও দ্রব্যে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বিচারে এই ব্যাপারে লিপ্ত সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ২৭ জনের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডাদেশ হয়।

এদিকে ১৯০৮ সালে 'ইণ্ডিয়া' নামক সংবাদপত্রে রাজদ্রোহ প্রচার করা হইতে থাকে। এই অপরাধে উহার মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার (১৯২৬ সালে গৌহাটী কংগ্রেসের সভাপতি নহেন) দণ্ডিত হন। ইহার পর 'ইণ্ডিয়া' ছাপাখানা পণ্ডিচেরীতে স্থানান্তর করা হয়। ঐ ছাপাখানায় এম পি তিরুমল নামক একব্যক্তি কাজ করিতেন। তিনি ১৯০৮ সালে লণ্ডনে গিয়া ইণ্ডিয়া হাউসে অবস্থান করেন এবং মাদ্রাজের বিপ্লবীদের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে নীলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী নামে জনৈক

বিপ্লবী শঙ্কর আয়ার নামক অপর একজন সঙ্গী সহ মাদ্রাজে বৈপ্লবিক তৎপরতার প্রসারে রত থাকেন। অতঃপর ১৯১০ সালে বেঁচি আয়ার নামক জনৈক বিপ্লবী তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। পক্ষান্তরে ঐ বছর ডিসেম্বরে বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউসের বিনায়ক সাভারকরের সহকর্মী ভি ভি এস আয়ার মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করিয়া পণ্ডিচেরীতে যুবকদিগকে রিভলবার চালনা শিক্ষা দিতে থাকেন। বেঁচি ১৯১১ সালের জানুয়ারীতে এস আয়ারের সহিত যোগ দেন। তাঁহাদের সম্মিলিত কার্যক্রমে আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠে।

ইহার পর হইতে মাদ্রাজে গুপ্ত হত্যার প্রকোপ বাড়িতে থাকে। ১৯১১ সালের ১৭ই জুন বেঁচি ও শঙ্কর তিনেভেলির জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া সরকার পক্ষ হইতে এক বিরাট ষড়যন্ত্রের মামলা রুজু করা হয়। ইহাই তিনেভেলি ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। ইহাতে অভিযুক্ত ৯ জনের দণ্ড হয়। এই ঘটনার পর অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত মাদ্রাজে তেমন উল্লেখযোগ্য বৈপ্লবিক তৎপরতা ঘটে না বলিলেই চলে।

## আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য

এই প্রসঙ্গে আর্যাবর্তের বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার সহিত দাক্ষিণাত্যের তুলনামূলক আলোচনা করিলে শেষোক্ত অঞ্চলের নিষ্ক্রিয়তা ও দৈন্য স্বতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। দেখা গিয়াছে যে সিপাহী অভ্যুত্থানের পর হইতে প্রাক-অসহযোগ আন্দোলন অবধি জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্য তাহার যথাযোগ্য স্থান করিয়া লইতে পারে নাই। যদিও ভৌগোলিক বিচারে বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র দাক্ষিণাত্যের অন্তর্ভুক্ত তথাপি তাহাদের সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য নহে। কারণ, সেখানে বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্ফুরণ উত্তর

ভারতের সমসাময়িক, এমনকি মহারাষ্ট্র সেদিক দিয়া অগ্রদূত। দাক্ষিণাত্য বলিতে এখানে প্রধানত মধ্য ভারতের কিয়দংশ ও মাদ্রাজ প্রদেশকেই বুঝাইতেছে। অবশ্য কিছুটা পরিমাণ মাদ্রাজে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন না হইয়াছে, এমন নহে; কিন্তু তাহাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়মতন্ত্রসম্মত পথে ও পরিমিত আকারে।

সিপাহী অভ্যুত্থান বিফল হইবার পর যেসব শ্রেণী সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহাদের মধ্যে মারাঠীরা অন্যতম। কাজেই ইংরেজ শাসনব্যবস্থা নির্মূলের উদ্দেশ্যে পরবর্তীকালে যখনই কোন সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই তাহারা উহার সদ্ব্যবহার করিয়া লইতে ক্রুটি করে নাই। পক্ষান্তরে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মারাঠীরাও সরকারী চাকরি ও অন্যান্য পেশা ব্যপদেশে প্রাদেশিক রাজধানী বোম্বাইএ আসিয়া ভিড় জমাইতে থাকেন। ঐখানেও তাঁহারা শিক্ষা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে অগ্রণী পার্শী ও মুসলমানদের সহিত সম্মিলিতভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের গোড়া পত্তন করেন। ঐদিকে বিচারপতি গোবিন্দ রাণাড়ে হইতে আরম্ভ করিয়া ভারত সেবক সমিতির গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে পর্যন্ত সকলে একই পথের পথিক ছিলেন।

উল্লেখ প্রয়োজন, প্রথম দিকে পুণা এবং পরবর্তীকালে বোম্বাই পশ্চিম ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি বলিয়া গণ্য হয়। বস্তুত বোম্বাই সহর প্রথমাবধি মারাঠী উপনিবেশ রূপেই গড়িয়া উঠে, যেমন কলিকাতা আর্যাবর্তের বিভিন্ন শ্রেণীর বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশে পরিণত হয়।

কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রই ভারতে প্রথম বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রবর্তক। এই ব্যাপারে লোকমান্য তিলকের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ প্রতিষ্ঠান সমূহের সদস্যগণই সর্বপ্রথম দেশবাসীকে সশস্ত্র প্রতিশোধ গ্রহণের

দীক্ষা দেন। তাঁহার পরবর্তী ও সমসাময়িক মাদাম কামা বা শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা হইতে বিলাতে ইণ্ডিয়া হাউসের সহিত সংশ্লিষ্ট বিনায়ক সাভারকর এবং তদীয় অনুগামী ও গুণগ্রাহীরা যুগপৎ বিদেশে ও দেশে বিপ্লব প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী হন, তাহাও নিঃসন্দেহ। এক সময় বিপ্লব আন্দোলনে তাঁহাদের প্রভাব বিশেষ ভাবেই অনুভূত হইত। এমনকি মাদ্রাজে ও দেশের অন্যান্য কয়েক স্থানে তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বিপ্লব আন্দোলনের প্রসার ও পুষ্টি পর্যন্ত হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বোম্বাই-এর রাজনীতি দ্বৈত নীতির প্রভাবাধীন হইয়া পড়ে।

তিলক একদিকে যেমন বিধ্বংসী বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার করেন, অন্যদিকে তেমন শাসকশক্তির সহিত ব্যতিক্রম হিসাবে responsive co-operation বা পারস্পারিক সহযোগিতার নীতিও প্রচার করেন। ইহারই ফলে সাধারণ লোক তাঁহার প্রচারিত স্ববিরোধী মতবাদে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। এই হেতু বোম্বাই প্রদেশের স্থানবিশেষ ( যথা মহারাষ্ট্র ) বিপ্লব আন্দোলনের পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হইলেও সমগ্র প্রদেশে বিপ্লববাদ আশানুযায়ী গভীরভাবে শিকড় গাড়িতে পারে না।

তিলকের অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও তাঁহার রাষ্ট্রীয় দর্শন কার্যত উভয়সংকটমূলক। শুধু যে বোম্বাই বা মহারাষ্ট্রের রাজনীতিই উহার ঘোর কাটাইয়া উঠিতে অক্ষম হয় এমন নহে,—এমনকি গান্ধীজীর অভ্যুদয় হইতে অদ্যাবধি সর্বভারতীয় রাজনীতিতে পর্যন্ত উহার প্রভাব প্রত্যক্ষ।

পক্ষান্তরে মাদ্রাজে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার প্রতি বরাবর একটা ঝোঁক দেখা যায়। ইহার অন্যতম কারণ এই যে বৃটিশ শাসনের প্রথমাবধি এবং এমনকি উহার পূর্ব হইতে পাশ্চাত্য জাতিদের সহিত সংস্পর্শে আসিয়া মদ্রদেশীয়রা বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে; তাহাদের মধ্যে অনেকে নিজ মাতৃভাষা পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া ইংরেজীকেই মাতৃভাষার পর্যায়ে

উন্নীত করে। শুধু এখানেই বি-জাতীয় প্রভাবের ক্ষান্তি ঘটে নাই। জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া অনেকে আবার ধর্মান্তর গ্রহণও করে। কয়েকটি অঞ্চল বিশেষত মালাবার উপকূল অঞ্চলের বহু অধিবাসীই খৃষ্টান। তবে একথাও সত্য, এই ধর্মান্তরগ্রহণ ও বিজাতীয়ত্বের প্রসার সামাজিক বাধানিষেধ, গণ্ডীবদ্ধতা ও মূঢ় গোড়ামিরই সাক্ষাৎ পরিণাম। এই হেতু ভারতের অন্যান্য স্থানের মত এ অঞ্চলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্ন-শ্রেণীর লোকজনই জাতীয় ঐতিহ্যের রসধারা হইতে বঞ্চিত হয়।

ইহার ফল দাঁড়ায় এই যে, সমগ্রভাবে মদ্রদেশীয়দের জাতীয়ভাবাপন্ন হইতে বিলম্ব ঘটে ; তাহা ছাড়া, যে-মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী সাধারণত শাসকবৃন্দের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের বীজ ছড়াইয়া থাকে, মাদ্রাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যা তেমন না থাকায় তাহারা প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাঙালী মধ্যবিত্তের মত বিক্ষোভ প্রকাশে অগ্রণী হয় না ; পক্ষান্তরে মারাঠীদের মত তাহাদের প্রাক্তন ঐতিহ্যেরও কোন বালাই না থাকায়, অথবা সাধারণভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধেও তেমন কোন অভিযোগ না থাকায় তাহাদের ক্ষোভও প্রথমদিকে তেমন দানা বাঁধিতে পারে নাই।

অবশ্য এহেন অবস্থায়ও দূরদর্শী মাদ্রাজী নেতৃবৃন্দ জাতীয় অধঃপতন সম্পর্কে যে অবহিত না হইয়া উঠিতেছিলেন এমন নহে। তাঁহারা জনসাধারণকে ঐ বিষয়ে সচেতন করিবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও গৌরব গাথা প্রচারচ্ছলে বৈদেশিক শাসন ও শোষণের অন্তঃসারশূন্যতার নগ্ন রূপ উদ্ঘাটিত করিতে থাকেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা বাঙালী ও মারাঠী প্রধানদের সমগোত্রীয়। তবে বলাই বাহুল্য, প্রথমে মাদ্রাজের আন্দোলনও নিয়মতন্ত্রসম্মত পথে ও অবস্থানুপাতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ১৯০৮ সালে ঐ অঞ্চলেও সন্ত্রাসমূলক আন্দোলনের বিস্তার

গঠনের দিক হইতে তাঁহারা আপোষরফাপন্থী ; এরূপ অবস্থায় ভারতীয়দের মৌলিক অধিকার সঙ্কোচের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহা স্বভাবতই আপোষরফার দিকে প্রবণতা নেয়।

মূলত সত্যাগ্রহের তত্ত্বও আপোষধর্মী। অবশ্য এই আন্দোলনের উদ্ভাবক ও নেতার জীবনদর্শনও উহাকে বহুলাংশে প্রভাবিত ও রূপান্তরিত করিয়াছে, একথাও সত্য।

প্রথমত, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের বসবাস ও আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনার পূর্বে ঐ অঞ্চলে ইংরেজপ্রাধান্য স্থাপনের কাহিনী বর্ণনার প্রয়োজন।

ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট, নাতাল ও কেপ কলোনী লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট গঠিত। গত শতকের ১৮৮০ সালে প্রথমোক্ত দুইটি ষ্টেটে বুয়রদের প্রজাতন্ত্র শাসনব্যবস্থা ছিল। ১৯০৯ সালে বৃটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত দক্ষিণ আফ্রিকা আইন অনুযায়ী ঐ চারটি প্রদেশ বৃটিশ সম্রাটের অধীনস্থ দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন হয়। অতঃপর ১৯১০ সালের ৩১শে মে সর্বপ্রথম দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন চালু হয়। এখানকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মধ্যে ওলন্দাজরাই ( বুয়র নামে অভিহিত ) সংখ্যায় গরিষ্ঠ এবং ইংরেজরা সংখ্যার দিক হইতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। * কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন সম্প্রদায়গত প্রভেদরেখা টানা হয় না বলিয়া উভয় শ্রেণীর সংখ্যানির্ণয় সুসাধ্য নহে।

---

* ১৯২৬ সালের লোক গণনায় শ্বেতাঙ্গ সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬৬০ জন ও এশিয়াবাসীদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৩৩৯ জন ছিল। এশিয়াবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয়। সম্প্রতি ( ১৯৩৬ সাল ) ভারতীয়দের সংখ্যা ২ লক্ষ ৮০ হাজার এর মত হইয়াছে।

এখানে ইংরেজী ও ওলন্দাজ উভয় ভাষাই রাজভাষা হিসাবে প্রচলিত। ওলন্দাজ ভাষার নাম আফ্রিকান (Afrikaans) ; ইহা একটি সঙ্কর ভাষা ; উপনিবেশে বসবাসকারী লোকজনের কথ্য ওলন্দাজ, জার্মান ও ফরাসী ভাষার সংমিশ্রনে ইহার উৎপত্তি। *

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মত দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ সৃষ্টির ইতিহাসও বৈচিত্র্যময়। য়ুরোপে শিল্পপ্রগতি ও বাণিজ্য প্রসারে সঙ্গে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে অনুন্নত কৃষ্ণাঙ্গ-অধ্যুষিত দেশে রাজ্য প্রসার ও সম্পদ শোষণের প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়। সর্বপ্রথম পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পর্তুগীজরা ভারতে আসিবার পথে কৃষিসমৃদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার সন্ধান পায়। পরে ঐ স্থানে স্বর্ণের লোভে অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতিও উপস্থিত হয়। উহাদের মধ্যে ওলন্দাজগণ পর্তুগীজদের অনুগমন করে। তাহারা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং-এর মারফৎ দেড়শত বৎসর ঐ অঞ্চলে প্রভুত্ব করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পদ শোষণ করে। কিন্তু ১৭৯৫ সালে ইংরেজরা উহার কিয়দংশ দখল করিয়া নেয়। তৎকালে য়ুরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে থাকায় ভারতগামী মধ্যবর্তী স্থান হিসাবে ইংরেজদের নিকট ইহার গুরুত্ব অনুভূত হয়।

উহার পর হইতে ইংরেজ ও ওলন্দাজরা পাশাপাশি শাসন ও শোষণ চালাইতে থাকে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব না থাকায় পরিশেষে ১৮৯৯ হইতে ১৯০২ সাল পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে এক চূড়ান্ত ধরণের যুদ্ধ হয় ; উহাই বুয়র যুদ্ধ নামে খ্যাত। যুদ্ধশেষে ১৯০২ সালের মে মাসে ভেরিনিগিংএ

* ১৯২১ সালে ৭ বৎসরের ঊর্ধ বয়স্ক সমগ্র শ্বেতাঙ্গ জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৫০·৭৯% উভয় ভাষায় এবং ২৫·১৬% ভাগ লোক ইংরেজী এবং ২৩·৭৯ % ভাগ আফ্রিকান ভাষায় কথা বলিত।

সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার চারটি উপনিবেশ এক ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টে পরিণত হয়। কিন্তু সন্ধি হওয়া মাত্রই ইউনিয়ন গঠিত হয় না: প্রথমদিকে প্রত্যেক উপনিবেশের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা পরিষৎ বর্ত্তমান থাকে। ট্রান্সভাল ও ফ্রী ষ্টেট 'ক্রাউন উপনিবেশ' ধরণে শাসিত হইতে থাকায় ওলন্দাজ নেতা জেঃ বোথা ও জেঃ স্মাট্‌স * ইংরেজ সরকারের সহিত অসহযোগ করেন। অবশেষে বৃটিশ সাম্রাজ্য পরিষৎ আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে বুয়রদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া নেওয়ায় উপনিবেশসমূহে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত হয়। তদবধি দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ ও ওলন্দাজরা মিলিতভাবে শাসনকার্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছে।

কিন্তু ভারতবাসী কদাচ বুয়র বা ইংরেজ কাহারও নিকট ব্যবহারিক দিক হইতে সুবিচার ও সমদর্শিতা লাভ করিতে পারে নাই। উপরন্তু উভয় জাতিই প্রভুশ্রেণী হিসাবে (Herrenvolk তত্ত্ব) ভারতীয়দের উপর জুলুম করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অথচ দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষির উন্নয়ন, বাণিজ্যের প্রসার ও সম্পদ বৃদ্ধিতে ভারতবাসীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

## ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ ও ভারতীয় মজুর

ক্রীতদাস প্রথার দৌলতে পাশ্চাত্যের নবীন জাতিসমূহ নানাভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অনগ্রসর দেশের সম্পদ আহরণ ও শোষণ করিয়া নিজেরা স্ফীতোদর হইতে থাকে। কিন্তু ১৮৩৫ সালে ঐ জঘন্য মনুষ্যত্বনাশা প্রথার অবসান ঘটায় তাহারা অভূতপূর্ব শ্রমিক সংকটের সম্মুখীন হয়। নিগ্রোরা পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের হইয়া মজুরের কাজ করিতে অস্বীকার করে। এইরূপ অবস্থায় অন্যত্র এবং বিশেষ করিয়া ঔপনিবেশিক দেশে দক্ষিণ আফ্রিকার

* দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী; তিনি জাতিতে ওলন্দাজ।

মজুর সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারত হইতে চুক্তিবদ্ধ মজুর আমদানীর ব্যবস্থা করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার পর ওলন্দাজরা যবদ্বীপ হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদেশে মালয়ী ক্রীতদাস আমদানী করে। ঐ অঞ্চলে তাহারাই প্রথম এশিয়াবাসী; কিন্তু চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় মজুর আমদানীর পর হইতেই নানারূপ অশান্তির সূত্রপাত হয়।

নাতালের ইংরেজদের সহিত ভারত সরকারের মজুর প্রেরণ করা সম্পর্কে এক চুক্তি হয়। ভারতীয় মজুরদের সাহায্যে লাভজনক চা, কফি ও ইক্ষু ইত্যাদি চাষ করার জন্যই উক্ত চুক্তি। তদনুযায়ী যেসব ভারতীয় মজুরকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়, তাহাদের 'গিরমিটিয়া' বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক বলা হয়। তাহাদের অধিকাংশই যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ প্রদেশবাসী। ইহাদের অবস্থা অর্ধদাসেরই নামান্তর। তাহারা ৫ বৎসরের কড়ারে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইত। এই 'গিরমিটিয়া' মজুরদের প্রথম দল ১৮৬০ সালের ১৬ই নভেম্বর নাতাল পৌঁছে।

ভারতবর্ষ ও নাতালের মধ্যপথে মরিসাস দ্বীপ। এখানে পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলের সম্পদশালী বহু বেপারী ব্যবসায় করিতেন। তাঁহারা ভারতীয় শ্রমিকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা যান। তাঁহাদের মধ্যে শেঠ আবুবকর আহম্মদই সর্বপ্রথম নাতাল গমন করেন। অতঃপর অন্যান্য মেমান তথায় গিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইঁহাদের দেখাদেখি কাথিয়াবাড়ের স্বল্পবিত্ত ব্যবসায়ী, সুরাটের বোরাগণ এবং বার্দৌলী হইতে পাতিদাররা ব্যবসায় করিতে থাকেন। এই সব বেপারীর হিসাব রাখার উদ্দেশ্যে গুজরাট ও কাথিয়াবাড় হইতে হিন্দু হিসাব-নবিসদের সেখানে আমদানী করা হয়।

এইভাবে নাতালে দুই শ্রেণীর ভারতীয় যথা (১) স্বাধীন বেপারী ও

তাঁহাদের কর্মচারীবৃন্দ এবং (২) ভারত হইতে আমদানীকরা চুক্তিবদ্ধ অর্ধদাস মজুর বসবাস করিতে থাকে। শেষোক্ত শ্রেণীর লোক চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে স্বাধীনভাবে নাতালে বাস করিতে পারিত। কিন্তু স্থানান্তর গমনাগমন ও বিবাহাদি ব্যাপারে তাহাদের কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা মানিতে হইত। কাজেই চুক্তির দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের অঙ্গ হইতে দাসত্বের ছাপ একেবারে মুছিয়া যাইত না।

এদিকে নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গদের সহিত কোন লেনদেন করিত না বলিয়া ভারতীয় বেপারীরা সুযোগ বুঝিয়া নাতাল ছাড়াও ট্রান্সভাল ও ফ্রী ষ্টেটে গিয়া দোকান খোলেন। তাঁহারা কেপ-কলোনীতেও (উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদেশ) ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া প্রচুরলাভ করিতে থাকেন। এই সময় চারিটি উপনিবেশে স্বাধীন ভারতবাসীর সংখ্যা ৪০।৫০ হাজার এবং চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ মুক্ত ভারতবাসীর সংখ্যা আনুমানিক ১ লক্ষ ছিল।

মুক্ত ভারতীয় মজুরদের কেহ কেহ ভারতে প্রত্যাবর্তন করে; আবার অনেকে দক্ষিণ আফ্রিকায়ই থাকিয়া যায়; তাহারা ঐ স্থানে চাষাবাদ ও দ্রব্যাদি ফেরি করিয়া বিক্রয় করিতে থাকে। ইহাতে শ্বেতাঙ্গ ভূস্বামীরা তাহাদিগকে নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া তাহাদের উপর নানা-ভাবে নির্যাতন করিতে থাকে এবং চুক্তিমুক্ত মজুরদের দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বাধীনভাবে থাকা বন্ধ করার জন্যই নাতালের য়ুরোপীয়রা আন্দোলন শুরু করে। এই হেতু একটি কমিশন বসান হয়; কিন্তু কমিশনের সিদ্ধান্তে স্থির হয় যে, মুক্ত মজুররা থাকায় দক্ষিণ আফ্রিকার জনসাধারণ মোটের উপর লাভবানই হইতেছে।

১৮৯৩ সালে নাতাল স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করার পর লর্ড এলগিন-চালিত ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তিমুক্ত ভারতীয় মজুরদের অবস্থিতি সম্পর্কে একটা রফা হয় এবং তাহাদের উপর জনপ্রতি তিন

পাউণ্ড কর ( অর্থাৎ প্রায় ৪০ টাকা ) ধার্য করা স্থির হয়। কিন্তু উক্ত কর শুধু মজুরের উপরই ধার্য হইত না ; তাহার ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যা ও ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র এবং স্ত্রীর উপরও এই কর বর্তে। কাজেই এ ব্যবস্থা অনুসারে সাধারণত প্রত্যেক মজুরকেই বৎসরে ৩২ পাউণ্ড কর দিতে হইত।

বেপারীরা ভারতীয়দের তরফ হইতে নাতাল গবর্ণমেণ্টের আরোপিত এই অযৌক্তিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালান। এ সম্পর্কে বিলাতে ও ভারত সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনও করা হয় ; কিন্তু বিশেষ ফল হয় না।

এদিকে স্বাধীন ভারতীয়দের অবস্থাও ক্রমশ মন্দ হইতে থাকে। নাতালের য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্বহানির আশংকা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু করে। তাহারা শ্বেতাঙ্গ রাজনীতিকদের সহিত যোগসাজসে নাতাল ব্যবস্থা পরিষদে ১৮৯৪ সালে এই মর্মে এক বিল উত্থাপনের ব্যবস্থা করে যে, পূর্ব হইতে ভোটার শ্রেণীভুক্ত ভারতীয়গণ ছাড়া নূতন কোন ভারতীয়কে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইবে না। ইহাই নাতালে প্রথম জাতিবৈষম্যমূলক আইন।

ভারতীয়রা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বটে, তবে যথারীতি আইন প্রণয়নেও অসুবিধা ঘটে না। ইহা সত্ত্বেও ভারতীয়রা ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন উপনিবেশ সচিব লর্ড রিপনের নিকট আবেদন করিলে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যে বর্ণভেদমূলক আইন মানিয়া নিতে অস্বীকার করেন।

নাতাল সরকার কিন্তু সোজা জাতিভেদমূলক ব্যবস্থার মধ্যে না গিয়া খিরকীর পথে ভারতীয়দিগকে ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। ভারতীয়রা ইহার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানায় ; তবে তাহাতে কোন সুফল হয় না।

নাতালে এই সময় ৪ লক্ষ জুলু (নিগ্রো), ৪০ হাজার শ্বেতাঙ্গ, ৬০ হাজার

চুক্তি-বদ্ধ ও ১০ হাজার চুক্তিমুক্ত ভারতীয় এবং ১০ হাজার স্বাধীনভাবে আগত ভারতীয় বাস করিত। কাজেই নাতালের শ্বেতাঙ্গ ভূস্বামী ও নাতাল সরকার ভারতীয়দের ভোটদানের অধিকার নাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না; ভারতীয়রা যাহাতে অবাধে সেখানে প্রবেশ ও ব্যবসা করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতেও সংকল্প করে। এই উদ্দেশ্যে পরবর্তী সময়ে গৃহীত দুইটি আইন দ্বারা ভারতীয়দের ব্যবসায়ের পথে অন্তরায় সৃষ্টি ও তাহাদের নাতালে প্রবেশ বন্ধ করা হয়। প্রথম আইনে ভারতীয়দিগকে অনুমতি পত্র না লইয়া নাতালে ব্যবসা করিতে ও দ্বিতীয় আইনে যেকোন য়ুরোপীয় ভাষা-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কাহাকেও নাতালে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া বিহিত হয়। এইভাবে ভারতীয়দের নিকট নাতাল প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ হয়। তবে উক্ত আইনে এইটুকু মাত্র ফাঁক থাকে যে আইন গৃহীত হওয়ায় তিন বৎসর পূর্বে যাহারা নাতালে ছিল, তাহাদিগকে নাতালবাসী বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং তাহারা নাবালক পুত্রকন্যা ও স্ত্রীসহ ভারতে যাইতে ও পুনরায় নাতালে প্রবেশ করিতে পারিবে।

১৮৮০ সালের পূর্ব হইতেই নাতাল ছাড়া অন্যান্য উপনিবেশেও ভারতীয়-বিরোধী মনোভাব গড়িয়া উঠিতে থাকে। অথচ ১৮৮১ সালে ভারতীয়রা সর্বপ্রথম ট্রান্সভালে প্রবেশ করে। উহা তখন বুয়র শাসনাধীন ছিল। ১৮৮৫ সালে ট্রান্সভালে তাড়াহুড়া করিয়া এই মর্মে আইন রচিত হয় যে, প্রত্যেক ভারতীয়কে ২৫ পাউণ্ড ফি জমা দিয়া ব্যবসায় করার অনুমতি লইতে হইবে, নচেৎ গুরুতর শাস্তি দেওয়া হইবে। অধিকন্তু কোন ভারতীয়কে জমি কিনিতে এবং নাগরিক অধিকার দেওয়া হইবে না। তবে বৃটিশ ও বুয়রদের মধ্যে সম্পাদিত 'লণ্ডন বৈঠকের' সর্ত অনুযায়ী এক সালিশ ব্যবস্থা করা হয়। উহাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতীয়দিগকে ২৫ পাউণ্ডের স্থলে ৩ পাউণ্ড কর দেওয়া স্থির হয় এবং তাহাদিগকে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে,

সহরের বাহিরে বা বস্তি অঞ্চলে জমি কিনিবার অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিশ্রুতিও সততার সহিত পালন করে না। ফলে ভারতীয়রা এক ধরণের অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায় এবং তাহাদিগকে 'লোকেশন' বা নির্দিষ্ট অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র ব্যবসায় করার ব্যাপারেও বাধা সৃষ্টি করা হয়।

অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট ভারতীয়দের অবস্থা অধিকতর খারাপ হইয়া পড়ে। সেখানে দশবার জন ভারতীয় দোকান খোলার সঙ্গেই এক আইন পাশ করিয়া (১৮৯৩ সালের পূর্বে) তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করা হয়। তাহারা ব্যবসায়ে বা ভোটাধিকারে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে কেপ কলোনীতেও ভারতীয়-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়; ভারতীয় সন্তানসন্ততি সাধারণ স্কুলে ভর্তি করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং ভারতীয় ভ্রমণকারী হোটেলে স্থান পায় না। অবশেষে উপনিবেশের অনুকরণে কেপকলোনীতেও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ ও ব্যবসায়ের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। ফলত বলা যায় যে, প্রাক্-বুয়র যুদ্ধ পর্যন্ত কয়েকটি বাধানিষেধ সত্ত্বেও মোটামুটি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার অব্যাহত থাকে।

এহেন সংকটময় পরিস্থিতিতেও ১৮৯৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর স্বার্থ দেখিবার মত কোন উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসী ছিলেন না। যাঁহারাও বা ছিলেন তাঁহারা শুধু কাজ চালাইবার মত ইংরেজী জানিতেন এবং তাঁহাদের প্রায় সকলেই কেরাণী ও দো-ভাষীর কাজ করিতেন। তাঁহাদের জনকয়েক ছিলেন ভারত হইতে আনীত মুসলমান বেপারীদের কাজে নিযুক্ত গুজরাটী হিন্দু মুহুরী ও চুক্তি-বদ্ধ ভারতীয় মজুরদের অল্প সংখ্যক সন্তানসন্ততি।*

---

* মুসলমান বেপারী ছাড়াও সারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩০।৪০ জনের মত পার্শী বেপারী ছিলেন। আর ছিলেন দুই শতাধিক সিন্ধী বেপারী।

এক মাস অন্তে তিনি পুনরায় দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিলে ভারতীয় সমাজ হইতে তাঁহাকে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়। অবশেষে অনেক বিচার বিবেচনার পর তিনি আরও এক বৎসরকাল দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিয়া যাইতে সম্মত হন।

গান্ধিজী নাতাল সুপ্রীম কোর্টে এডভোকেট হওয়ার জন্য আবেদন করেন; কিন্তু তথাকার আইনজীবী সমিতির তরফ হইতে বিরোধিতা করিয়া বলা হয় যে, কৃষ্ণাঙ্গ আইন ব্যবসা করিতে পাবে এমনভাবে ওকালতী আইন রচিত হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়। এই একটিমাত্র ব্যাপার উপলক্ষে গান্ধিজী সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিচিত হইয়া পড়েন।

ইতিমধ্যে গান্ধিজীর উদ্যোগে ১৮৯৪ সালের মে মাসে ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভার অনুকরণে 'নাতাল ভারতীয় কংগ্রেস' স্থাপিত হয়। এক মাসের মধ্যে ইহার সভ্যসংখ্যা তিনশত হয়; প্রত্যেক সভ্যকে বার্ষিক তিন পাউণ্ড করিয়া চাঁদা দিতে হইত এবং কংগ্রেসের কাজ সারা বছর ধরিয়া চলিত। ভারতীয় কংগ্রেসে কিন্তু তখনও সারা বছর কাজ করিবার বিষয় চিন্তা করা হয় নাই। আর লক্ষ্যের বিষয়, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ভারতীয়ই কংগ্রেসের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়।

প্রতি মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে থাকে; উহাতে দফাওয়ারী হিসাবনিকাশ পেশ ও গ্রহণ করা হইত। সভ্যদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হইত; তাহারা বক্তৃতাদানের অভ্যাসও করিতে থাকে। ইতিমধ্যে সংবাদ আসে, ভারতীয়দের ভোটাধিকার লোপকারী বিল বিলাতের উপনিবেশ সচিব নামঞ্জুর করিয়াছেন। এই ব্যাপারে ভারতীয়দের মধ্যে একদিকে যেমন উৎসাহ বৃদ্ধি পায় তেমনি অন্যদিকে আন্দোলনের সাফল্যে তাহাদের আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়তর হইতে থাকে।

এই সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে সংস্কার আন্দোলনও আরম্ভ হয়। ঐ

দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কংগ্রেসের সহযোগিতায় 'নাতাল ভারতীয় শিক্ষা পরিষৎ' গঠিত হয়। যুবকদের মধ্যে মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসার ভাব উদ্রেক করা, ভারত সম্পর্কে তাহাদের সাধারণ জ্ঞানের উন্মেষ করা এবং সাধারণ মিলন স্থান রচনাই ছিল পরিষদের উদ্দেশ্য।

ট্রান্সভালেও নাতাল ভারতীয় কংগ্রেসের অনুরূপ সংস্থা গঠন করা হয়। আবার কেপটাউনে আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্য থাকিলেও সব কয়টির কার্য্যক্রম একই ধরণের ছিল।

ইতিমধ্যে গান্ধিজী নাতালে ভারতীয়দের সংগঠন ব্যাপারে প্রায় আড়াই বৎসরকাল অতিবাহিত করায় নাতাল কংগ্রেসও স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কিন্তু বেশিদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সম্ভাবনা থাকায় তিনি প্রথমত পরিবারবর্গকে আনয়নের এবং দ্বিতীয়ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্যা সম্পর্কে ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে ১৮৯৬ সালের মাঝামাঝি ভারতে যান।

স্বদেশে অবস্থানকালে তিনি বিচারপতি গোবিন্দ রাণাড়ে ও বদরুদ্দিন তৈয়বজী, লোকমান্য তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ও স্যর ফিরোজ শাহ মেটা প্রভৃতি বোম্বাই ও পুনার নেতৃবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহা ছাড়া তিনি প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে একটি পুস্তকও প্রকাশ করেন এবং এসম্পর্কে বোম্বাই ও পুনাতে বক্তৃতাদি করেন। এইভাবে তিনি প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে ভারতে এক আন্দোলনের সূত্রপাত করিতে সমর্থ হন। তিনি ভারতে যেসব বক্তৃতা করেন তাহার সংক্ষিপ্ত অথচ অতিশয়োক্তিপূর্ণ খবর যথারীতি 'রয়টার' মারফৎ বিদেশে পরিবেষিত হওয়ায় নাতালের শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

এই সময় তিনি ভারতীয় রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জটিলতার সহিত

কিছুটা পরিচিত হন; গান্ধিজী তিলকের পরামর্শমত গোখ্‌লের সহিত দেখা করায় উভয়ের মধ্যে প্রথম সাক্ষাতেই গাঢ় প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে দেখা গিয়াছে যে তিলক বা অন্যান্য চরমপন্থী নেতাদের চেয়ে গোখ্‌লের রাজনীতিক প্রভাবই গান্ধিজীর জীবনে স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়।

গান্ধিজী মাদ্রাজ ও কলিকাতার নেতৃবৃন্দের সহিতও দেখাসাক্ষাৎ করেন। কলিকাতায় তিনি সুরেন্দ্রনাথ, মহারাজা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপআলোচনা করেন। কিন্তু ১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসে নাতাল হইতে জরুরী তার পাইয়া তিনি সপরিবারে ভারত ত্যাগ করেন।

নাতালের শ্বেতাঙ্গরা প্রচার করে যে, গান্ধিজী ভারতীয়দের দিয়া নাতাল ছাইয়া ফেলার প্রাথমিক পর্ব হিসাবে ৮ শত লোক সহ আফ্রিকা পৌঁছিতেছেন। কাজেই তাহারা যেকোন উপায়ে গান্ধিজীর নাতাল প্রবেশ বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হয়। এমনকি তিনি যাহাতে জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে না পারেন, তদুদ্দেশ্যে শ্বেতাঙ্গরা নাতাল সরকারের সহিত যোগসাজসে 'কোয়ারেন্টাইন' বা সংক্রামক রোগ প্রতিষেধের অছিলায় ২৩ দিন পর্যন্ত জাহাজ হইতে কোন যাত্রীকে অবতরণ করিতে দেয় না।

ভারতীয় সমাজ গান্ধিজীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের সমুদয় আক্রোশ ও ক্রোধ গান্ধিজীর উপর পড়ে; এই হেতু আন্দোলনের নায়ক ও ধারককে উচ্ছেদের জন্য তাহাদের এত চেষ্টা।

গান্ধিজী যখন মিঃ লাফটন নামক জনৈক খ্যাতনামা এডভোকেটের সহিত তাঁহার মক্কেল রুস্তমজী শেঠের বাড়ীতে যাইবার উদ্দেশ্যে তীরে অবতরণ করেন তখন ক্রোধান্ধ শ্বেতাঙ্গ জনতা তাঁহাকে নৃশংসভাবে প্রহার করিতে থাকে। ঐ সময় ভাগ্যক্রমে ডারবানের পুলিশ সুপারের সহধর্মিনীর

হস্তক্ষেপে তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছেন। * কিন্তু অংশেষে পুলিশের সহায়তায় গান্ধিজী স্থানান্তরে গিয়া সে যাত্রা প্রাণ রক্ষা করেন। ইহা ১৮৯৭ সালের ১৩ই জানুয়ারীর ঘটনা।

দক্ষিণ আফ্রিকার কংগ্রেস বিলাতের কংগ্রেস কমিটির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে থাকে। অধিকন্তু কংগ্রেসের তরফ হইতে লণ্ডনে প্রতিনিধি পাঠাইয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট প্রবাসী ভারতীয়দের ভাল-মন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় বৃটিশ উপনিবেশসমূহে উহার প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

ইহা বুয়র যুদ্ধের প্রাক্‌কালীন অবস্থা। কিন্তু ১৮৯৯ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সমগ্র অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এতদিন বৃটিশ ঔপনিবেশিক ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনোমালিন্য ও সংঘর্ষ চলিতেছিল, তাহার সাময়িক বিরতি ঘটে এবং ভারতীয়রা 'যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে সহায়তা করিবার সিদ্ধান্ত করে।

বুয়র যুদ্ধ কেন আরম্ভ হয়, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট ওলন্দাজদের শাসনাধীন, পক্ষান্তরে নাতাল ও কেপ কলোনী ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

১৮৭০ সাল অবধি দক্ষিণ আফ্রিকা প্রধানত কৃষি ও পশু সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু ঐ সালে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদেশের (কেপ কলোনী) কিম্বার্লিতে হীরকখনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেশে এক অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক ও শিল্পোন্নয়ন সূচিত হয়। হীরকখনি ছাড়াও

---

* "আমি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম; কোনক্রমে একটা বাড়ীর রেলিং ধরিয়া ফেলিলাম। দাড়াইয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ করিলাম ও পুনরায় চলিতে লাগিলাম। জীবন্ত অবস্থায় পৌঁছিবার আশা আমার আদৌ ছিল না।"—দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ: মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

জোহান্সবার্গের নিকটবর্তী উইটওয়াটার্স র‍্যাণ্ড (ট্রান্সভাল) নামক পার্বত্য অঞ্চলের স্বর্ণখনি ও প্রেটোরিয়াতে হীরকখনি আবিষ্কৃত হয়।... ইহার ফলে ১৮৭৮ সালে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে রেলপথ স্থাপিত হয়।

ঐ সুযোগে ভারতীয় বেপারী এবং গিরমিটমুক্ত মজুর ও তাহাদের সন্তানসন্ততিরা হীরক ও স্বর্ণলোভী ইংরেজ ভাগ্যান্বেষীদের অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে বাণিজ্য ব্যপদেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অনগ্রসর অঞ্চলগুলির উন্নতি করিয়া প্রভূত অর্থও উপার্জন করিতে থাকে। ইতিমধ্যে চুক্তিমুক্ত মজুরদের সন্তানরা অনেকে ডাক্তারী, ওকালতি প্রভৃতি পেশাও অবলম্বন করেন। ইহা উনবিংশ শতকের নবম দশকে ঘটে।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ওলন্দাজ ও ইংরেজ উভয়ের নিকটই ভারতীয়রা নানাভাবে নির্যাতিত হইতে থাকে। শুধু তাহাই নহে; তাহাদিগকে 'কুলী' 'মরশুমী পাখী' প্রভৃতি হীনতাজ্ঞাপক আখ্যা দিয়া চূড়ান্তরূপে অপমানিত করা হইতে থাকে। পক্ষান্তরে শ্রেণী হিসাবে শ্বেতাঙ্গদের ভয় হয়, স্বল্পভোগী ভারতীয়রা দক্ষিণ আফ্রিকা ছাইয়া ফেলিয়া তাহাদের প্রাধান্য নষ্ট করিবে। এই হেতু সবকয়টি উপনিবেশে ক্রমশ ভারতীয়-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়া তোলা হয়।

এহেন অবস্থায় ইংরেজ স্বর্ণ-লোভীদের প্ররোচনা ও উদ্যোগে বুয়র যুদ্ধের সূত্রপাত হয়; কিন্তু মজা এই যে, যে-ভারতবাসীকে ইংরেজ বণিকরা শিকার বলিয়া মনে করিত, বুয়র রাজ্যে তাহাদেরই দুর্দশার ধুয়া তুলিয়া ভারত-বাসীদের পরম দরদী সাজিয়া বসিল এবং ঘোষণা করিল যে, ভারতীয়দের প্রতি অবিচারও বুয়রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার একটি কারণ!

ইহাতে ভারতীয়দের মধ্যে সমস্যা দেখা দেয়। কেননা বুয়র ও ইংরেজ উভয়ই যখন ভারতীয়-নির্যাতনে সমঅংশভাগী এবং উভয় রাজ্যেই যখন

ভারতীয় সম্প্রদায়ের অবস্থিতি, তখন যেকোন পক্ষ অবলম্বন করিলেই তাহাদের স্বার্থহানির আশংকা বর্তমান থাকে। কিন্তু পরিশেষে গান্ধিজীর পরামর্শমত বৃটিশ প্রজা হিসাবে সর্বোপায়ে বৃটিশপক্ষ সমর্থন করাই স্থির হয়; তদনুযায়ী ভারতীয়রা যুদ্ধে যোগদানের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমতি চাহিলে তাহাদিগকে আহত পরিচর্যার জন্য গ্রহণ করা হয়।

গান্ধিজীর নেতৃত্বে ১১ শত ভারতীয় লইয়া 'অ্যাম্বুলেন্স কোর' গঠিত হয়। ইহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজরা রীতিমত বিস্মিত হয়। গান্ধিজীর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, (এখনও আছে) ভারতীয়দের অপ্রত্যাশিত সাহায্যে শত্রু-ভাবাপন্ন ইংরেজের কঠোর হৃদয়ও গলিবে। গান্ধিজীর এই মনোভাবের মধ্যেই সত্যাগ্রহের বীজসূত্র নিহিত।

১৯০২ সালে বুয়র যুদ্ধের অবসান ঘটে; কিন্তু ১৯০০ সালেই কার্যত বুয়রদের আক্রমণ ও প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইহার পর তাহাদের সামরিক কর্মতৎপরতা শুধু গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

এই সময় ভারতীয় অ্যাম্বুলেন্স কোর রণক্ষেত্রে অশেষ যোগ্যতার সহিত নির্ধারিত বর্তব্য সম্পাদন করিয়া শত্রুমিত্র সকলের প্রশংসাভাজন হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ শেষ হইয়াছে মনে করিয়া গান্ধিজীও ভারতীয় সম্প্রদায়ের অনুমতি লইয়া সর্তসাপেক্ষভাবে ভারতে 'গোখ্লের তত্ত্বাবধানে' জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে সংকল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯০২ সালের মার্চে বোম্বাই-এ অফিস খোলেন। কিন্তু তিন মাস অতিবাহিত না হইতেই তাঁহাকে পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিতে হয়।

ভারতীয়দের আশা ছিল, ইংরেজ বিজয়ী হইলে যুদ্ধাবসানে তাহাদের দুরবস্থারও শেষ হইবে। কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে, ট্রান্সভালে ভারতীয়দের ক্রীত জমি রেজিষ্ট্রী করা হয় না এবং ট্রান্সভালে প্রবেশের ব্যাপারেও য়ুরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে প্রভেদমূলক ব্যবস্থার প্রশ্রয় দেওয়া হইতে থাকে।

অধিকন্তু 'এশিয়াটিক বিভাগ' ( ট্রান্সভাল প্রবেশার্থী ভারতীয়দের অনুমতিপত্র গ্রহণের দপ্তর ) ভারতীয়দের পীড়ন করার যন্ত্রস্বরূপ হয়।

ভারতীয়রা স্ব-সম্প্রদায়ের দুঃখ অপনোদনের জন্য বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তরে যথারীতি দরবারের ক্রটি করে না। অধিকন্তু ভারতীয় প্রতিনিধিদল 'এশিয়াটিক বিভাগের' আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ছোটবড় বহু সরকারী কর্তার সহিত দেখা করে। ইহার ফলে যে-আন্দোলন সৃষ্টি হয়, তাহাতে সামান্ত প্রতিকার হইলেও ট্রান্সভাল প্রবেশের ব্যাপারে ভারতীয়দের ক্ষেত্রেই একমাত্র বাধ্যতামূলক অনুমতি পত্র গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। ইংরেজ ব্যবসাদার ও মূলধনীদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই বিধান। অথচ বুয়র গবর্ণমেণ্টের আমলে কদাচ এরূপ কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করা হইত না। অবশ্য ইংরেজ অধিকারের পরও যে পুরাতন ভারতীয় বাসিন্দাদের অনুমতিপত্র দেওয়া না হয় এমন নহে; কিন্তু তাহাও নিতান্ত অপমানজনক; যাহাকে অনুমতিপত্র দেওয়া হইত, তাহার পাশ বহিতে তাহার স্বাক্ষর অথবা টিপসহি থাকিত ও এমনকি তাহার ফটোও লওয়া হইত। ইহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আবেদন ও প্রতিবাদ করিয়াও কোন ফল হয় না; এই জঘন্য বিধানকে দক্ষিণ আফ্রিকার 'শান্তিরক্ষা আইন' বলা হইত। ভারতে যেমন লোককে নির্যাতিত করার উদ্দেশ্যেই 'ভারত রক্ষা বিধানের' মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেও তাহা পোকাপোক্ত করার ব্যবস্থা হয়, দক্ষিণ আফ্রিকায়ও 'শান্তি রক্ষা অর্ডিনান্স' ভারতীয়দের উৎপীড়নের জন্য বলবৎ রাখা হয়।

ভারতীয় নেতৃবর্গ ফটো রাখার বিরোধী হন; ভারতীয় মুসলমানরা ইহাকে ধর্মের পক্ষে হানিকর বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সম্প্রদায় হিসাবে ভারতীয়রা আইন লঙ্ঘন না করিয়া নূতন ধরণের অনুমতিপত্র বদল করিয়া নেয়।

এই সময় ১৯০৬ সাল; ইতিপূর্বে গান্ধিজী ১৯০৩ সালে ট্রান্সভালে

পুনরায় প্রবেশ করিয়া জোহান্সবার্গে নিজের অফিস খোলেন ; ইহার পরবর্তী দুই বৎসরকাল এশিয়াটিক বিভাগের নিত্যনূতন আক্রমণ প্রতিরোধেই ব্যয়িত হয়। কিন্তু তাহাদিগকে সর্বোপায়ে দাবাইয়া দিবার জন্য 'এসিয়াবাসী সংক্রান্ত আইনেব' খসড়া রচিত হয়। উহাতে বিহিত হয় যে, ট্রান্সভালবাসী সমুদয় ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষ এবং আট বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক বালকবালিকাদের 'এসিয়াবাসী দপ্তরে' গিয়া রেজেষ্ট্রি করিয়া অনুমতিপত্র লইতে হইবে। ঐ সময় পুরাতন অনুমতিপত্র ফেরৎ দিতে হইবে এবং দরখাস্তে নাম ধাম জাতি বয়স প্রভৃতি লিখিতে হইবে। * * দরখাস্তকারীর সকল আঙ্গুলের ছাপ লওয়া হইবে ; নির্দিষ্ট তাবিখের মধ্যে যাহারা নাম রেজেষ্ট্রি করাইবে না তাহাদের বাসের অধিকার লোপ হইবে এবং তাহারা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে। এই অপরাধে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা নির্বাসন দণ্ড হইতে পারিবে। * যেকোন স্থানে পুলিশ অনুমতিপত্র দেখিতে চাহিলে তাহা দেখাইতে হইবে ; উহা না করিতে পারিলে যথারীতি দণ্ডিত হইতে হইবে :—ইত্যাদি।

বুয়র যুদ্ধে অকুণ্ঠ সেবা ও সমর্থনের বিনিময়ে ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে উদার ও সমব্যবহার পাইবার আশা করা স্বাভাবিক ; কিন্তু উহার পরিবর্তে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তাহাদের বিতাড়ন ও অস্তিত্ব লোপের প্রারম্ভিক পর্ব হিসাবে ট্রান্সভালে উচ্ছেদমূলক আইন রচনার ব্যবস্থা করা হয়। শুধু তাহাই নহে, আইনের নাম করিয়া তাহাদের উপর চূড়ান্ত অপমানের বোঝা চাপাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে দণ্ডিত অপরাধীর মত ভারতীয়দের দশ আঙ্গুলে টিপসই লইবার বিধান করা হয়। ভারতীয়রা বুঝিতে পারে ইহা তাহাদের ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত অপমান নহে—ইহা সমগ্র ভারতের অপমান ; ভারতের সম্মান তাহাদের উপরই নির্ভরশীল।

ভারতীয় সম্প্রদায় কর্তব্য নির্ধারণ কল্পে ১৯০৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এক বৈঠকে মিলিত হয় ; উহাতে ট্রান্সভালের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত

প্রতিনিধিরা যোগ দেন। ট্রান্সভাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি আবদুল গণি খুবশী সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা সংকল্পে অবিচল থাকার এবং ঘাতকী আইনের নিকট বশ্যতা স্বীকার না করার প্রতিজ্ঞা করেন। গান্ধিজী ইহাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন এবং বক্তৃতায় সরকারী আইনের বিরোধিতার দুঃখদায়ক পরিণামের বিষয় সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করিয়া দেন। অবশ্য চূড়ান্ত নিগ্রহভোগের বিনিময়ে ভারতীয়দের বিজয়লাভ হইতে পারে বলিয়াও তিনি আশ্বাস দেন। এইভাবে যে আন্দোলনের সূচনা হয়, গান্ধিজী তৎকালে তাহাকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) নামে অভিহিত করেন। কিন্তু নামটি মনঃপূত না হওয়ায় পরবর্তী কালে উহা পাল্টাইয়া সত্যাগ্রহ রাখা হয়। *

ইহা সত্ত্বেও সর্বোপায়ে বৈধ আন্দোলন চালনার অঙ্গ হিসাবে বিলাতে ভারতীয় প্রতিনিধি দল পাঠান হয়; কিন্তু উহাতে কোনরূপ সুফল জন্মে

---

* "নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মর্ম তখনও বুঝিতাম না, এই বিজাতীয় কথাটি প্রচলিত হওয়া কঠিন। এই হেতু সর্বাপেক্ষা সুন্দর নাম নির্বাচনকারীকে পারিতোষিক দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষিত হয়। ** মগনলাল গান্ধীও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। তিনি 'সদাগ্রহ' নাম পাঠান। আন্দোলন একটা বিশেষ আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই আগ্রহ সৎ বা শুভ; এই হেতু ঐ নাম পছন্দ হয়। কিন্তু নাম পছন্দ হইলেও আন্দোলনের অন্তর্নিহিত অর্থ উহাতে ব্যক্ত না হওয়ায় 'সদ্' কে 'সৎ' এবং তাহার সহিত য ফলা যোগ করিয়া 'সত্যাগ্রহ' শব্দ রচনা করি। ইহাতেই ভারতীয় আন্দোলনকে সত্যাগ্রহ বলা হয়।" অধিকন্তু প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সকে অনেকে দুর্বলের অস্ত্র বলায় গান্ধিজী ঐ নাম অপছন্দ করেন। 'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ নামক পুস্তকে গান্ধিজী আরও বলেন—"সত্যাগ্রহ আত্মিক বল। প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সে অস্ত্রবলের প্রয়োগ চলে, কিন্তু সত্যাগ্রহে অস্ত্রব্যবহার সর্বতোভাবে ত্যাজ্য। সত্যাগ্রহ প্রীতিভাজনদের বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহাতে নিজে দুঃখ সহ্য ও দুঃখ বহন করিয়াই প্রতিপক্ষকে বশ করার মনোভাব থাকা প্রয়োজন।"

না। বরং বৃটিশ সরকারের অবলম্বিত বক্র নীতির ফলে ভারতীয়গণ আপনাদিগকে প্রবঞ্চিত মনে করিতে বাধ্য হয়।

১৯০৭ সালের ১লা জুলাই ভারতীয়-বিরোধী আইন যথারীতি বলবৎ হয়। এই সময় ট্রান্সভালে কমবেশি ১৩ হাজার ভারতীয় ছিল। এদিকে জেঃ বোথা ও জেঃ স্মাট্স ছিলেন ট্রান্সভাল সরকারের হর্তাকর্তা। তাঁহারা গোটা সম্প্রদায়ের বিরোধিতাকে খুব সহজে গ্রহণ করেন না। এই হেতু সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার পূর্বে ভারতীয়দের যে সভা হয়, তাহাতে সরকারের প্রেরিত প্রতিনিধি ভারতীয়দের বহু হিতোপদেশ দেন। কিন্তু তাহারা সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকাই স্থির করে।

অবশ্য দুর্বলচিত্ত ভারতীয় যে না ছিল এমন নয়। এই হেতু ৫শত ভারতবাসী বিবিধ ব্যক্তিগত কারণে 'এশিয়াবাসী দপ্তরের' প্ররোচনায় অনুমতিপত্র সংগ্রহ করায় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম ভাঙন দেখা দেয়; কিন্তু উহা সাময়িক; রামসুন্দর পণ্ডিত নামক জনৈক প্রিয়ভাষী কথককে সর্বপ্রথম একমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করায় আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়া যায়।

এস্থলে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামক সাপ্তাহিকের অবদান উল্লেখযোগ্য। প্রথমে উহা ইংরেজী, গুজরাটী, তামিল ও হিন্দীতে প্রকাশিত হইত; পরে শুধু প্রথমোক্ত দুইটি ভাষায় উহা ছাপা হইতে থাকে। উহার মারফৎ আন্দোলনের গতি ও আদর্শ প্রচারিত হওয়ায় উহা ভারতীয়দের সর্বাধিক শক্তিশালী মুখপত্র হিসাবে পরিগণিত হয়।

আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখিয়া সরকার পক্ষ শঙ্কা গণিতে থাকে; এই হেতু ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে নেতাদের মধ্যে কয়েকজনের উপর আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইঁহাদের মধ্যে মিঃ কুইন নামে জনৈক চীনাও ছিলেন। তদনুযায়ী ২৭শে

ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট নেতারা আদালতে হাজির হইলে অনুমতিপত্র না নেওয়ার সকলকে ট্রান্সভাল ত্যাগের হুকুম দেওয়া হয়।

এদিকে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী গান্ধিজী প্রমুখ নেতৃবর্গ ১০ই জানুয়ারী (১৯০৮ সাল) আদালতে উপস্থিত হইলে তাঁহার মাত্র ২ মাস বিনাশ্রম কারাবাস হয়; পক্ষান্তরে তাঁহার অন্যান্য সহকর্মীরা গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

গান্ধিজীর কারাদণ্ডের পর ভারতবাসী দলেদলে কারাবরণ করিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারও নির্মম হইয়া উঠে। জোহান্সবার্গ কারাগারে আবদ্ধ কয়েদীদের সহিত নানাভাবে অসদ্ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পক্ষকাল অতীত না হইতেই গবর্ণমেণ্টের সহিত আপোষরফার কথাবার্তা চলিতে থাকে। তবে আপোষের সর্তের মধ্যে ভারতীয়-বিরোধী আইন রদ করার কোন কথা উল্লেখ না থাকায় এবং খসড়ার ভাষা সুস্পষ্ট না হওয়ায় গান্ধিজী প্রমুখ নেতৃবর্গের তাহা অপছন্দ হয়। অবশেষে গান্ধী-স্মাট্‌স সাক্ষাৎকার-কালে জেঃ স্মাট্‌স গান্ধিজীকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, অধিক লোক অনুমতিপত্র গ্রহণ করিলেই 'এশিয়াবাসী সংক্রান্ত আইন' রদ করা হইবে।

মিটমাটের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে গান্ধিজীকে মুক্তি দেওয়া হয়; তিনি সম্প্রদায়ের নিকট নূতন পরিস্থিতি বুঝাইয়া দিবার জন্য জোহান্সবার্গ সহরে এক সভা আহ্বান করেন। উহাতে অনেকে এই মর্ম্মে সন্দেহ করেন যে, অনুমতিপত্র লওয়া হইলে জেঃ স্মাট্‌স বিশ্বাসঘাতকতা করিবার সুযোগ পাইবেন। কিন্তু গান্ধিজী উক্ত আশঙ্কার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত যুক্তি দেখান,— 'সত্যাগ্রহী বিশবার বিশ্বাস করার পরও যদি প্রতিপক্ষ বিশবারই বিশ্বাসভঙ্গ করে, তথাপি একুশবারের বারও সে তাহাকে বিশ্বাস করিবে।' কিন্তু অনুমতিপত্র গ্রহণের জন্য নাম রেজেষ্ট্রি করিবার কথা বলিতেই মীর আলম

নামক জনৈক পাঠান গান্ধিজীকে দশ আঙ্গুলের টিপসহি দেওয়া সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিতে থাকেন। এমনকি যে টিপসই দিবে, তাহাকে সে হত্যা করিবে বলিয়াও ভয় দেখায়। উক্ত পাঠান বলে যে, দশ আঙ্গুলের টিপ সই-এর জন্য যুদ্ধ চলিতেছে—একথা গান্ধিজীই তাহাদিগকে শিখান; অথচ তিনিই এখন অন্যায় করিতেছেন।

এইভাবে কয়েকদিন সভাসমিতির পর ১৯০৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী গান্ধিজী প্রভৃতি কয়েকজন সার্টিফিকেট লইতে প্রস্তুত হন। কিন্তু এশিয়াবাসী দপ্তরের দিকে অগ্রসর হইবার কালে মীর আলম ও তাঁহার সঙ্গিগণের প্রহারে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন।

মিটমাটের ব্যাপারে এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যেই নানারূপ দ্বিধা জন্মে; সত্যাগ্রহ শুধু ট্রান্সভালে আরম্ভ হইলেও নাতালেও নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার প্রচার হয়। কাজেই গান্ধিজী সভা ডাকেন; কিন্তু ঐখানেও পাঠানরা বিরোধী হওয়ায় অন্যান্য ভারতীয় নেতা গান্ধিজীকে অতিকষ্টে সভানুষ্ঠানের সময় অক্ষত দেহে রক্ষা করেন। পাঠানরা সরল; গান্ধিজী ভারতবাসীর স্বার্থ বিকাইয়া দিয়াছেন, পাঠানদের মধ্যে এই ধারণার উদ্ভব হওয়ায় এই গোলযোগের উৎপত্তি। ফলত সাধারণ লোক সত্যাগ্রহের ভাবাদর্শ, স্বরূপ ও পরিণাম এবং যুগপৎ সংগ্রাম ও আপোষরফার স্ববিরোধী রীতি উপলব্ধি করিতে অক্ষম হয় বলিয়াই একদল ভারতীয় গান্ধিজীর বিরোধিতা করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু একটা বিষয় সুস্পষ্ট এই যে, গান্ধিজীর নেতৃত্বে জনসাধারণের মধ্যে ও সামাজিকভাবে ট্রান্সভালেই প্রথমবার সত্যাগ্রহ মূলমন্ত্রের পরীক্ষা হয়। *

---

* গান্ধিজী সত্যাগ্রহের উদ্ভাবক নহেন, একথা তিনিও স্বীকার করেন। যীশুখৃষ্টকে তিনি পৃথিবীর সর্বপ্রথম সত্যাগ্রহী বলিয়া মনে করেন; টলস্টয় এবং যীশুর পরবর্তী ধর্মের জন্য নির্যাতনভোগকারী খৃষ্টানদেরও তিনি সত্যাগ্রহী বলিয়া মনে করেন। খৃষ্ট ও টলস্টয়ের নীতি তিনি সত্যাগ্রহে মানিয়া নিয়া উহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন।

এদিকে ভারতীয়রা জেঃ স্মাট্‌সের আশ্বাস অনুযায়ী স্বেচ্ছায় নাম রেজেষ্ট্রী করা সত্ত্বেও 'এশিয়াবাসী সংক্রান্ত আইন' রদ করা হয় না, উপরন্তু তিনি এক নূতন আইনের খসড়া প্রকাশ করিয়া একই উদ্দেশ্যযুক্ত দুইটি আইন একসঙ্গে রচনা করেন যথা, (১) স্বেচ্ছায় যাহারা নাম রেজেষ্ট্রী করে নাই তাহারা এবং (২) নবাগতরা এই আইনের আওতায় পড়িবে। এজাতীয় বিশ্বাসভঙ্গে ভারতবাসী স্তম্ভিত হইয়া যায় এবং গান্ধিজীও জেঃ স্মাট্‌সের রাজনীতিক চালে বিমূঢ় হন। এই অবসরে ভারতীয়দের মধ্যে গান্ধিজী-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ নীতি এবং কূটনীতিক আলোচনায় সরল বিশ্বাস আমদানীর প্রচুর সমালোচনা হয়।

ইত্যবসরে চুক্তি-ভঙ্গের বিষয় জেঃ স্মাট্‌সের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কোন ফল হয় না; কাজেই ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের তরফ হইতে চরমপত্র দেওয়া হয়। উহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে ভারতীয়রা পূর্ব-সংগৃহীত অনুমতিপত্র প্রকাশ্য জনসভায় অগ্নিকুণ্ডে ভস্ম করিয়া ফেলে।

পক্ষান্তরে আর একজনও ভারতীয় যাহাতে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে জেঃ স্মাট্‌স "ইমিগ্রেসন রেষ্ট্রীকসন অ্যাক্ট" বা নূতন লোক আমদানী নিয়ন্ত্রণ আইন নামক আর একটি আইন ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করেন। ভারতীয় সম্প্রদায় ইহারও বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং উক্ত আইন ভঙ্গের অপরাধে বহু বিশিষ্ট ভারতীয়ের কারাদণ্ড হয়।

কর্তৃপক্ষ উদ্ব্যস্ত হইয়া ধরপাকড় আরম্ভ করে; ইহার ফলে কারাগার ভারতীয় কয়েদীতে ভর্তি হইয়া যায়। গান্ধিজীও দ্বিতীয়বার ধরা পড়েন। কারাগারে বন্দীদিগকে দিয়া অতি জঘন্য ও অমানুষিক কাজ করাইয়া লওয়া হয়, জেলে ও নির্বাসনে কয়েকজনের মৃত্যুও হয়। কিন্তু তাহারা হাসিমুখে সমুদয় নির্যাতন সহ্য করে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ট্রান্সভাল সরকার প্রথমে আইন অমান্যকারীদিগকে ট্রান্সভাল সীমান্ত পার করিয়া দিতে থাকে

এবং উহাতে সুবিধা হয় না দেখিয়া পরিশেষে একটা বড় দলকে জাহাজ যোগে ভারতে নির্বাসিত করে। কিন্তু বহু দুর্ভোগ সত্ত্বেও ভারতীয়গণ অনমনীয় থাকে ; অবশ্য প্রবল নির্যাতনে অনেকে যে দল ও সংকল্পচ্যুত না হয়, এমনও নহে।

তবে ভারতীয়রাও এজাতীয় বে-আইনী নির্বাসনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে ; কাজেই কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হইয়া নির্বাসন ব্যবস্থা রহিত করিতে হয় ।

আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখিয়া সরকার পক্ষ নির্মম হইয়া উঠে। 'ডায়কলুফ' নামক কারাগারে ভারতীয় বন্দীদের উপর অমানুষিক নিপীড়ন করা হয়। ইহাতে অতিষ্ঠ হইয়া বন্দীরা অনশন করে এবং অন্যত্র বদলী না করা ( অনশন ৭দিন স্থায়ী হয় ) পর্যন্ত তাহারা সংকল্পে অবিচলিত থাকে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এই প্রথমবার রাজনীতিক অস্ত্র হিসাবে অনশনের প্রয়োগ।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া রাজনীতিতে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তথাকার ইংরেজ ও বুয়ররা মিলিতভাবে বৃটিশ প্রভাবমুক্ত স্বাতন্ত্র্য কামনা করে। এই হেতু তাহারা আলোচনার উদ্দেশ্যে বিলাতে প্রতিনিধি দল পাঠায়। ভারতীয় সম্প্রদায় উহার মধ্যে নূতন বিপদের ইঙ্গিত দেখিতে পায় ; তাঁহারা বুঝিতে পারে, ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে, তাহাদের মন্দ অবস্থা অধিকতর মন্দ হইবে। কাজেই নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে তদ্বিরের জন্য ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেও বিলাতে আর একটি প্রতিনিধি দল প্রেরিত হয়। কিন্তু তাঁহারা কোন আশ্বাসবাণী বহন করিয়া আনিতে পারেন না। কাজেই যাত্রাপথ দুর্গম বলিয়া ভারতীয়রা নবোদ্যমে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। তবে অসুবিধা হয় সত্যাগ্রহী পরিবারসমূহের ভরণপোষণ লইয়া ; তাহাদের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে জোহান্সবার্গের ২১ মাইল দূরবর্তী ( মিঃ

কলিনবেক নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ শুভার্থীর ক্রীত ৩,৩০০ শত বিঘা ভূসম্পত্তি ) একস্থানে ‘ টলস্টয় গোলাবাড়ী’ নামে এক সাময়িক উপনিবেশ গড়িয়া তোলা হয়। ইহা কার্যত গান্ধিজীর রাজনীতিক পরীক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হয়। তিনি এখানকার অধিবাসীদিগকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল ব্যাপারে আত্মনির্ভর হইতে এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় ব্যাপারে পরমতসহিষ্ণুতা, উদারতা ও সর্বজনীন তত্ত্বের চর্চা করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। অহিংসা সম্পর্কেও তাঁহার নিজস্ব মতামত গড়িয়া উঠে। এখানে মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকই ছিল ; তাহাদিগকে আহার, বিহার, স্বাস্থ্যপালন ও আচরণবিধি সম্পর্কে গান্ধিজীর উদ্ভাবিত এক অভিনব ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রনাধীন থাকিতে হয়। পরবর্তীকালে গান্ধিজী ভারতের সবরমতী ( গুজরাট )বা ওয়ার্ধার ( মধ্যপ্রদেশ ) আশ্রমে বা সেবাগ্রামে কর্মী গড়িবাব উদ্দেশ্য গ্রামসেবা দল গঠনে যে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেন, টলস্টয় গোলাবাড়ীতেই তাহার প্রথম সূচনা।

দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সালে ভারতীয়দের মধ্যে কিছুটা অবসাদ দেখা দেয়। ঐ সময় প্রথিতযশা নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে দক্ষিণ আফ্রিকায় উপস্থিত হইলে ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় ; তিনি কর্তৃপক্ষের সহিত এতদিনের বিতর্কমূলক ও অপমানজনক আইন রদের বিষয় আলোচনা করেন। তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে এক বৎসরের মধ্যে এশিয়াবাসী সংক্রান্ত আইন রদ, বহিরাগত আমদানী আইন হইতে বর্ণভেদ ব্যবস্থা রহিত ও জিজিয়া কর রদ হইবে। কিন্তু জেঃ স্মাট্‌স পূর্ববারের মত এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

এরূপ অবস্থায় ভারতীয়দের পক্ষে বিপুল উদ্যমে পুনরায় আন্দোলন শুরু করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ইতিমধ্যে খৃষ্ট ধর্মানুমোদিত রেজেষ্টারী বিবাহ ব্যতীত অন্য জাতীয় বিবাহ আইনসম্মত নহে বলিয়া আদালতে সিদ্ধান্ত

হওয়ায় আইনের চক্ষে ভারতীয় নারীরা রক্ষিতার স্তরে অবনমিত হয় ; কাজেই ভারতীয় সমাজ অধিকতর চঞ্চল ও ধৈর্যহারা হইয়া পড়ে ; নারীরাও নিজেদের মানসম্মান রক্ষা কল্পে সত্যাগ্রহ সংগ্রামে পুরুষদের সহিত যোগ দিতে প্রবৃদ্ধ হয়। প্রথমদিকে 'টলস্টয় গোলা বাড়ী'-বাসিনী ১১ জন ও ফিনিক্সএর ১৬ জন অভিজাত মহিলার সহিত গান্ধী-পত্নী কস্তুরবাও আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই ব্যাপারের পর হইতে সত্যাগ্রহে নূতন অধ্যায় শুরু হয় ; উহাতে নূতন শক্তির সংযোগ ঘটে। বিদেশী কারাগার ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কুব্যবস্থা যখন বীর পুরুষদেরও অজ্ঞাত ভীতিস্থল বলিয়া পরিগণিত তখন ভারতীয় নারীদের পক্ষে স্বেচ্ছায় সর্ববিধ লাঞ্ছনা বরণ করা নিঃসন্দেহে অসীম সাহস, বীর্য ও মহত্ত্বব্যঞ্জক। তাঁহাদের কারাবরণে সুদূরপ্রসারী ফল লাভ হয় ; দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন সমাজ চেতনা দেখা দেয় ; ভারতের সপ্রশংস দৃষ্টিও আন্দোলনের প্রতি নিবদ্ধ হয়।

পূর্বপরিকল্পিত কার্যক্রম অনুযায়ী যেসব মহিলা ট্রান্সভাল সীমানা অতিক্রম করেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে কারাবরণ করিতে হয় ; ইহার ফলে কাহারও কাহারও গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ এমনকি মৃত্যু পর্যন্তও হয়। আবার যাঁহারা গ্রেপ্তার হন না, তাঁহারা নাতালের কয়লা খনিকেন্দ্র নিউ ক্যাস্‌ল-এর ভারতীয় মজুরদের মধ্যে কর্মত্যাগের জন্য প্রচার সুরু করেন। ইহাতে অভূতপূর্ব গণজাগরণ দেখা দেয় ; শ্রমিকরা দলে দলে (প্রায় ৫ হাজার) কাজ ছাড়িয়া দেওয়ায় শ্বেতাঙ্গ খনি মালিকদের খনির কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে তাহাদের চৈতন্যোদয় হয়।

ইহার ফলে খনির মালিকদের সহিত গান্ধিজীর বৈঠক হয় ; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে প্রকারান্তরে ভীতি প্রদর্শন করায় বৈঠক ভাঙ্গিয়া যায় ; ভারতীয় মজুররাও, বিনানুমতিতে ট্রান্সভাল প্রবেশ করিয়া আইন ভঙ্গ করিবে বলিয়া স্থির করে। এই ঘটনা ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে ঘটে।

২ হাজার ৩৭ জন পুরুষ, ১২৭ জন মহিলা ও ৫৭ জন বালকবালিকা লইয়া গঠিত সত্যাগ্রহী দল আইন অমান্যের উদ্দেশ্যে ট্রান্সভালের পথে রওনা হইলে চারদিনের মধ্যে দলনেতা গান্ধিজীকে তিনবার গ্রেপ্তার করা হয়। পূর্বে দুইবার তিনি জামিনে মুক্তি পাইয়া অগ্রসরমান দলের সহিত মিলিত হইতে পারিলেও তৃতীয়বার গ্রেপ্তারের পর তাঁহার নয় মাস কারাবাস হয়। অধিকন্তু কর্তৃপক্ষ হেডলবার্গে সমগ্র অভিযাত্রীদল এবং অন্যত্র গান্ধিজীর শ্বেতাঙ্গ সহযোগী ও বান্ধব মিঃ কলিনবেক এবং মিঃ পোলককে গ্রেপ্তার করে। শেষোক্ত দুইজনের প্রতি ৩ মাস করিয়া কারাবাসের আদেশ হয়।

কিন্তু সরকারী চণ্ডনীতি বৃথা; ইহাতে নাতালের চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় মজুররা অধিকতর আন্দোলিত হইয়া উঠে; জনসাধারণও দলেদলে ট্রান্সভাল প্রবেশ করিয়া গ্রেপ্তার হইতে থাকে। এদিকে খনির ভারতীয় মজুরদের দিয়া বলপূর্বক কাজ করাইয়া লইবার ব্যবস্থা করায় তাহারা কাজ করিতে অস্বীকার করে। ইহার ফলে তাহাদের উপর অকথ্য ও নির্মম অত্যাচার চলিতে থাকে।

পক্ষান্তরে কারাবরণ ও খনি শ্রমিকদের হরতালের সংবাদ বিদ্যুৎবেগে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ায় গান্ধিজীর সতর্কতা সত্ত্বেও * উত্তর ও দক্ষিণ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের ষাট হাজার ভারতীয় শ্রমিক হরতালে যোগ দেয়। ইহাতে কর্তৃপক্ষ ঘাবড়াইয়া যায়; তাহারা বেআইনীভাবে গুলি চালাইয়া অনেককে হতাহত করে; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দরিদ্র ও নির্যাতিত শ্রেণীর ভারতীয়গণ অধিকতর সংহতভাবে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চালাইতে থাকে।

কর্তৃপক্ষের অত্যাচার কাহিনী ভারতে প্রচারিত হইলে সমগ্র দেশে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়; ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ পর্যন্ত

* 'জেলে যাওয়ার সময় সঙ্গীদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম যে, তাহারা যেন সকল মজুরকে হরতাল করিতে না দেন।'—গান্ধিজী রচিত দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ।

প্রচলিত সরকারী নজীর অনুযায়ী আর চুপ করিয়া থাকিতে অসমর্থ হন। তিনি ইউনিয়ন সরকারের অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া সত্যাগ্রহীদের কার্যকলাপ সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে বেসরকারী তরফে গোখ্‌লে ভারত হইতে মহামতি ক্রীয়ার এণ্ড্রুজ ও মিঃ পিয়ার্সনকে সত্যাগ্রহে সহায়তার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠান।

একদিকে সহস্র সহস্র সত্যাগ্রহীর * কারা ও দুঃখ বরণ, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মতামতের চাপে পড়িয়া ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে। তবে ভারতীয় সম্প্রদায় সত্যাগ্রহীদের মুক্তিদান ও কমিশনে একজন ভারতীয়কে গ্রহণ করা না হইলে উহাতে সহযোগিতা করিতে অসম্মত হয়; কিন্তু সরকার প্রথম সর্ত মানিয়া লইলেও দ্বিতীয় সর্ত মানিয়া নেয় না; ইহার ফলে পুনরায় আইন অমান্যের উদ্যোগ হয়।

এই সময় ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাস। রেলপথের শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা জোর ধর্মঘট আরম্ভ করায় ইউনিয়ন সরকার বিপন্ন হইয়া পড়ে; তাহাদিগকে সামরিক আইন জারী করিতে হয়। কিন্তু গান্ধিজী এই সুযোগ গ্রহণ না করিয়া আইন অমান্য স্থগিত রাখেন (রেল ধর্মঘট শেষ না হওয়া পর্যন্ত)। শত্রুকেও সংকটকালে ব্যতিব্যস্ত করা ন্যায়ানুমোদিত নহে, এমনকি তখনও তাহাকে সুযোগমত সহায়তা করিয়া তাহার বিরোধিতা জয় করা, তাহার বিবেকবোধ জাগ্রত ও সহানুভূতি-আকর্ষণ করাই হইল গান্ধিজীর মতে সত্যাগ্রহীর মূল নীতি। সংগ্রামকালে মহাত্মাজীর এজাতীয় নেতৃত্ব জনসাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। যাহা হউক ইউনিয়ন সরকার আপোষ মীমাংসার ব্যাপারে কোনক্রমে নিজেদের মুখ রক্ষার ভাব বজায় রাখিয়া গান্ধী-স্মাট্‌স সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে; ভারত সরকারের তরফ হইতে মিঃ বেঞ্জামিন রবার্টসন গান্ধিজীকে সহায়তার জন্য প্রেটোরিয়ায় উপস্থিত হন। কিন্তু

* মোট সাড়ে তিন হাজার সত্যাগ্রহী দণ্ডিত হয়।

বৃটিশ রাজকর্মচারীদের অনুসৃত চিরাচরিত ভেদবুদ্ধি প্রয়োগের নীতি অনুযায়ী তিনি প্রথম হইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি ও সত্যাগ্রহীদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। অবশ্য পরে তাঁহাকে উক্ত অপকৌশল বাধ্য হইয়াই ত্যাগ করিত হয়।

এইভাবে প্রাথমিক মিটমাটের সময় যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করার বিষয়ে কথা উঠে তখন ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে একদল উহার তুমুল বিরেধিতা করেন। তাঁহারা এই প্রসঙ্গে জেঃ স্মাট্সের বিশ্বাসভঙ্গের পূর্বতন নজীর দেখাইয়া ভারতীয়দের দাবী আদায়ের জন্য সত্যাগ্রহ চালাইবার পক্ষে যুক্তি দেখান; কিন্তু গান্ধিজী সত্যাগ্রহের নীতি অনুসারে বারংবার বিশ্বাসভঙ্গকারীর প্রতিশ্রুতিতেও আস্থা স্থাপনের জন্য সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন জানান।

ভারতীয় সম্প্রদায় অবশ্য নীতি হিসাবে কমিশন বর্জন করে। তবে কমিশন তাহাদের মূল দাবী যথা, মাথাপ্রতি তিন পাউণ্ড কর রদ, ভারতীয়দের ধর্মানুমোদিত বিবাহ আইনত সিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা এবং আরও কয়টি ছোটখাট বিষয় —স্বীকার করিয়া নেওয়ার সুপারিশ করে। কিন্তু তদ্দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের বসবাস, জমির স্বত্ব লাভ ও ব্যবসা সম্পর্কিত মৌলিক ব্যাপারে কোনরূপ সুরাহা হয় না; এমনকি প্রদেশান্তর গমন ব্যবস্থা ও বিবাহ সংক্রান্ত বিধানও সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও গান্ধিজী সম্প্রদায়কে চূড়ান্ত অধিকারলাভের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে উহা মানিয়া নিতে বলেন। *

---

* "ট্রেড লাইসেন্স বিল, গোল্ড ল, ট্রান্সভাল টাউনশিপ অ্যাক্ট ও ১৮৮৫ সালের ট্রান্সভালের তিন আইনের কোনও পরিবর্তন হয় নাই; আর ইহা না হইলে বসবাস, ব্যবসা ও জমির স্বত্বলাভ সম্পর্কে পূর্ণ অধিকার জন্মে না। এই হেতু আমার সব বন্ধু খুশী হইতে পারেন নাই।" ইত্যাদি—১৯১৪ সালের ৩০শে জুন সত্যাগ্রহ সংগ্রামের অবসান ঘোষণা করিয়া জেঃ স্মাট্সের নিকট লিখিত গান্ধিজীর পত্র।

এইভাবে উভয়পক্ষের মানরক্ষা হইতে পারে এরূপ একটি রফামূলক বন্দোবস্ত হইলে সুদীর্ঘ আট বৎসর ব্যাপী সংগ্রামের অবসান ঘটে। গান্ধিজীও একুশ বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় অতিবাহিত করার পর তাঁহার রাজনীতিক গুরু গোখ্‌লের অধীনে দেশসেবা করার উদ্দেশ্যে ভারত যাত্রা করেন। ভারতে পৌঁছিয়া গান্ধিজী কিছু দিন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে (বোলপুর, বীরভূম) অবস্থান করেন। * কিন্তু গোখ্‌লের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া (১৯১৫, ফেব্রুয়ারী) পুনার দিকে রওনা হইয়া যান। ঐসময় মহামতি এণ্ড্রুজের এক প্রশ্নোত্তরে গান্ধিজী বলেন,—অহিংসা ও সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হইতে জনসাধারণের বছর পাঁচেক সময় লাগিবে। তবে তিনি ইতিমধ্যে গোখ্‌লের উপদেশ অনুযায়ী সবিস্তারে ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যা অনুধাবনের জন্য অনুসন্ধিৎসুর মনোভাব লইয়া ব্যাপক সফরে রত হন; কংগ্রেস আন্দোলনের সহিতও তিনি নিবিড় সংযোগ রক্ষা করিয়া মিসেস্ অ্যানি বেসান্ত-প্রবর্তিত হোমরুল আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। উহাতে আন্দোলন প্রবলতর হইয়া উঠে। ইহাকে তাহার ভাবী ভারতব্যাপী রাজনীতিক সংগ্রামের উদ্যোগ পর্ব বলা যাইতে পারে।

## রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণী

মুসলীম লীগ সৃষ্টির পর হইতে ১৯০৯ সালে মর্লে-মিণ্টো শাসনসংস্কার পর্যন্ত অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে বৃটিশ শাসনের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য লক্ষ্য করা গিয়াছে। ইহার মূল হেতু দ্বিবিধ, যথা প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব এবং সমগ্রভাবে সমাজের অনগ্রসরতা ও রক্ষণশীলতা। কিন্তু একথাও সত্য, গত শতাব্দীর অষ্টমপাদে স্যর সৈয়দ আহম্মদ কর্তৃক

* এই সময় রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজীকে 'মহাত্মা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে (নবাব, জমিদার, ওমরাহ) শিক্ষার প্রসার ঘটিতে থাকায় তাহাদের মধ্যে নব জাগরণের সূত্রপাত হয়; অথচ যে-পথে ও যে-পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল, মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাহা মূলত ভিন্নতর হয়। প্রথমদিকে বিজয়ী ইংরেজের সংস্কৃতি ও শিক্ষা পর্যন্ত বর্জন করিয়া পরবর্তীকালে ক্ষতিপূরণের আশায় যখন তাহাদের মধ্যে নূতনভাবে শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা হয় তখন তাহা স্বভাবতই প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়ে। অধিকন্তু মুসলমান শিক্ষাআন্দোলনের নেতা স্যর সৈয়দের দৃষ্টিভঙ্গিও ইহাকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে। তিনি চাহিয়াছিলেন, শিক্ষিত মুসলমান শ্রেণী ইংরেজের নিকট হইতে সুবিধা আদায় করিয়া শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করুক। এইদিক হইতেই তিনি চাকুরিয়া বাঙালী শ্রেণীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উদ্যমের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। আর মুসলমানরা সমগ্রভাবে ইংরেজবিরোধী নহে,—ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া তিনি প্রগতিশীল ও বামপন্থী কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতে থাকেন। ইংরেজরাও উহার পূর্ণ সুযোগ লইয়া তাঁহাকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। কংগ্রেস হিন্দু-প্রভাবিত বলিয়াই তিনি আদৌ উহার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হন না, উহা ক্রমশ ইংরেজ-বিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছে দেখিয়াই তিনি সর্বোপায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজবিরোধী মনোবৃত্তির প্রসার রোধে উদ্যত হন। কিন্তু তিনি অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে মুসলমান সমাজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবার পক্ষপাতী মোটেই ছিলেন না; হিন্দু ও মুসলমানের জাতীয়ত্ব সম্পর্কেও তাঁহার মতামত স্পষ্ট ছিল। তিনি বলেন—"অপনারা কি একই দেশে বসবাস করেন না? মনে রাখিবেন, হিন্দু ও মুসলমান শব্দ দুইটির দ্বারা ধর্মীয় পার্থক্যই সূচিত হয়; তাহা না হইলে এদেশবাসী হিন্দু, মুসলমান ও এমনকি খৃষ্টানরা পর্যন্ত একই জাতির অন্তর্ভুক্ত।"

তিনি আরও বলিয়াছিলেন, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান 'একটি রূপসী নারীর অক্ষি-যুগল সদৃশ; উহাদের একের ক্ষতি না করিয়া অন্যের উপর আঘাত হানা অসম্ভব।'

এইভাবে সংস্কারপন্থী স্যর সৈয়দ একদিকে যেমন স্বসমাজের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির বাঁধ ভাঙ্গিয়া আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত ইসলামধর্মের সামঞ্জস্য বিধানে তৎপর হইয়াছিলেন, তেমনি সামাজিক কুসংস্কার ( যথা পর্দা প্রথা ) দূর করিতেও তিনি উদ্যোগী হন। ইহা সত্ত্বেও তিনি তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধতা করেন। অর্থাৎ শাসকশক্তির সহযোগিতা ও সাহায্যে পশ্চাদপদ স্বসম্প্রদায়ের মঙ্গলকামনায় তিনি বহির্ভারতীয় মুসলমান-স্বার্থ এবং প্রভাবও অস্বীকার করেন। তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন, মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ-অনুগত শিক্ষা পদ্ধতির প্রচার ও প্রসার দ্বারাই মুসলমানদের মঙ্গল করিবেন। ইহার ফলে আলীগড়ে শিক্ষিত অভিজাত মুসলমানগণ ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন আশা ও আলোক লইয়া উপস্থিত হন। কিন্তু এই আলীগড় গোষ্ঠীর অন্তর্মণ্ডলভুক্ত সদস্যদের প্রায় সকলেই সামন্ত শ্রেণীর। তাঁহারা একাধারে আধুনিক শিক্ষার অনুকূল ও রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার অনুগত হওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত নেতৃত্বের উদ্ভব হইতে ও তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর রূপান্তর ঘটিতে বিলম্ব হয়। ইংরেজরাও নব্য জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালনার ব্যাপারে শিক্ষিত মুসলমানদের সহায়তা লইয়া ভারতে দ্বিজাতিত্বের তত্ত্ব ও ভেদবুদ্ধি প্রচারে রত হয়। এমনকি আলীগড় কলেজের প্রথম দুইজন ইংরেজ অধ্যক্ষ ( যথা মেসার্স বেক ও আর্চবল্ড ) সরলপ্রাণ মুসলমান যুবকদের মধ্যে ভেদনীতির প্রচারে এবং শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেও সাম্প্রদায়িক বিষ সংক্রামিত করিতে সমর্থ হয়। *

---

* মিঃ বেক ১৮৮৩ সালে আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতে আসেন। তিনি স্যর

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বহু স্থিতধী ও সমাজহিতৈষী বিশিষ্ট মুসলমান রাষ্ট্রীয় মহাসভার কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উহাতে যোগ দেন; বিপ্লবী ওয়াহাবী সম্প্রদায় ত কংগ্রেসের মধ্যেই মুসলমান সমাজের মুক্তি নিহিত বলিয়া অনুভব করে। সিয়া সম্প্রদায়ও অগ্রগামী চিন্তাধারার সহিত তাল রাখিয়া চলে। কাজেই বৃটিশ সরকার যেমন চাকরির ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা নীতি অনুযায়ী শিক্ষিত মুসলমান ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক আমদানী করিয়া শাসনব্যাপারে শ্রেণীবিশেষের প্রাধান্য নষ্ট করিয়া ফেলে, তেমনি কংগ্রেসের প্রভাব হইতে শ্রেণী হিসাবে মুসলমানকে পৃথক করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মুসলীম লীগ স্থাপনে সমর্থন ও প্রত্যক্ষ উৎসাহ যোগায়। স্বসম্প্রদায়ের অগ্রগামী দল হিসাবে এই কাজেও প্রধানত 'আলীগড় গোষ্ঠীই' অগ্রণী হন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবার দুইটি চিন্তাধারার উদ্ভব হয়; ইহাদের একশ্রেণী জাতীয়তার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং অন্যশ্রেণী ভারতের অতীত ও অল্প পরিমাণে বর্তমান ঐতিহ্য হইতে

---

সৈয়দের দুর্বলতার সুযোগে তাঁহাকে দিয়া 'পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশনের' গোড়া পত্তন করান। তিনি একশ্রেণীর মুসলমান বুদ্ধিজীবীর মধ্যে এই বিষ সংক্রামিত করাইতে সমর্থ হন যে, দেশে দুইটি আন্দোলন চলিতেছে যথা 'জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন ও গোহত্যা বন্ধের আন্দোলন'; এবং 'উভয় আন্দোলনের শিকারই হইল ইংরেজ ও মুসলমান।' অধিকন্তু, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবজাগ্রত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর অখণ্ড জাতীয় মনোভাব খণ্ডিত করার প্রথম উদ্যম হিসাবে বঙ্গভঙ্গের অথবা হিন্দুপ্রধান অঞ্চল ও মুসলমান-প্রধান অঞ্চল (পাকিস্থানের বীজ) স্থাপনের প্রথম অপচেষ্টা করেন লর্ড কার্জন। তাঁহারই প্রেরণায় এবং মিঃ আর্চবন্ডের কুমন্ত্রণায় লীগের জন্ম। শুধু ইহাতেও শেষ নহে; তাঁহাদের ও তৎকালীন ভারতসচিব মিঃ মর্লের সম্মিলিত পরিকল্পনার ফলে ১৯০৯ সালে পৃথক নির্বাচনের ধারা সহ শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হয়। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, তৎকালে আলীগড় গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে যেসব প্রগতিশীল মুসলমান নেতা দণ্ডায়মান হন, তন্মধ্যে তরুণ জাতীয় নেতা ব্যারিষ্টার মিঃ মহম্মদআলী জিন্না ছিলেন অগ্রণী। Vide—Muslim Politics in India—By W. C Smith; Minerva press, Lahore.

নিজেদের বিযুক্ত করিয়া মধ্য প্রাচ্যের ঐশ্লামিক দেশ বিশেষত খিলাফৎ ও মোসলেম জগতের ধর্মগুরুর বাসভূমি তুরস্কের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। অধিকন্তু তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ অখিল ঐশ্লামিক আন্দোলনকে উৎসাহিত করায় এদেশে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে কিছুটা সাড়া জাগে; কিন্তু স্যর সৈয়দ উহা সমর্থন করেন নাই। ইহা সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐশ্লামিক সংস্কৃতির কেন্দ্র ও রাষ্ট্র হিসাবে তুরস্কের প্রতি একটা মমত্ববোধ জাগ্রত হয়; তাহা ছাড়া তুরস্কের সুলতান মুসলমানদের খলিফা বা ধর্মগুরু; তুরস্ক য়ুরোপের শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রগুলির আক্রমণ স্থল হওয়ায়ও তাঁহারা উহাদের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিতে থাকেন।

বঙ্গভঙ্গের সময় প্রকাশ্যে মুসলমান-প্রীতির ভান করিয়া শাসন-কর্তৃপক্ষ যে-ভেদনীতির আমদানী করে, তাহা মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কারে পৃথক নির্বাচন প্রথার মধ্যে আইনগত মর্যাদা পাইয়া কায়েম হয়। ইহাতে লীগের রক্ষণশীল শ্রেণী এবং সুবিধাবাদী চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রথমদিকে সন্তুষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু একমাত্র পৃথক নির্বাচন বাদে অন্যবিধ সুবিধা তাহাদের অধিগম্য হয় না। সরকারী চাকরির দুরধিগম্য দুর্গগুলি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের নিকটই অলভ্য থাকিয়া যায়। কাজেই সরকারভক্ত শ্রেণীর মধ্যেও অসন্তোষ বিসর্পিত হইতে থাকে। অধিকন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হওয়ায় চাকরি-প্রাপ্তির অতিরিক্ত সুবিধাটুকুও নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। সুবিধাবাদী শাসকশ্রেণী একশ্রেণীর মুসলমানকে লোভ দেখাইয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে উস্কাইয়া দেয় এবং প্রয়োজনমত নিজের সুবিধাটুকু আদায় করিয়া তাহাদের প্রতি অনাদর দেখাইতে থাকে।

ভারতের আভ্যন্তরীন রাজনীতির সর্পিল গতিপ্রকৃতিতে একশ্রেণীর মুসলমান যখন বিভ্রান্ত, তখন ভারতীয় মুসলমানদের শেষ ভরসাস্থল তুরস্কের বিরুদ্ধে য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলি একযোগে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে; তাহারা

'য়ুরোপের রুগ্ন মানুষ' তুরস্ককে খাস য়ুরোপ হইতে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ করে।* এই হেতু ১৯১১ সালে ইতালী অকস্মাৎ তুরস্কের বিরুদ্ধে ত্রিপলীর যুদ্ধে যোগ দেয় এবং পরবর্তী কালে ১৯১২ ও '১৩ সালে বল্কান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। ঐ সব যুদ্ধে তুরস্কের প্রতি বৃটিশ সরকারের আচরণও ভারতীয় মুসলমানের নিকট নিতান্তই নির্মম ও অসহনীয় বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাহারা ইহাকে ব্যক্তিগত আঘাত ও ক্ষতি বলিয়া মনে করে; সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রসমূহের আঘাতে জর্জর দুর্বল তুরস্কের প্রতি ভারতবাসীও সহানুভূতিশীল হইয়া উঠে। কংগ্রেসের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ এম, এ, আন্সারীর নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবক লইয়া গঠিত একটি মেডিক্যাল মিশন তুরস্ক যাত্রা করে; ইহার জন্য যে ধনভাণ্ডার খোলা হয় তাহাতে দরিদ্রতম মুসলমান পর্যন্ত চাঁদা দেয়।

ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর চাপে ভারতের সর্বশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে উভয়-সংকট উপস্থিত হয় এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহাদের দ্রুত মনোভাবের পরিবর্তন হইতে থাকে। ঐসময় ঐশ্লামিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও কূটতার্কিক চতুর্বিংশ বয়স্ক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-চালিত (কংগ্রেসের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি) উর্দু সাপ্তাহিক 'আল-হিলাল' (১৯১২ সালে স্থাপিত) এবং মৌলানা মহম্মদ আলী (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি) সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'কমরেড' ('আল-হিলালের' কয়েক মাস পূর্বে বাহির হয়) মুসলমান সম্প্রদায়কে বিশেষ করিয়া মুসলমান যুবকদিগকে প্রভাবিত করিয়া বৃটেন সম্পর্কে নূতন মনোভাব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। আবুল কালাম আজাদ মিশরের আল আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করেন এবং তিনি স্বয়ং মিশর, তুরস্ক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক ও ইরানের বিশিষ্ট মুসলমান

* আরব, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, (ইরাক) ও এসিয়া মাইনর তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নেতৃবৃন্দ ও নবোদ্ভূত স্বাদেশিক মনোভাবের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রসমূহের ষড়যন্ত্রে তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু তিনি 'আল্-হিলালের' মারফৎ মুসলমানদের মধ্যে অখণ্ডনীয় যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া ভারতীয় মুসলমানদের পথ প্রদর্শন করিতে থাকেন; অধিকন্তু তাঁহার তর্কের ধারা মধ্যযুগীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামির সংস্পর্শ-বর্জিত নূতন অনুভূতি লইয়া উপস্থিত হয়। প্রাচীনপন্থী ভারতীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দ শুধু ধর্মীয় কারণে তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিশীল হন। কিন্তু তাঁহারা তুরস্কের জাতীয়তাবাদী ও অন্যবিধ বৈষয়িক আন্দোলনকে সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। অথচ আজাদের প্রবন্ধে মুসলমান যুবকদিগকে এক নূতন জগতের সন্ধান আনিয়া দেয়; উহা ধর্মীয় সংস্কারের সহিত জাতীয়তাবাদের সংমিশ্রণে অপূর্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কাজেই তাঁহার লেখার আবেদনও স্বভাবতই বৃটিশ-বিরোধী হইয়া পড়ে।

পক্ষান্তরে যে-'আলীগড় গোষ্ঠী' ভারতে শিক্ষিত মুসলমান সমাজের পথ প্রদর্শকরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল সরকারী চাকরি রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁহারা রক্ষণশীলতাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ইহার ফলে অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমানই জাতীয়তাবিরোধী, স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ ও আত্মতুষ্ট হইয়া পড়েন; কাজেই বৃহত্তর মুসলমান সমাজ পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যেও নিশ্চল থাকিয়া যায়। আলীগড় কলেজের পরিচালক ও শিক্ষাদাতাদের সামন্ততান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব ও পরিবেশই ইহার জন্য দায়ী। আজাদ এই রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবিরোধী মনোভাব নষ্ট করিবার জন্য ঐশ্লামিক দেশের আন্দোলন কাহিনী পাঠক সমাজের নিকট তুলিয়া ধরেন; তিনি দেখাইয়া দেন, ভারতীয় জাতীয়তার সহিত ইশ্লাম ও ঐশ্লামিক দেশের প্রতি সহানুভূতির কোন বিরোধ নাই। ইহার ফলে মস্তিষ্কজীবী মুসলমান শ্রেণীর মধ্যে নূতন চেতনার উন্মেষ হইতে থাকে।

কিন্তু ইহাতে ভারত সরকার শংকিত হইয়া পড়ে। মুসলমান সমাজকে বৃটিশ-বিরোধী করিয়া তোলার অপরাধে ১৯১৪ সালে মুদ্রাযন্ত্র আইন অনুযায়ী 'আল-হিলালের' ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করিয়া নেওয়া হয়। অতঃপর 'আল-বলাগ' নামক অপর একটি সাপ্তাহিকও আজাদ সাহেব প্রকাশ করেন; কিন্তু তাহাও ১৯১৬ সালে উঠিয়া যায়; গবর্ণমেণ্ট আজাদকে বৃটিশবিরোধিতার অজুহাতে ভারতরক্ষা বিধানে অন্তরীন করেন।

বুদ্ধিজীবী মুসলমান সমাজের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ ঘটাইতে মৌলানা মহম্মদ আলী-সম্পাদিত 'কমরেড'ও কম সহায়তা করে না। জীবনের প্রারম্ভে তিনি রক্ষণশীল ছিলেন এবং বৃটিশ ন্যায়পরায়ণতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাও কম ছিল না। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর তিনি ইংরেজের আন্তরিকতায় আস্থাহীন হইয়া পড়েন। অধিকন্তু বল্কান যুদ্ধে তুরস্কের উপর সম্মিলিত আঘাত হানায় তিনি ঘোর বৃটিশদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মাণীর পক্ষে যোগ দিবার পর হইতে তিনি প্রকাশ্যে তুরস্ককে সমর্থন করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন। ইহার ফলে শাসন কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতা 'হামদাদ' সম্পাদক মৌলানা সৌকত আলীকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে এবং 'কমরেড' প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেয়।

এইভাবে শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের মধ্যে বৃটিশ-বিরোধী চেতনা জাগ্রত হইবার সঙ্গে ইংরেজ-ভক্ত মুসলীম লীগ পর্যন্ত কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুগোপযোগী জাতীয়তাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় মহাসভার আদর্শ ও উদ্দেশ্যে দ্বারা প্রভাবিত হয়। অবশেষে ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক মাননীয় আগা খাঁর নেতৃত্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত লীগ সম্মেলনে মোসলেম লীগের প্রতিষ্ঠানিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে কংগ্রেসের অনুরূপ বৃটেনের অধীনে

স্বায়ত্তশাসন লাভের আদর্শ গ্রহণ করে। কংগ্রেসও ১৯১৩ সালের করাচী অধিবেশনে লীগকে এই হেতু অভিনন্দন জানান। অধিকন্তু লীগ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় কংগ্রেস সভাপতি সন্তোষ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

রক্ষণশীলতার দুর্গ এবং সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার মধ্যে আধুনিকতা ও জাতীয়তার নির্মলধারা প্রবেশ করায় লীগও ক্রমশ গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হইতে থাকে এবং মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণীর উদ্ভব হওয়ায় তাহারা আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া উপস্থিত হন।

অবশ্য ইতিপূর্বে লীগ-বহির্ভূত বহু নবীন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাও কংগ্রেসে ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে আবদুল রসুল, সৈয়দ আলী ইমাম, মহম্মদ আলী জিন্না (বর্তমানে কায়েদ-এ-আজম জিন্না) হাসান ইমাম, লিয়াকৎ হোসেন আলী, ওয়াজির হাসান, মজ্‌হ্‌রুল হক প্রমুখ ব্যক্তিগণ সমধিক প্রসিদ্ধ। মর্লে-মিণ্টো শাসন সংস্কারে পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে ইঁহারা প্রবল আপত্তি জানাইয়াও ব্যর্থ হন।

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে য়ুরোপে মহাসমর আরম্ভ হয় এবং তুরস্ক বৃটিশবৈরী জার্মানীর সহিত যোগ দেয়। কাজেই লীগের মধ্যেও বৃটিশ-বিরোধিতার ভাব প্রবলতর হইয়া উঠে। লীগ কর্ণধারগণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধতার সংকল্প লইয়া কংগ্রেসে যোগদানে ইচ্ছুক হন।

কিন্তু কংগ্রেস তখনও নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্বে শক্তিহীন ও দ্বিধাবিভক্ত। ইহা সত্ত্বেও কংগ্রেসের মধ্যে আশু স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মতবাদ গড়িয়া উঠে। এই ব্যাপারে লীগের কণ্ঠও কংগ্রেসের দাবীর সহিত যুক্ত হয়।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, ১৯১৩ সাল হইতে পরবর্তী কয়েক বৎসর কংগ্রেস ও লীগের বাৎসরিক অধিবেশন একই স্থানে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে একটা হৃদ্যতা ও একত্ব-

বোধ গড়িয়া উঠায় আপোষরফার সুযোগ উপস্থিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ কর্তৃক গঠিত যুক্ত কমিটির সহিত আলোচনার পর একটি শাসন সংস্কারের খসড়া রচনা করিতে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

তদনুযায়ী কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে অনতিবিলম্বে আলোচনা আরম্ভ হয় এবং পরপর কয়েকটি বৈঠক হইবার পর কংগ্রেস-লীগ যুক্ত কমিটি ১৯১৬ সালের ১৭ই নভেম্বর উক্ত খসড়া রচনা শেষ করেন।

ইহারই ভূমিকা হিসাবে অক্টোবর মাসে বড়লাটের ব্যবস্থা পরিষদের ১৯জন নির্বাচিত সভ্য যুদ্ধোত্তর শাসন ব্যবস্থায় সম্ভাব্য সংস্কার সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি লিপি পেশ করেন।* অবশ্য ইহারও পূর্ব হইতে শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং মিসেস অ্যানি বেশান্ত প্রমুখ এবিষয়ে অগ্রণী হন।

১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এবং যথারীতি লীগেরও ঐস্থানেই অধিবেশন হয়। কাজেই বিগত তিন বৎসর একসঙ্গে ও একস্থানে লীগ ও কংগ্রেসের অধিবেশন আহূত হওয়ায় উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এবারের অধিবেশনে কংগ্রেসী নেতৃবর্গ লীগ এবং লীগনেতৃবৃন্দ কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। উভয় প্রতিষ্ঠানেরই মূল আলোচ্য বিষয় ছিল কংগ্রেস-লীগ প্রতিনিধিগণ দ্বারা যুক্তভাবে রচিত ভাবী-শাসন প্রণালীর খসড়া প্রস্তাব। আশানুযায়ী উভয় প্রতিষ্ঠানেই খসড়াটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। লক্ষ্যের বিষয়, এই প্রথমবার ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন সংস্কারের খসড়া

* মদনমোহন মালবীয়, তেজ বাহাদুর সপ্রু, মহম্মদ আলী জিন্না, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দীনশা এদুলজী ওয়াচা, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মজহরুল হক, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ইত্যাদি।

প্রণীত হয়। উহার মধ্যে সুস্পষ্টরূপে ভারত শাসন ব্যবস্থায় ভারতবাসীদের অধিকার লাভের পথ নির্দেশ করা হইয়াছিল।* তবে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতেই হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা হওয়ায় মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কারের মূল ব্যাধি উহারও মধ্যে নিহিত থাকে। ইহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বৃটিশ-প্রভাবমুক্ত ভারতীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা ইহাই শাসন প্রস্তাব রচনার প্রথম সার্থক প্রয়াস। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নিজ স্বার্থ-সিদ্ধি কল্পে পরবর্তী মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারে লীগ-কংগ্রেস রচিত খসড়ার অন্যান্য মূল ধারা বাদ দিয়া শুধু প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমান সদস্যের হার স্বীকার করিয়া নেয়। বাঙলায় শতকরা ৪০, পাঞ্জাবে ৫০, যুক্তপ্রদেশে ৩০, বিহার-উড়িষ্যায় ২৫, মধ্যপ্রদেশে ১৫, মাদ্রাজে ১৫, বোম্বাই-এ মোট সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক তৃতীয়াংশ মুসলমান সদস্য নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়।

অধুনা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই প্রারম্ভিক সর্ত হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়া থাকে; কিন্তু তৎকালে ঐরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে এবং সরকারী অনুশাসন না থাকা সত্ত্বেও মিলিতভাবে শাসন ব্যবস্থার সর্ববাদীসম্মত খসড়া রচিত হইলেও তাহার অংশবিশেষ ছাড়া গবর্ণমেণ্টের নিকট অন্যান্য বিষয় গ্রাহ্য হয় নাই।

* প্রস্তাবিত খসড়ায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্ত ধারা সমূহ সন্নিবিষ্ট ছিল যথা:— ভারত সচিবের কাউন্সিলের বিলোপ, বড়লাটের শাসনপরিষদের অর্ধেক সদস্য পদে ভারতীয় নিয়োগ, দেড়শত সদস্যসহ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ গঠন (উহার চারপঞ্চমাংশ সদস্য প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত হইবে), বাজেটে ভোটাধিকার, প্রাদেশিক আইন সভার সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা সওয়া শত এবং সর্বনিম্ন ৫০ জন এবং উহার চারপঞ্চমাংশ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন, প্রাদেশিক শাসন পরিষদের অর্ধেক সদস্যপদে ভারতীয় নিয়োগ, কেন্দ্রে ও প্রদেশে ভোট-দাতার সংখ্যা প্রসার, প্রদেশের আর্থিক স্বতন্ত্রতা, সৈন্যদলে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার, আইন রচনা ও রাজস্ব বণ্টন প্রভৃতি।

কাজেই সাম্প্রদায়িক ভেদসৃষ্টি করিয়া ভারতশাসন করার চিরাচরিত নীতি অনুসরণে ব্যর্থ হইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তৎকালে বিব্রত বোধ করিতে থাকে। এমনকি মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারকালেও কংগ্রেস ও লীগ সম্মিলিতভাবে লীগ-কংগ্রেস পরিকল্পনার ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা করেন। ইহাতে আর কিছু না হউক, শাসন সংস্কার দানের ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আন্তরিকতার ভান দেখাইবার সুযোগ হইতেও বঞ্চিত হয়।

এইভাবে ১৯১৩ সালে বিবিধ কারণে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে ঐক্য-সূত্র গ্রথিত হয়, তাহারই চরম বিকাশ দেখা যায় ঐক্যবদ্ধ হিন্দু-মুসলমানের অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে। এদিকে জাতির নানা দুর্বিপাকের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠান হিসাবে লীগের রূপান্তর ঘটিতে থাকে এবং উহার গঠনতন্ত্র যেমন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপযোগী হইতে থাকে, তেমনি সামন্ত প্রধানদের হাত হইতে নেতৃত্বও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে আসিয়া পড়ে।

## মত-সঙ্ঘর্ষ ও হোমরুল আন্দোলন

সুরাট দক্ষযজ্ঞের পর কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়। যাঁহারা সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়া দেশের শাসনক্ষমতা ছিনাইয়া নিবার অভিলাষী ছিলেন, তাঁহারা সংখ্যালঘু হওয়ায় নরমপন্থীদের অপকৌশলে বাধ্য হইয়া কংগ্রেসের বাহিরে চলিয়া যান এবং নিজেদের অভীপ্সিত পথে মুক্তি-আন্দোলন চালাইতে থাকেন। ইঁহাদের অনেকে কারাদণ্ড, নির্বাসনদণ্ড, ফাঁসী ও অন্তরীন বরণ করিয়া নেন। পক্ষান্তরে মর্লে-মিণ্টো ভুয়া শাসন সংস্কারের ছিঁটে-ফোঁটায় নরমপন্থীরা পর্যন্ত খুশী হইতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট একদিকে নামমাত্র শাসন সংস্কার করিয়া এবং অন্যদিকে দমননীতি চালাইয়া যাওয়ায় দেশে অসন্তোষের মাত্রা বাড়িতে থাকে। অবশ্য ইতিমধ্যে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় একশ্রেণীর

রাজনীতিক উহাকেই আন্দোলনের জয়লাভ বলিয়া অভিহিত করিয়া আত্মতৃপ্ত হন। কিন্তু সংবাদপত্র দমন আইন, সভাসমিতি বন্ধ আইন এবং অন্যান্য দমনমূলক আইনের জন্য ভারতের জনমত ও কর্মশক্তি রুদ্ধ হইয়া পড়ে। এইহেতু নরমপন্থী-কবলিত কংগ্রেসও একেবারে উদাসীন থাকিতে পারেন না, কংগ্রেসকেও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে হয়। তবে আমলাতন্ত্র শক্তিহীন কংগ্রেসকে তেমন আমল দেয় না।

এহেন অবস্থায় ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক অবস্থাব প্রভাবে ভারতের রাজনীতি দ্বন্দ্বসংকুল হইয়া উঠে। নবোদ্ভূত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীও বৃটিশ বিরোধী হইয়া ক্রমশ কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হন; পক্ষান্তরে বিপ্লব আন্দোলনেও আন্তর্জাতিক অবস্থার সুযোগে নূতন শক্তির সঞ্চার হয়। ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ডিউক অফ ফার্দিনান্দ সার্বিয়া ভ্রমণকালে আততায়ীর হাতে নিহত হন। ইহাকে উপলক্ষ করিয়া ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ বাঁধিয়া যায়। এই ব্যাপারে জার্মানী, তুরস্ক ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী একদিকে, এবং ফ্রান্স, রাশিয়া ও বৃটেন অন্যদিকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কাজেই যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সমগ্র অবস্থার পট-পরিবর্তন হইয়া যায়। আন্তর্জাতিক স্বার্থসংঘর্ষে বৃটেনের স্বার্থবাহী হিসাবে গবর্ণমেণ্ট ভারতকেও ভারতবাসীর বিনানুমতিতে যুদ্ধে নামায়, সাম্রাজ্যস্বার্থের যূপকাষ্ঠে ভারতের অগণিত ধনজন ও সম্পদ বলির ব্যবস্থা হয়। অথচ শ্বেতাঙ্গ শক্তিবর্গের স্বার্থরক্ষার জন্য ঘোষিত যুদ্ধকে সাড়ম্বরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের যুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইতে থাকে। এজাতীয় ঘোষণার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, ক্ষুদ্র ও দাসজাতি সমূহকে উহার আবর্তে টানিয়া আনা।

কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশের পরিবর্তিত ও প্রতিকূল আবহাওয়া বুঝিতে পারিয়া ভারতরক্ষা বিধান ( ১৯১৫ সালের ১৮ই মার্চ গৃহীত ) বলে উত্তর ভারতে বিশেষত বাঙালা ও পাঞ্জাবে অনেককে বিনাবিচারে সন্দেহ-

বশে গ্রেপ্তার ও অন্তরীন করে। এমনকি প্রগতিশীল মুসলমান নেতৃবৃন্দও উহার কবল হইতে মুক্তি পান না। কাজেই নরমপন্থী কংগ্রেস কোনরূপ চিত্তজয়ী কর্মপন্থা দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিতে না পারিলেও তাঁহাকেও সময়ানুপাতে একটি কর্মসূচী উত্থাপন করিতে হয়। এইহেতু আশু স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে কংগ্রেসে দাবী করা হয় এবং ১৯১৪ সালে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু উহা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু দাবী কার্যকর করিয়া তুলিতে হইলে উহার পশ্চাতে প্রবল জনমতের সমর্থন প্রয়োজন। অথচ চরমপন্থী-বর্জিত কংগ্রেস ইতিপূর্বে জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সমর্থনলাভে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে বিপ্লবীদল সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করায় দেশবাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি তাঁহাদের উপর নিবদ্ধ থাকে। শুধু ভাগ্য- বিড়ম্বিত মুসলীম লীগ আপৎকালে কংগ্রেসের দিকে বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারণ করে।

এইভাবে পথনির্দেশ লইয়া যখন সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তখন মিসেস অ্যানি বেশান্ত কংগ্রেসে (১৯১৪ সালে) যোগ দেন।* অথচ এতদিনের নিয়মতন্ত্রসম্মতপথে চালিত কংগ্রেসের কর্মাদর্শ কালোপযোগী করিয়া রচনা করিতে হইলে যেরূপ বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রয়োজন, কংগ্রেসে তজ্জাতীয় নেতৃত্বের অভাববোধ হওয়ায় বেশান্ত প্রথম হইতেই চরম-পন্থী ও নরমপন্থী দলের মধ্যে পুনর্মিলনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। তিনি উপলব্ধি করেন, উভয় দলের অনুসৃত সম্মিলিত কর্মধারাই কংগ্রেসকে পুনরায় জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে। কাজেই লোকমান্য তিলক যখন (১৯১৪ সালের জুন মাস) সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কারাদণ্ড ভোগান্তে কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়া যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে দেশবাসী সকলকে বৃটেনের সমূহ বিপদে

---

* থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির নেত্রী; তিনি তীক্ষ্ণধীসম্পন্না, বাগ্মী ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না ভারতহিতৈষিণী ইংরেজ মহিলা। ভারতসেবার পুরস্কার স্বরূপ তিনি কংগ্রেস সভানেত্রীর পদ লাভ করেন।

সাহায্যদানের জন্য আবেদন জানান এবং বৃটেনের অধীনে ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনলাভকে দেশের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করেন, তখন বেশান্ত এবং অন্যান্য নরমপন্থীরা উহার মধ্যে মিলনের সূত্র খুঁজিয়া পান। কিন্তু ১৯১৫ সালের শেষভাগে স্যর ফিরোজ শাহ মেটার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যাশিত মিলন সম্ভব হয় নাই।

মিসেস বেশান্ত সারা ১৯১৫ সাল ভারতের বিভিন্ন স্থানে নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং জনসভায় বক্তৃতা দিয়া মিলনের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত থাকেন। পক্ষান্তরে যুদ্ধোত্তরকালে শাসন সংস্কার প্রবর্তন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য তিনি ইংরেজী সাপ্তাহিক 'কমনউইল' (১৯১৪, ২রা জুন স্থাপিত) এবং দৈনিক 'নিউ ইণ্ডিয়া' (১৪ই জুলাই) বাহির করেন। উহাতে তিনি ভারত শাসন ব্যবস্থার ভাবী রূপ বর্ণনা করিতে থাকেন। অথচ মডারেট কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের সহিত তেমন যোগাযোগ না রাখায় কংগ্রেস শুধু মহাশয় ব্যক্তিদের বাৎসরিক বিতর্ক বৈঠকে পরিণত হয়। কিন্তু বেশান্ত চাহিয়াছিলেন, কংগ্রেস পুনরায় জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হউক, দুর্গত ও পশ্চাদপদ জনসমাজের মুখপাত্র হউক।

১৯১৫ সালে তাহার প্রচেষ্টা সফল হইবার লক্ষণ দেখা দেয়; ঐ বৎসর বিরোধীদের জন্যও কংগ্রেসের দ্বার উন্মুক্ত হয়; কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের ২০ ধারা পরিবর্তন করিয়া স্থির হয় যে "বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন নিয়মতন্ত্রসম্মত পথে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভই ভারতবাসীর কাম্য; এই উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত অন্যূন দুই বৎসরকাল প্রতিষ্ঠিত যেকোন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভা কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে।"

পক্ষান্তরে তিনি শাসনসংস্কারের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'নিঃ ভাঃ হোমরুল লীগ' স্থাপন করেন। তিলকও এই ব্যাপারে

তাঁহাকে সহায়তার জন্য আগাইয়া আসেন এবং দৈনিক 'কেশরী' ও সাপ্তাহিক 'মারাঠায়' হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন।* কিন্তু আমলাতন্ত্র সনাতন অভ্যাসমত ইহাকে আদৌ সুনজরে দেখিতে পারে না। অধিকন্তু যুদ্ধের জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়া কোনরূপ জনমত গঠন-মূলক আন্দোলনের পোষকতা করিতেও তাহারা অনিচ্ছুক হয়। এই হেতু নানা অজুহাতে 'নিউ ইণ্ডিয়ার' প্রদত্ত দুই হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করার পর পুনরায় ১০ হাজার টাকা জামীন দাবী করা হয়। ইহার বিরুদ্ধে প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করিয়াও কোন সুফল হয় না। পক্ষান্তরে তিলককে এক বৎসরের জন্য সদাচরণের প্রতিশ্রুতিস্বরূপ কুড়ি হাজার টাকার একটি এবং দশ হাজার টাকার দুইটি ব্যক্তিগত জামিন দিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু উহার বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে বোম্বাই হাইকোর্ট ১৯১৬ সালের ৯ই নভেম্বর উক্ত আদেশ নাকচ করিয়া দেন।

বেশান্ত ও তিলকের সম্মিলিত 'হোমরুল' আন্দোলনের ফলে নিয়মতান্ত্রিক স্তিমিত ধারা জাতির মর্মস্থল হইতে রস সঞ্চয় করিয়া নবভাবে উজ্জীবিত জাতীয় জীবনের উদ্দাম প্রবাহের সহিত মিলিত হইলে অভূতপূর্ব শক্তির বিকাশ হয়। দেশের বামপন্থী দলের অংশবিশেষ এবং মোসলেম লীগ উহাতে আকৃষ্ট হওয়ায় ভাবাদর্শ ও কর্মপদ্ধতিতে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। এতদিন যে-আন্দোলন শুধু আবেদননিবেদনের স্তরে ছিল, তাহার

* বস্তুত বেশান্তের ছয়মাস পূর্বেই ১৯১৬ সালের ২৩শে এপ্রিল পুণায় তিলকের উদ্যোগে 'হোমরুল লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

বলিতে গেলে, হোমরুল আন্দোলন আরম্ভের ও উহাতে শক্তি সঞ্চারের গৌরব তিলকেরই প্রাপ্য। তিলকের 'লীগের' সহিত পার্থক্য বুঝাইবার জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লীগের অগ্রে শুধু নিঃ ভাঃ শব্দ জুড়িয়া দেওয়া হয়। তবে একথা বলা বাহুল্য, শারিরীক অসুস্থতাহেতু তিলক ভারতব্যাপী আন্দোলন সংগঠনে ও উহার বার্তা প্রচারে অক্ষম হইয়া পড়ায় বেশান্ত এই দায়িত্বভার নিজস্কন্ধে তুলিয়া নেন এবং গভীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত ভারতের সেবা করেন।

মধ্যে জাতীয় মর্মবেদনা ও দাবীর সুর ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত হওয়ায় আত্ম-মর্যাদার উদ্বোধন সূচিত হয়। অধিকন্তু নবাগত দক্ষিণ আফ্রিকা সত্যাগ্রহের নায়ক মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী নূতন মহিমায় ভূষিত হইয়া উহার সহিত স্বীয় গঠনমূলক কর্মশক্তি যুক্ত করায় বৃটিশবিরোধী আন্দোলন ক্রমশ দানা বাঁধিতে সুরু করে। এইহেতু ১৯১৬ সালে ৺অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত লক্ষ্মৌ কংগ্রেসে দুই বিরুদ্ধবাদী দলের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটায় এবং কংগ্রেস-লীগ চুক্তি সম্পাদিত ( লক্ষ্মৌ চুক্তি বা লক্ষ্মৌ প্যাক্ট নামে খ্যাত ) হওয়ায় সমুদয় জাতীয় শক্তি সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

কংগ্রেসের লক্ষ্মৌ অধিবেশন নানাদিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল কংগ্রেসের বাহিরে থাকার পর তিলক ও বেশান্তের নেতৃত্বে চরমপন্থী প্রতিনিধিরা উহাতে সদলবলে যোগ দিয়া প্রথমবারেই সংখ্যাধিক্য লাভ করেন। পক্ষান্তরে দেশের পরিবর্তিত ভাবাদর্শ ও কর্মপদ্ধতির দরুণ এ অধিবেশন হইতেই নরমপন্থীদের প্রাধান্য লোপ পাইতে থাকে এবং এক বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে ১৯১৭ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে মত ও পথ লইয়া চরম ও নরমপন্থীদের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে; ইহার পর কংগ্রেসে সংগ্রামকামী জাতীয় দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ইহাই কংগ্রেসী আন্দোলনে নূতন অধ্যায়। এতদিন কংগ্রেসে যে-নীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছিল, কংগ্রেস তাহা হইতে অগ্রসর হইয়া নূতন পথাশ্রয়ী হন।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক অবস্থা বৃটিশের প্রতিকূল হইয়া পড়ে। য়ুরোপীয় রণাঙ্গনে সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হয়; ফ্লাণ্ডার্স ও গালিপোলী রণক্ষেত্রে জার্মান আক্রমণের মুখে বিপর্যস্ত মিত্রসেনার সাহায্যার্থ আগুয়ান ভারতীয় বাহিনী অসীম শৌর্য দেখাইয়া জগদ্বাসীকে বিস্মিত করে; ভারতের ধন ও জনবল যুদ্ধের প্রয়োজনে যদৃচ্ছ ব্যবহৃত হইতে থাকে। রংরুট সংগ্রহের জবরদস্তিতে পাঞ্জাবের ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠে; পক্ষান্তরে গদর ও বিপ্লব আন্দোলন

ব্যর্থ হওয়ায় সরকারী দমননীতির পেষণযন্ত্র ভারতবাসীর অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিতে থাকে। এদিকে ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে আইলিংটন কমিশনের যে-রিপোর্ট বাহির হয়, তাহাতে ভারতবাসীর সরকারী চাকরিতে উচ্চপদে নিয়োগের আশা লোপ পায়। অথচ উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগের উদ্দেশ্য লইয়াই যে-কমিশন গঠিত হয়, তাহার অধিকাংশ সদস্য বৃটিশের স্থায়ী প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।*

কাজেই একদিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতের যথাসর্বস্ব নিয়োগ ও শোষণের উদ্দেশ্যে যেমন চতুর ইংরেজ রাজনীতিকগণ অজস্র সাধুবাদ জানাইয়া দাসজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দানের কথা ঘোষণা করিতে থাকে† তেমনি অন্যদিকে ভারতে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট উগ্র দমননীতি চালাইয়া জনসাধারণের কণ্ঠরোধ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপ করিতে থাকে; অধিকন্তু সরকারী চাকরিতেও সর্বোপায়ে বৃটিশ প্রভুত্ব কায়েম রাখার পাকা ব্যবস্থা হয়। এই হেতু ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। †

এই দুর্দৈবের পটভূমিকায় মিসেস বেশান্ত ও তিলকের 'হোমরুল আন্দোলন'

---

* অবশ্য কমিশনের ভারতীয় সদস্য মেসার্স আব্দার রহিম এবং চৌবল উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাইয়া স্বতন্ত্র মতামত জ্ঞাপন করেন। এই সময় দুই শত হইতে পাঁচ শত টাকা বেতনের ১১,০৬৪ টি পদের মধ্যে শতকরা ৪২ জন, পাঁচ শত ও তদূর্ধ্ব বেতনের ৪,৯৮৪ টি পদের মধ্যে শতকরা ১৯ জন এবং আটশত ও তদূর্ধ পদে শতকরা মাত্র ১০ জন ভারতীয় নিযুক্ত ছিলেন। অধিকন্তু সিবিল সার্বিসের বয়স ২৩ হইতে কমাইয়া ১৯ করার প্রস্তাব হয়, আর ৭৫৫ টি সিবিলিয়ান চাকরির মধ্যে এক চতুর্থাংশ ভারতীয়দের দ্বারা পূরণ করাইবার এবং পুলিশ বিভাগে শতকরা মাত্র ১০ জনকে গ্রহণের কথা হয়।

† "আমরা যেমন মানবজাতির বন্ধনদশা মোচনের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম চালাইতেছি, ভারতীয় সৈন্যরাও অনুরূপ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতেছে। মানবসমাজের মঙ্গলহিতে ভারত তাহার বহু জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করিয়াছে। আমাদের জয়লাভের ফলে সাম্রাজ্যেরই জয়লাভ হইবে।"—লর্ড হ্যালডেন।

দেশবাসীর মন জুড়িয়ে বসে; অবদমিত আশাআকাংখা ব্যক্ত করার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় নানাস্থানে হোমরুল লীগের শাখা স্থাপন করিয়া জাতি হিসাবে ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী ও স্বায়ত্তশাসন দানের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করিতে থাকেন। কিন্তু দেশবাসীর এই অতিসঙ্গত ও প্রাথমিক অধিকার স্বীকার করিয়া নিতেও আমলাতন্ত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করে। শুধু তাহাই নহে; তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের দিল্লী ও পাঞ্জাব এবং বেশান্তের মধ্যপ্রদেশ ও বেরার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। একমাত্র বাঙলা ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এই মর্মে আদেশ জারী করা হয় যে হোমরুল লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় ছাত্ররা যোগ দিতে পারিবে না। অধিকন্তু মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড হোমরুল আন্দোলনের সাফল্যে ক্ষিপ্ত হইয়া মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদে (১৯১৭, ২৪শে মে) বেশান্তকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করেন। বেশান্ত 'নিউ ইণ্ডিয়াতে' ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া উহার সমুচিত জবাব দেন। ইহাতে বেশান্ত এবং তাঁহার সহকর্মী শ্রীযুত বি, পি, ওয়াদিয়া ও মিঃ জি, এস, আরুণ্ডেলকে অন্তরীন করা হয়।

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধেও সরকারী দমননীতি অবলম্বিত হওয়ায় হোমরুল আন্দোলন দেশবাসীর মধ্যে ব্যাপক হইয়া পড়ে; দেশের নানাস্থানে সভাসমিতির মারফৎ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হইতে থাকে। এদিকে তিলকের উদ্যোগে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি এই দমননীতির বিরুদ্ধে ভারত-সচিব ও বড়লাটের নিকট প্রতিবাদলিপি পাঠান; অধিকন্তু জুলাই মাসে কমিটির বৈঠকে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভের প্রস্তাবও উত্থাপন করা হয়। জনসংযোগ-বঞ্চিত যে-কংগ্রেস আবেদননিবেদনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, জনমত-সমর্থিত তাঁহারাই এখন সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও দাবী জানান, আন্দোলন আরম্ভের হুম্‌কী দেখান! ইহাই কংগ্রেসী দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের মৌলিক পরিবর্তনের প্রথম নিদর্শন।

১৯১৭ সালের প্রথম দিকে মহাযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটাবস্থা। রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটায় মিত্রপক্ষ তাহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতি বৃটেনের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে অবস্থা কিছুটা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া, মিত্রপক্ষ এই সময় জগদ্বাসী ক্ষুদ্রবৃহৎ সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ ও সাহায্যলাভের উদ্দেশ্যে পরাধীন জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বায়ত্তশাসন অর্জনের গালভরা বুলি সুকৌশলে প্রচার করিতে থাকে। কিন্তু হোমরুল আন্দোলনের নেত্রী আটক হওয়ায় আন্দোলনের তীব্রতা আদৌ হ্রাস পায় না। পক্ষান্তরে উহার গণ্ডী ক্রমশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে, বেসরকারী ও নিঃসহায় ভারত-বাসীর দাবী বিশ্বসভায় উপস্থিত করার ব্যবস্থা হয়। 'হোমরুল লীগের' তরফে মিঃ জোসেফ ব্যাপটিস্তা বিলাতে ভারতের আশাআকাঙ্খা ও দাবী প্রচার আরম্ভ করেন; কিন্তু পরবৎসর ভারত হইতে দুইটি প্রতিনিধি দল বিলাত অভিমুখে রওনা হইলে কর্তৃপক্ষ একটিকে জিব্রল্টার এবং অন্যটিকে সিংহল হইতে ফিরাইয়া দেয়। ইহার বিরুদ্ধে কংগ্রেসনেতা ও মাদ্রাজ হোমরুল লীগের সভাপতি স্যর সুব্রহ্মণ্য আয়ার ভারত গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত দমননীতির কথা বিবৃত করিয়া ১৯১৭ সালের ২৪শে জুন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিকট এক বিবরণ পাঠান। ইহার ফলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়ে এবং তাহারা ইহাকে ভারতের আভ্যন্তরীন শাসন ব্যাপারে ভিন্ন রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপের আহ্বান বলিয়া মনে করে। এইহেতু নবনিযুক্ত ভারত সচিব মণ্টেগু সাহেব পার্লামেণ্টে বক্তৃতাকালে স্যর সুব্রহ্মণ্যের পত্রপ্রেরণকে 'কলঙ্কজনক ও অযৌক্তিক' বলিয়া ধিক্কার দেন। এই অপমানজনক উক্তিতে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি বৃটিশ প্রদত্ত সম্মান 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের চাপে ভারত সম্পর্কে বৃটিশ নীতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন

সূচিত হয়। মেসোপটেমিয়ায় ভারতীয় বাহিনীর বিপর্যয় ঘটার কারণ (১৯১৭ সালের জুলাই) সম্পর্কে তদন্ত কমিটির বিবরণ বাহির হওয়ায় পার্লামেণ্টে ভারত সরকারের অকর্মণ্যতা ও অযোগ্যতার কঠোর সমালোচনা হয়; এক্ষেত্রে প্রাক্তন সহকারী ভারত সচিব মিঃ এডুইন মণ্টেগু অগ্রণী হন। কিন্তু বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রধুরন্ধর মিঃ লয়েড জর্জ ভারতীয়দের বিশ্বাস-ভাজন বলিয়া স্বীকৃত ব্যক্তিকেই মিঃ অষ্টেন চেম্বারলেনের স্থলে ভারত-সচিব নিযুক্ত করেন। অবশ্য ভারতবাসীর তুষ্টি সাধনের এবং আশু ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়াই এই পরিবর্তন।

মিঃ মণ্টেগু ভারত-সচিব পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে নূতন প্রথা প্রবর্তন করেন।* অধিকন্তু ভারত-শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বৃটেনের ভবিষ্যৎ নীতিও তিনি ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট এক বিখ্যাত ঘোষণাবাণী মারফৎ প্রচার করেন। + শুধু ইহাতেও ক্ষান্ত না থাকিয়া সরকার আর একধাপ আগাইয়া যায় এবং জনসাধারণের বিরূপ মনোভাবকে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুকূল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে ১৬শত আটক ভারতীয়ের মধ্যে শুধু বেশান্ত ও তাঁহার অনুগামীদ্বয়কে বিনাসর্তে মুক্তি দেয়। অথচ সরকারী এই ক্ষুদকণায় উৎফুল্ল হইয়া নরম-পন্থীরা গবর্ণমেণ্টের গুণগানে মুখর হইয়া উঠেন এবং এমনকি শাসনসংক্রান্ত ঘোষণাকেই ভারত, শাসনের 'ম্যাগ্‌না কার্টা' বা সনদ নামকরণ করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করেন!

* সৈন্যদলে ভারতীয় অফিসার নিয়োগ সম্পর্কে যে বিক্ষোভ ছিল, তাহা প্রশমনের প্রথম ধাপ হিসাবে ৯জন ভারতীয় সর্বপ্রথম 'কিংস কমিশন' লাভ করেন।

+ "শাসনবিভাগের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অধিকসংখ্যায় ভারতবাসীর নিয়োগ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতে ধাপে ধাপে স্বায়ত্তশাসন-মূলক গবর্ণমেণ্ট প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে স্বাধিকারমূলক শাসনপদ্ধতির ক্রমোন্নতি সাধন করাই হইল বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি; ভারত গবর্ণমেণ্ট এই নীতির সহিত সম্পূর্ণ একমত।"

ইহা সত্ত্বেও ১৯১৭ সালের কলিকাতা অধিবেশনে তিলকের আবেদন অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস বেশান্তকেই সভানেত্রী পদে নির্বাচিত করিয়া যুগপৎ বৃটিশ দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং চরমপন্থীদলের আদর্শ-নিষ্ঠা ও দুঃখবরণের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নরমপন্থীরা বেশান্তের রাষ্ট্রপতি পদলাভের বিরোধী হওয়ায় গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হয়; এমনকি কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি অভ্যর্থনা সমিতি পর্যন্ত গঠিত হয়। কিন্তু নরমপন্থীদের বিরুদ্ধে জনমত বিশেষ প্রতিকূল হওয়ায় ১৯০৮ সালে সুরাট কংগ্রেসের মত এবার আর কংগ্রেস দখল করিয়া থাকার মত সাহস তাঁহাদের ছিল না। বরং কংগ্রেস হইতে নিঃশব্দে অপসরণ করিবার ভূমিকা হিসাবে তাঁহারা জনমতের সিদ্ধান্তের নিকট নতি স্বীকার করিয়া বেশান্তকেই রাষ্ট্রপতি স্বীকার করিয়া নেন। ইহার পর আর তাঁহারা কদাপি কংগ্রেসে যোগ দেন নাই। কংগ্রেসও বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী দেশবাসীর চিত্ত জয় করিয়া তাহাদের মুখপাত্ররূপে পরিগণিত হইতে আরম্ভ করেন।

যুদ্ধজনিত নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়ায় ভারতবাসীর মধ্যে একদিকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা বাড়িতে থাকে, অন্যদিকে কংগ্রেসও গবর্ণমেণ্টের নিকট সাধারণের দাবী পেশ করিয়া নিয়মতান্ত্রিক পথ হইতে গণ-আন্দোলনের দিকে গতি নেয়। ইহাতে ভারত সরকার উদ্বিগ্ন হয় এবং যুদ্ধে সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও বিব্রত বোধ করিতে থাকে। কেননা বিরুদ্ধভাবাপন্ন ভারতের ধনজন যুদ্ধের প্রয়োজনে অবাধে নিয়োগ করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীর বিরোধিতা জয় করিবার মানসে তাঁহারা ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগুকে* ভাবী শাসনতন্ত্র

* তিনি ১৯১৭ সালের ১০ই নভেম্বর ভারতে পৌঁছেন এবং ১৯১৮ সালের ২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। তিনি ও ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড চেম্সফোর্ড একযোগে শাসন সংস্কার সংক্রান্ত দলিল রচনা করেন বলিয়া প্রকাশ। ইহাই মণ্টেগু-

রচনার উদ্দেশ্যে নেতৃবর্গ ও আমলাদের সহিত পরামর্শ করিবার জন্ত এদেশে পাঠায়। ভারতে বামপন্থী শক্তির অভ্যুদয় দেখিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়ে এবং সেই জন্তই দক্ষিণপন্থীদের হাত করিয়া ভারত-শাসন ব্যাপারে গোঁজামিল দিবার উদ্দেশ্যে এক নূতন শাসন সংস্কারের পরিকল্পনা ঘোষণা করে।

যাহা হউক, আসন্ন শাসন-সংস্কারের খবর রটিয়া যাইবার সঙ্গে ভারতে প্রগতিবিরোধী শক্তিসমূহ মাথা চাড়া দিয়া উঠে। উহারা দেশহিতের পরিবর্তে আত্মহিতের কথা সর্বাগ্রে স্থান দিয়া ভারতের উন্নতির পথে বাধা জন্মায়।

দুই শ্রেণীর লোক ভারতবাসীর আশাআকাঙ্খার পদে পদে বিরোধিতা করে যথা (ক) ভারত গবর্ণমেণ্টের চাকুরিয়া বৃটিশ আমলাশ্রেণী (ইংরেজ সিবিলিয়ান ও উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার) ও বেসরকারী শ্বেতাঙ্গ-সমাজ ;* এবং (খ) বৃটিশ সাহায্য ও সহযোগিতায় বিশ্বাসী কয়েকটি দল যথা মডারেট দল, জাস্টিস পার্টি, হিন্দু-মহাসভা, জমিদার, দেশীয় রাজা ও কায়েমী স্বার্থ প্রভৃতি। অবশ্য প্রথম ও শেষোক্ত দলের নীতি ও কার্যোদ্ধার কৌশলের মধ্যে গুণ ও পরিমাণগত পার্থক্য থাকিলেও উহাদের সামগ্রিক ফলাফল জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী হয়।

---

চেম্‌সফোর্ড দলিল ; সংক্ষেপে ইহাকে মণ্টফোর্ড রিপোর্ট বলে। ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই উহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়।

* ভারতে অবস্থিত ইংরেজ সওদাগর শ্রেণী সমাজের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯১৩ সালে য়ুরোপীয়ান ডিফেন্স এসোসিয়েশন পুনর্গঠন করিয়া উহার নূতন নামকরণ করে য়ুরোপীয়ান এসোসিয়েশন। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধতা করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত উক্ত এসোসিয়েশন বিশেষ কুখ্যাতি অর্জন করে। ইদানীন্তনকাল অবধি তাহারা সর্বোপায়ে জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে।

য়ুরোপীয়ান এসোসিয়েশন তাহাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী দেশ-শাসনে ভারতবাসীর অপটুত্ব এবং স্ব-সমাজের স্বার্থরক্ষার উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিয়া ভারতসচিবের নিকট লিপি পেশ করে ; পক্ষান্তরে মাদ্রাজের 'জাস্টিস পার্টি'* তথাকার অব্রাহ্মণদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং এমনকি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবী জানায়। পাঞ্জাবের শিখরাও পৃথক নির্বাচন চাহে। এই সময় হিন্দু মহাসভার অস্তিত্বের কথাও লোকে ভালভাবে জানিতে পারে। সর্বপ্রথম ১৯০৭ সালের জানুয়ারীতে 'সমগ্র হিন্দুসমাজের স্বার্থরক্ষাকল্পে' পাঞ্জাবে হিন্দুমহাসভার গোড়া পত্তন হয়। প্রধানত হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া মুসলীম লীগের জাতীয়তাবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন করাই উহার উদ্দেশ্য ছিল। তবে ১৯০৯ সালে সমুদয় অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর প্রতুল চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে লাহোরে পাঞ্জাব হিন্দু সম্মেলন হয়। পরবর্তী বৎসর ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে বিশিষ্ট হিন্দুগণ মিলিত হইয়া অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু নানা কারণে উহা কার্যে পরিণত না হইলেও হরিদ্বারে মহাসভার বার্ষিক অনুষ্ঠান হইতে থাকে। পক্ষান্তরে ১৯১২ সালের পর লীগ নানা কারণে ইংরেজবিরোধী ও কংগ্রেস-অনুরাগী হইয়া পড়ায় মহাসভার তরফ হইতে আন্দোলন আরম্ভ করার কোনই সুযোগ ছিল না। এই হেতু ১৯১৮ সাল পর্যন্ত তাহাদের তেমন সাড়া পাওয়া যায় নাই। তবে ১৯১৭ সালে ভাবী শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত ঘোষণার পর

---

* দাক্ষিণাত্যে বিশেষত মাদ্রাজে ব্রাহ্মণরা শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রণী ; কিন্তু সামাজিক রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির ফলে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভেদ এতই প্রবল যে, 'পারিয়া' নামক অন্ত্যজ শ্রেণীই শুধু অস্পৃশ্য নহে, অন্ত্যজ অব্রাহ্মণ শ্রেণীও মানমর্যাদায় ব্রাহ্মণদের তুল্য বিবেচিত হয় না। এই বৈষম্যকে ভিত্তি করিয়া জাস্টিস পার্টি গঠিত হয়। ১৯৩৭ সালের নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের পর উক্ত দলের প্রভাব খর্ব হইয়াছে।

মহাসভাও হিন্দুদের অধিকার রক্ষা করার ব্যাপারে সজাগ ও উদ্যোগী হইয়া উঠে এবং ১৯১৮ সালে দিল্লীতে রাজা স্যর রামপাল সিংহের সভাপতিত্বে উহার ৫ম অধিবেশন হয়। কিন্তু তৎকালে উহার প্রভাব মাত্র জনকয়েক রাজামহারাজা ও অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

ভারতের একশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান যখন প্রগতি-বিরোধী কর্মতৎপরতা অবলম্বন করিয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থহানির কারণ হইয়া উঠিতে থাকে তখন ভারত সচিব মণ্টেগু সাহেবও নরমপন্থীদিগকে প্ররোচিত করিয়া এক নূতন সঙ্ঘগঠনে উদ্বুদ্ধ করেন। উহা যাহাতে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে এরূপ মনোগত ইচ্ছাই তাঁহার ছিল।* কাজেই ভারত সচিব পদে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বে তিনি ভারতহিতের জন্য যে-সাধু সংকল্প একাধিকবার ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সঙ্ঘর্ষে তাহা নিতান্তই অসার বলিয়া প্রমাণিত হয়।

১৯১৮ সালের প্রথমদিকে কলিকাতায় ভারত সচিবের অনুপ্রেরণায় 'জাতীয় উদারনৈতিক লীগ' স্থাপিত হয়। তখনও শাসন সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব সাধারণ্যে ঘোষিত হয় নাই। কিন্তু প্রস্তাবের মর্ম প্রকাশিত হইবার পর ভারতীয় জাতীয়তার পুরোধা সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নরমপন্থীরা মণ্টেগু সাহেবকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। কিন্তু নয়া শাসনতন্ত্রে শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর অধিকার স্বীকৃত হইলেও তাহাদিগকে প্রকৃত ক্ষমতা না দেওয়ায় চরমপন্থী-প্রভাবিত কংগ্রেস উহার তীব্র বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে নরমপন্থীদের প্রতি দেশবাসীর আস্থা

* 'আমরা উদারনীতিক দল গঠন সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। তাঁহারা [ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ( পরে লর্ড ) ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু ] এবিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইলেনা। কথা ও কাজে তাঁহারা এক থাকিবেন বলিয়া আমি মনে করি।"—মণ্টেগু-প্রণীত রোজনামচায় ১৯১৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর লিখিত।

একেবারে লোপ পায় এবং তাঁহাদের অতীত ত্যাগ ও অবদান সত্ত্বেও রক্ষাপন্থী ও বৃটিশ-সহযোগী বলিয়া তাঁহাদের প্রতি কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব দেখান হইতে থাকে। তাঁহাদের কেহ কেহ জনতার হাতে লাঞ্ছিত পর্যন্ত হন। কাজেই ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসে শাসন সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব আলোচনার্থ বোম্বাই-এ কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইলে তাহাতে নরমপন্থীরা যোগ দিল না। * এইভাবে এককালের চরমপন্থী বলিয়া কীর্তিত নেতৃবৃন্দও প্রগতিমূলক আন্দোলনের সহিত তাল রাখিতে না পারায় ধিকৃত হন এবং জাতীয় সংকটকালে রাজনীতির কলকোলাহল হইতে নেপথ্যে গিয়া নিভৃত বিশ্রম্ভালাপে রত থাকেন।

বোম্বাই-এর বিশেষ অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন বামপন্থী বল্লভভাই প্যাটেল এবং সভাপতিত্ব করেন কংগ্রেসী নেতা পাটনার সৈয়দ হাসান ইমাম। তিলক শাসন সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন কালে মণ্টেগু-রিপোর্টের দোষত্রুটি উদঘাটন করিয়া কয়েকটি বিষয়ে সাধুবাদও করেন। কিন্তু সামান্য অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, গৃহীত প্রস্তাবটি চরম, নরম ও প্রগতিশীল প্রভৃতি দলের মতসামঞ্জস্যের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে। † তবে স্বদেশভক্ত ভারতসন্তানদের কণ্ঠরোধ কল্পে রাউলাট কমিটি অস্থায়ী ভারতরক্ষা আইন ‡ স্থায়ী করার সুপারিশ করিলে উহার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। অধিকন্তু ঐ বৎসর (১৯১৮ সাল) দিল্লীতে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত (বিখ্যাত নেতা হাকিম

---

* জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে কোন বিষয় আলোচনার জন্য বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার রীতি এই প্রথমবার কংগ্রেস প্রবর্তিত হয়।

† "কংগ্রেস নিশ্চয়ই মণ্টেগু-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবেন, একথা এক দল লোক বলিতেছেন; * * কিন্তু আমাদের প্রস্তাবে এক দলের অভিজ্ঞতা, অন্য দলের চরম মতবাদ এবং তৃতীয় দলের দ্রুত গ্রহণশীলতার সমন্বয় করা হইয়াছে।"—তিলকের বক্তৃতা।

‡ রাউলাট কমিটির রিপোর্ট ১৯১৮ সালের ১৫ই এপ্রিল বাহির হয়।

আজমল খাঁ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন) কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাতে ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী জানাইয়া প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারকে 'নৈরাশ্যজনক ও অনাবশ্যক' বলিয়া নিন্দা করা হয়। লক্ষ্যের বিষয়, ইহার মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনায় ভারতবাসীর দৃঢ় ও অকুণ্ঠ দাবী এবং ঘরোয়া ব্যাপারে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জনমত ধ্বনিয়া উঠে। ভারতের ইহাই বিদেশী প্রভাবমুক্ত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভের প্রথম ঘোষণা।

নূতন অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় কংগ্রেস রাজনীতিতেও আভ্যন্তরীন সংকট প্রকট হয়; নেতৃবর্গ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে একমত হইতে পারিলেন না এবং সংগ্রামোন্মুখ দেশবাসীর নিকট নূতন পথপ্রদর্শনে অসমর্থ হইলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জনমতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

## চম্পারণ, খেড়া ও আমেদাবাদ

১৯১৪ সালের শেষভাগে গান্ধিজী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন; কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে নবাগত হইলেও দক্ষিণআফ্রিকার সংগ্রাম পরিচালনায় তিনি যে-সুযোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় দেন, তাহার ফলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাঁহার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ভারতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অবিসম্বাদী নেতৃত্বের পদ লাভ করেন এবং জনসাধারণের চিত্ত জয় করেন, একথা বলা সঙ্গত নয়। নূতন অবস্থা-সঞ্জাত ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্যে অপারগ প্রাচীন ও প্রগতিবিরোধী নেতৃবৃন্দের ক্রমিক কর্মক্ষমতা লোপ, তিরোধান ও অপসারণ একদিকে যেমন দেশে নূতন নেতৃত্বের পথ সুগম করে, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার

ব্যক্তিগত ভাবাদর্শ, সাধনা, সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন চালনায় স্বাভাবিক পটুতা, সাধারণের মধ্যে কর্মোন্মাদনা সৃষ্টির কৌশল এবং রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন কর্মসূচী প্রবর্তনের জন্যও এই আচারব্যবহারে সাদাসিধা ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তির প্রতি ক্রমশ দেশবাসী আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং পরিণামে তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া নেয়।

গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে গান্ধিজীর রাজনীতিক গুরু; কিন্তু গান্ধিজী ভারতে পৌঁছিবার অব্যবহিত পর তাঁহার মৃত্যু হয়। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের দুইদলের মধ্যে আপোষ-বিরোধী প্রাচীনপন্থী নেতা স্যর ফিরোজ শাহ মেটা তখন পরলোকে; সুরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তাও অস্তগামী। তবে সুদীর্ঘ কারাবাসের পর রাজনীতিতে তিলকের পুনরাগমনে এবং বেশান্তের নবপ্রবেশে ভারতে নূতন কর্মচাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে; অধিকন্তু তিলকের সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্বের যাদু স্পর্শে বামপন্থী জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহ কংগ্রেসের মধ্যে সংহত হইবার উপক্রম করে। জিন্না-নেতৃত্বে মুসলীম লীগও তৃতীয় পক্ষের ইঙ্গিত, প্ররোচনা ও হস্তক্ষেপ ছাড়াই দেশের শাসনতন্ত্র রচনায় সর্বপ্রথমবার স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে লক্ষ্ণৌয় কংগ্রেস-লীগ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এমনকি ইতিমধ্যে গদর ও বিপ্লব আন্দোলন সরকারী নিষ্পেষণে স্তিমিত হইলেও হোমরুল আন্দোলনের কারারুদ্ধ নেতৃবৃন্দের মুক্তিকল্পে কংগ্রেসের তরফ হইতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভের পরিকল্পনা হয়; * কিন্তু নূতন ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু কর্তৃক

---

* ১৯১৭ সনের ২৮ শে জুলাই কংগ্রেস ও লীগের এক মিলিত বৈঠক হয়। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চালনা সংক্রান্ত নীতি ও উক্ত পন্থা গ্রহণ করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহ ও লীগ কাউন্সিলের নিকট ছয় সপ্তাহের মধ্যে মতামত পাঠাইবার অনুরোধ করা হয়। আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটি এই সম্পর্কে যথোচিত বিবেচনা করে। বেরার আন্দোলন আরম্ভের পক্ষে মত দেয়; মণ্টেগুর আসন্ন আগমন প্রত্যাশায় বোম্বাই, ব্রহ্ম ও পাঞ্জাব এবং দেশের 'বর্তমান পরিস্থিতিতে' যুক্ত

বেশান্ত প্রভৃতির মুক্তিদানকে সদিচ্ছামূলক ইঙ্গিত বলিয়া মানিয়া নিয়া কংগ্রেস উক্ত পরিকল্পনা প্রত্যাহার করেন। মুক্তিলাভের পর বেশান্তও স্বয়ং উহার বিরোধিতা করেন। কাজেই প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষমূলক কর্মসূচীর সন্ধান পাইয়া নূতনপন্থী যে-তরুণ দল উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা এই পশ্চাদপসরণে নিরাশ হন।

দেশের এই কলকোলাহল, পরিবর্তন ও ঘাতপ্রতিঘাতের মুখে গান্ধিজী কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে শনৈ শনৈ নিজের সুনির্দিষ্ট পথ রচনা করিয়া চলেন। এই ব্যাপারে প্রবীন নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ করিয়া গান্ধিজীর রাজনৈতিক গুরু গোখ্‌লের প্রতিদ্বন্দ্বী বাল গঙ্গাধর তিলক প্রথমাবধি তাঁহার প্রতি প্রীতির ভাব পোষণ করিয়া আসেন এবং তাঁহাকে নানা ভাবে সাহায্য করেন। কূটনৈতিক জটিলাবর্তে ইহা অস্বাভাবিক মনে হইলেও তিলকের এই ঔদার্য এবং উপযুক্ত লোক নির্বাচনের অসাধারণ দক্ষতা নিঃসন্দেহে তাঁহার হৃদয়বত্তা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। এমনকি রাজনীতিতে তিলক কংগ্রেসে যে-বামপন্থী শক্তিসমূহ সংহত করিয়া নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা গান্ধিজীর ভাবী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ভিত্তিমূল বলিয়া পরিগণিত হয়।

১৯১৬ সালের ইতিহাস-খ্যাত লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে বিহারের প্রতিনিধি বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় যথা :—

গবর্ণমেণ্টের নিকট রাষ্ট্রীয় সমিতি এই মর্মে অনুরোধ জানাইতেছেন যে,

---

প্রদেশ স্থগিত রাখার পক্ষে রায় দেয়। পক্ষান্তরে বিহার অভিমত দেয় যে, প্রথমে পূর্বনির্দিষ্ট দিবসে নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করিয়া ব্যর্থকাম হইলে আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে। মাদ্রাজও এই মনোভাব প্রকাশ করে। কিন্তু মণ্টেগু-ঘোষণার অব্যবহিত পর বেশান্ত প্রভৃতির মুক্তি অন্তে ৬ই অক্টোবর এলাহাবাদে কংগ্রেস ও লীগের সম্মিলিত আন্দোলন অধিবেশন হয়। উহাতে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

উত্তর বিহারের শ্বেতাঙ্গ নীলকর ও প্রজাদের মধ্যে যে অশান্তির ভাব বর্তমান রহিয়াছে, সে বিষয়ে তদন্ত করিয়া তাহা স্থির করার উপায় নির্দেশের উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হউক।

রাজকুমার শুক্ল নামক কংগ্রেসে উপস্থিত বিহারী কিষাণদের জনৈক প্রতিনিধির আগ্রহহেতু উক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। রাজকুমার স্বয়ং চম্পারণের অধিবাসী এবং নীলকরের অত্যাচারে উৎপীড়িত। এই হেতু চিরতরে উক্ত জঘন্য অনাচারের প্রতিকার কল্পে তিনি উদ্যোগী হন। কিন্তু নিজের অক্ষমতার দরুণ তিনি কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধিজীর শরণাপন্ন হন। অথচ আশ্চর্য এই, কংগ্রেসের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের নিকট না যাইয়া তিনি নবাগত ও স্বল্পখ্যাত গান্ধিজীর নিকট বিহারী কিষাণদের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করেন। রাজকুমার বিহারের তরফে গান্ধিজীকে কংগ্রেসে নীলকর অত্যাচার সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি বিহারের অবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বলিয়া বিহারের তৎকালীন অন্যতম কংগ্রেসী নেতা ব্রজকিশোর প্রসাদকে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে বলেন। কথাপ্রসঙ্গে ব্রজকিশোর বাবু প্রভৃতি বিহারী নেতারা তাঁহাকে বিহার পরিদর্শনের জন্য তখন আমন্ত্রণ জানান।

ঐ সময় কংগ্রেসের কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না; উহা কতকটা বাৎসরিক বিতর্ক বৈঠক মাত্র ছিল। কাজেই গৃহীত প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইবে না আশংকা করিয়া রাজকুমার বারংবার গান্ধিজীকে মাত্র একবারের জন্য বিহার পরিদর্শন করিতে অনুরোধ জানান। এমনকি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর তিনি কানপুর ও তৎপর সবরমতীতে গেলেও রাজকুমার তাঁহার পিছু ছাড়েন না। অবশেষে মার্চ-এপ্রিলে গান্ধিজী বিহার যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

এস্থলে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, চম্পারণে সত্যাগ্রহ পর্ব আরম্ভের পূর্বেও গান্ধিজী ভারতবর্ষে দুইবার সত্যাগ্রহ করিবেন বলিয়া স্থির করেন;

কিন্তু দুইবারই গবর্ণমেণ্ট প্রার্থিত প্রতিকার করায় সত্যাগ্রহ অবলম্বনের প্রয়োজন হয় নাই। প্রথমত দেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পর ১৯১৫ সালে ওয়াঢ়ওয়ানে (গুজরাট) যাত্রীদের নিকট হইতে অন্যায় ভাবে শুল্ক আদায় লইয়া তিনি প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন। বিষয়টি ছিল সামান্য এবং উক্ত কুপ্রথা উঠাইয়া দিলেও সরকারের কোন ক্ষতি ছিল না; কিন্তু উহার জন্য যাত্রীদের অশেষ দুর্ভোগ সহিতে হইত। ইহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন করা হইলে ব্যাপারটি ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করা হয়। এইহেতু গান্ধিজী অনন্যোপায় হইয়া এক জনসভায় সত্যাগ্রহ অবলম্বনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ইহার ফলে ভারত সরকারের হুঁস হয় এবং তাহারা ঈপ্সিত প্রতিকার করিলে গোলযোগ মিটিয়া যায়। দ্বিতীয়ত, বিদেশে চুক্তিবদ্ধ মজুর প্রেরণ বন্ধ করার জন্যও গান্ধিজী নূতনভাবে আন্দোলন করিতে থাকেন। দক্ষিণ আফ্রিকা, উপনিবেশে ও অন্যান্য স্থানে ভারতবাসীর দুর্ভোগের মূল এই চুক্তিবদ্ধ মজুর। কাজেই ঐ প্রথা সমূলে লোপের উদ্দেশ্যে তিনি বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় জনসভা ও সংবাদপত্র মারফৎ আন্দোলন আরম্ভ করেন। এমনকি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তিনি উহা রদ করার জন্য সরকারকে হুঁশিয়ার করিয়া দেন। ভারতগবর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে অবহিত হইয়া উঠেন এবং ১৯১৭ সালের প্রথম ভাগে সাম্রাজ্যিক সম্মেলনে সরকারী ভারতীয় প্রতিনিধিদের (বিকানীরের মহারাজা, লর্ড মেস্টন ও লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ) চেষ্টায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহে ঠিকা ভারতীয় মজুর আমদানী করা নিষিদ্ধ হয় এবং বসবাস সম্পর্কিত কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা লাভ করায় প্রবাসী ভারতীয়দের দুঃখ কিঞ্চিৎ লাঘব হয়।

এই দুইটি ব্যাপারের মধ্য দিয়া গান্ধিজীর সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি ও নূতন কৌশলের যে-সামান্য পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে, উহার ফলে স্বভাবতই নির্যাতিত সাধারণ ভারতবাসী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে। চম্পারণের

নিগৃহীত কিষাণ প্রতিনিধি রাজকুমার শুক্লের আকুল আহ্বান উহারই নিদর্শন।

চম্পারণ বা চম্পারণ্য উত্তর বিহারের একটি জেলা; উহার উত্তরে হিমালয়ের তরাই অঞ্চল, পূর্বে ও দক্ষিণে মজঃফরপুর ও সারণ জেলা এবং পশ্চিমে যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলা। এই জেলায় মাত্র দুইটি সহর আছে যথা মতিহারী ও বেতিয়া। উহার প্রধান শস্য ধান হইলেও যব, গম ইত্যাদিও ভাল ফলে; নীলও এই মাটিতেই জন্মিত। জেলায় ষোল লক্ষ হিন্দু তিন লক্ষ মুসলমান এবং আনুমানিক তিন হাজার খ্রীষ্টান বাস করে।

১৭৯২ সালে দশশালা বন্দোবস্ত কালে চম্পারণ চারিটি বড় জমিদারীতে বিভক্ত হয় যথা বেতিয়া, রামনগর, শিবহর ও মধুবন। পরে শিবহর জমিদারীর অধিকাংশ মজঃফরপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। তবে অধুনা চম্পারণে বহু ছোট জমিদারী থাকিলেও প্রধান জমিদারী তিনটিই আছে।

১৭৯৩ সাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বৎসর; বিহার তখন বাঙলার অন্তর্ভুক্ত; ঐ সময় হইতে ইংরেজ কুঠিয়ালরা বেশী জমা দিয়া চম্পারণের জমিদারদের নিকট হইতে বিস্তৃত ভূখণ্ড ঠিকা লইয়া নীলের আবাদ করিতে থাকে। তাহাদের উৎপীড়নে প্রজাদের প্রাণান্ত হয়। অবশ্য বিহারে ইহা নূতন হইলেও বাংলায় ইতিপূর্বেই ইংরেজ বণিকরা বহুস্থান রেশম ও নীলকুঠিতে ছাইয়া ফেলে। কিন্তু অত্যাচার চরমে উঠিলে বাঙালী প্রজারা বিদ্রোহ করায় নীলের চাষ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বাঙলার নীলবিদ্রোহ দ্বারা বিহার প্রভাবিত হইলেও বিহারী নীলকর সাহেবরা সরকারী সাহায্যে প্রজাদের দাবাইয়া রাখে। তবে ১৮৬৩ সালের পর হইতে ১৯১৭ সালে গান্ধিজীর আগমন কাল পর্যন্ত, ছয় বার প্রজাবিদ্রোহ হয় এবং প্রতিবার প্রজাদের সামান্য সুবিধা লাভ হইলেও তাহাদের দুঃখের লাঘব আদৌ হয় না। ইহার কারণ এই যে, বাঙলায় নীল আন্দোলন যেমন শিক্ষিত শ্রেণীর

মধ্যেও সাড়া জাগায় এবং তাঁহারাই আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন (যথা দীনবন্ধু মিত্র লিখিত 'নীলদর্পণ' এবং আন্দোলনের প্রাণ-স্বরূপ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়)। বিহারে সেরূপ প্রজাদরদী কেহ ছিলেন না। বাঙলায় নীল সংক্রান্ত তদন্তের জন্য যে-কমিশন বসে তাহাতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, নীলচাষ করিলে কৃষকের দাবী অনুযায়ী নীলের দাম দিতে হইবে; উভয় পক্ষে নীলচাষ সম্পর্কিত চুক্তি হইলে অল্প-মেয়াদী চুক্তি হইবে; প্রতি বছর হিসাব দিতে হইবে; কাহার ক্ষেতে নীলচাষ হইবে, কবুলিয়তে তাহা লিখা থাকিবে; বীজের মূল্য প্রজাকে দিতে হইবে না; নীলকর নিজ খরচে ফসল গোলায় তুলিবে; নীলচাষের পর প্রজা ইচ্ছামত অন্য ফসল বুনিতে পারিবে; নীল ও খাজনার হিসাব পৃথক রাখিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত সুপারিশ কার্যকর করায় বাঙলায় নীলচাষ একবারে বন্ধ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে বিহারী কৃষকদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইতে থাকে। অবশেষে তাহারা ১৮৬৭ সালে বিদ্রোহী হইলে বিঘাপ্রতি (বাঙলায় প্রায় তিন বিঘা বা এক একরের সমান) ৫ কাঠার স্থলে তিনকাঠা করিয়া (তিন কাঠিয়া প্রথা) নীলচাষ বাধ্যতামূলক করা হয় এবং এবং নীলচাষের জন্য কৃষকরা বিঘাপ্রতি ৬৷৷০ টাকার স্থলে ৯৲ টাকা পাইবে বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু নীলকরদের অত্যাচার ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রজারা ১৮৭৪-৭৮ সালে এবং পুনরায় ১৮৮৭ সালে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া শেষোক্ত বছর বিহারে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কাজেই '৭৪-৭৮ সালে ও '৮৭ সালে বিঘাপ্রতি নীল চাষের মূল্য যথাক্রমে বাড়াইয়া ৯৲ টাকা হইতে ১০।৵০ এবং ১০।৵০ হইতে ১২৲ টাকা করা হয়। এদিকে ১৮৮৭ সালের দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী বৎসর বেতিয়ারাজের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িলে তিনি নীলকরদের মারফৎ বিলাত হইতে ৯৫ লক্ষ টাকা ঋণ করেন; নীলকররাও এই সুযোগে আরও ১৭টি কুঠির সহিত বিশেষ ধরণের ঠিকা বন্দোবস্ত নেয়। কাজেই

জমিদারের উপর প্রভাব হেতু নীলকররা প্রজার উপর বেশীমাত্রায় নানা জোরজুলুম করিতে থাকে। কিন্তু অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় প্রজারা ১৯০৬ সালে তৈলহড়া নামক স্থানের কুঠির ম্যানেজার মিঃ ব্লুমফিল্ডকে খুন করিয়া ফেলে। অধিকন্তু, ঐ বৎসর বন্যায় ক্ষেতের ধান নষ্ট হইয়া গেলে প্রজাদের চরম দুর্দশা হয়। ইহা সত্ত্বেও নীলকররা কৃষকদের নিকট হইতে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করে, তাহাদের বেগার খাটায়, উপযুক্ত মূল্য না দিয়া নীল চাষ করায় ও মিথ্যা মামলা দায়ের করে। সাঠি কুঠির প্রজারা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রতিকারের জন্য দরখাস্ত করায় তাহাদের কয়েকজনকে স্পেশাল কনেস্টবল করিয়া সাজা দেওয়া হয়। ইহাতে প্রজারা না দমিয়া কালেক্টরের নিকট তদন্তের জন্য দরখাস্ত করে; কিন্তু এবারের ফলও ভিন্নরূপ না হওয়ায় শেখ গুলাব ও শীতল রায় নামক দুইজন বীর কৃষকের নেতৃত্বে বেতিয়ার নিকটবর্তী গ্রামের এবং সাঠি কুঠির পার্শ্ববর্তী প্রজারা নীল বোনা বন্ধ করিয়া দেয়। অধিকন্তু দশহরার সময় বেতিয়ায় যে-বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে, তাহাতে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করার সুযোগ লওয়া হয়। কিন্তু সরকারী ফৌজের সাহায্যে প্রজাদিগকে দমন করা হয়। অধিকন্তু তিন শতাধিক প্রজার সাজা হয় এবং সরকার বিদ্রোহীদের ধৃষ্টতার জন্য তাহাদের নিকট হইতে ৩০ হাজার টাকা পিটুনী কর আদায় করে।

অবশ্য লোকদেখান শান্তি স্থাপনের পর এক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু তদন্তের ফলাফল কখনও জানা যায় নাই। তবে স্থির হয় যে প্রজারা বিঘাপ্রতি তিন কাঠার পরিবর্তে দুই কাঠায় নীল বুনিবে; নীলের দাম বাড়াইয়া ১২৲ টাকা হইতে ১৩৷৷ টাকা করা হইবে এবং নীলের বদলে কুঠিয়ালরা অন্য শস্য বপন করাইবে না। কিন্তু এই নিয়ম পুরাপুরি কোথাও পালিত হয় না।

ইতিমধ্যে জার্মানীতে কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাকৃতিক নীলের

দাম পড়িয়া যায় এবং নীল বপন লোকসান বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। চম্পারণে পূর্বে ২১ হাজার একর জমিতে নীলের চাষ হইত; কিন্তু ১৯১৪ সালে সেখানে ৮ হাজার একশত একর জমিতে নীলচাষ হয়। এরূপ অবস্থায় কুঠিয়াল সাহেবরা নীলের চাষের দরুণ যে-লাভটা পাওয়া যাইত তাহা কৃষকের নিকট হইতে নানাভাবে জুলুম করিয়া আদায়ের ব্যবস্থা করে যথা (১) তিন কাঠিয়ার সর্তে আবদ্ধ প্রজাদের নীলের পরিবর্তে অন্য শস্যের চাষ বা উহাতে উৎপন্ন ফসলের দাম আদায়; (২) 'জলকর' বা পৈনখরচ বা বিনাপয়সায় খাল হইতে জল লওয়ার জন্য ( যেখানে ক্ষেতের জন্য আদৌ জল ব্যবহৃত হয় না সেখানেও ) বিঘা প্রতি তিন টাকা আদায়; (৩) স্থায়ী বন্দোবস্ত-যুক্ত জমির উপরও খাজনা বৃদ্ধির সর্ত করিয়া প্রজার নিকট হইতে কবুলিয়ৎ লিখাইয়া লওয়া; (৪) আইন বাঁচাইয়া স্থায়ী বন্দোবস্তের জমি ইস্তফা লইয়া পুনরায় বর্ধিত হারে বিলি; (৫) বর্ধিত হারে খাজনার টাকার বিশগুণ নগদ টাকা আদায় অথবা আংশিক নগদ লইয়া বাকী টাকা ঋণ হিসাবে তমঃস্মুক গ্রহণ এবং (৬) সামান্য খাস জমি নূতন বিলিকালে জমির খাজনা এরূপভাবে ধার্য করা, যাহাতে নীলের দরুণ সমস্ত ক্ষতি পূরণ হয়। অধিকন্তু বর্ধিত খাজনার সমপরিমাণ টাকা বাজে আদায় বা আবওয়াব নামে লওয়া হয়।

১৯১৩ সালে যখন এজাতীয় উৎপীড়ন পূরাদমে চলিতে থাকে তখন জমি জরিপ আরম্ভ হয়। কাজেই প্রজাদের তরফ হইতে যে-সব আবেদন করা হয়, তাহার উত্তরে সার্ভের ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা করিতে বলা হয়। এই সময় নীলকর সাহেবদের উপস্থিতিতেই সরকারী কর্মচারীর নিকট নির্ভীক প্রজারা নীলকরদের অনুষ্ঠিত জোরজুলুমের কাহিনী বর্ণনা করে। এই অবস্থায় সার্ভে অফিসার নীলকরদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেআইনী ও গর্হিত আবওয়াব প্রথা উঠাইয়া দেওয়ায় প্রজাদের মধ্যে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়।

অবশ্য প্রজাদের উপর অনুষ্ঠিত অমানুষিক নির্যাতনে দেশবাসী একেবারে সাড়া দেয় নাই একথা বলা চলেনা। তবে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন চালাইবার মত উদ্যোগ ও পরিকল্পনা না থাকায় তাহারা শুধু অসহায়ভাবে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। মজহরুল হক, রাম দয়ালু সিংহ, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, সৈয়দ হাসান ইমাম, ব্রজকিশোর প্রসাদ, শম্ভু প্রসাদ, ধরণী ধর, গয়াপ্রসাদ সিংহ প্রভৃতির মত খ্যাতনামা কংগ্রেসী নেতা থাকা সত্ত্বেও বিহারে কোনরূপ কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় নাই। তবে ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে বিহার প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরা স্ব স্ব অভিভাষণ প্রসঙ্গে নীলকরদের বিরুদ্ধে অভিযোগের উল্লেখ করিয়া তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী করেন। '১৪ সালে বাবু ব্রজ কিশোর প্রসাদ ব্যবস্থাপক সভার তদন্ত কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াও সরকারী মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন নাই।

বাঙলার মুখাপেক্ষী বিহারে পূর্ব হইতেই আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈয়ার ছিল; উপযুক্ত মালমসলারও এখানে অভাব ছিলনা; শুধু অভাব ছিল একজন নিপুণ, উদ্যোগী ও দূরদর্শী নেতার।

কাজেই গান্ধিজী যখন পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিষাণ রাজ কুমার শুক্লের সমভিব্যাহারে ১০ই এপ্রিল (১৯১৭ সাল) কলিকাতা হইতে বাঁকীপুর এবং তথা হইতে মজঃফরপুর পৌছেন তখন নূতন কর্মোদ্যমের সাড়া পড়িয়া যায়। মজঃফরপুর কলেজের অধ্যাপক জে বি কৃপলানী (১৯৪৬-৪৭ সালের কংগ্রেস সভাপতি) ছাত্রদল লইয়া গান্ধিজীকে অভ্যর্থনা করেন। পক্ষান্তরে তাঁহার নিষ্ঠা, নির্ভীকতা, কৌশল ও নূতন কার্যক্রমে একদল তরুণ উকিল ও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ নেতৃবর্গ গান্ধিজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং তাঁহারাই ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধিজীর প্রথম অনুগামী দল বলিয়া পরিগণিত হন। অধিকন্তু গান্ধিজীর ভাবনায় অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ এই

দলেরই নেতৃত্বে গঠিত বিহার পরবর্তী আন্দোলনে বহু ব্যাপারে অন্যান্য প্রদেশের পদপ্রদর্শক রূপে কাজ করিয়া আসিতেছে।

১১ই এপ্রিল হইতে গান্ধিজীর তদন্ত আরম্ভ হয়। তিনি ১১ই হইতে ১৫ই পর্যন্ত মজঃফরপুর এবং ১৫ই হইতে ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত মতিহারী থাকেন। এই ১১ দিনের মধ্যে বিহার ও ভারত সরকার নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া অনুভব করে। নীলকর সাহেবগণ এবং মজঃফরপুরের বিভাগীয় কমিশনার গান্ধিজীর আগমনে অসন্তুষ্ট হন, তাঁহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে বলেন এবং চম্পারণ যাইতে নিষেধ করেন। কাজেই তিনি বুঝিতে পারেন যে, চম্পারণের জন্য সত্যাগ্রহ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

গান্ধিজী যে-কোন সময় গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় বিহারী সহকর্মীদের সহিত পরামর্শক্রমে ভাবী কার্যক্রম স্থির করিয়া ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রজাদের দুঃখদুর্দশার কাহিনীও সংগ্রহ করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে ১৬ই এপ্রিল দ্বিপ্রহরে মতিহারীর ম্যাজিস্ট্রেট 'দাঙ্গাহাঙ্গামা ও জীবন নাশের সম্ভাবনায়' অবিলম্বে 'পরবর্তী ট্রেনে' জেলা ত্যাগের নির্দেশ দিয়া তাঁহার উপর ১৪৪ ধারা জারী করেন। কিন্তু গান্ধিজী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় ১৮ই এপ্রিল সরকারী সমন অনুযায়ী বিচারের অপেক্ষায় আদালতে হাজির হন ও অপরাধ স্বীকার করেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদকও ফিরাইয়া দেন। কিন্তু বিচারক গান্ধিজীর অভূতপূর্ব ব্যবস্থায় হতভম্ব হইয়া ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত রায়দান স্থগিত রাখেন। এই খবর চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় প্রজাদরদী গান্ধীকে দেখিবার জন্য সুদূরবর্তী গ্রাম হইতে দলে দলে কিষাণ আসিয়া ভীড় জমাইতে থাকে। সংবাদপত্রেও মামলার খবর জানাইয়া দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন না করার জন্যও তিনি অনুরোধ করেন।

পক্ষান্তরে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে বিকৃত খবর বাহির হইতে থাকে। কিন্তু গান্ধিজীর অবলম্বিত পদ্ধতি অভিনব ; তিনি মনে করেন যে, যুদ্ধের সঙ্কটাবস্থায় ভারতব্যাপী আন্দোলন হিতকর নহে এবং তাহা প্রজাকল্যাণ ও কার্যসিদ্ধির সহায়কও নহে। আসন্ন দুর্যোগের মধ্যেও তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন। তবে সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা হিসাবে স্থির হয় যে, গান্ধিজীর গ্রেপ্তারের পর মিঃ মজহরুল হক ও ব্রজকিশোর নেতৃত্ব লইবেন এবং তৎপর ধরণীধর বাবু ও রাম নবমী বাবু, অতঃপর রাজেন্দ্র বাবু, শম্ভুবাবু ও অনুগ্রহ বাবু কার্যভার গ্রহণ করিবেন। ইহার পরও আন্দোলন চলিলে নূতন লোকের মধ্য হইতে উপযুক্ত নেতা নির্বাচন করা হইবে। গোপনে কিছুই করা হইবে না বলিয়া মিঃ হক তারযোগে বড়লাটকে পূর্বেই সকল সংবাদ জানাইয়া দেন। পক্ষান্তরে সদলে গান্ধিজী গ্রামে গ্রামে তদন্ত চালাইয়া যান। ইহার ফলে নির্যাতিত কিষাণদের মধ্যে আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস জন্মিতে থাকে ; তাহারা নির্ভয় হয়। বস্তুত সত্যাগ্রহ না হইলেও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এইহেতু গান্ধিজী সংকল্পচ্যুত না হওয়ায় সরকার পক্ষ ২২শে এপ্রিল তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার করে। এই ব্যাপারে চম্পারণের প্রজারা নূতন বল লাভ করে ; তাহারা গান্ধিজীর নেতৃত্ব মানিয়া নেয়।

গান্ধিজী পরবর্তী দুই সপ্তাহ বেতিয়ায় প্রকাশ্য তদন্ত করেন ; মামলা প্রত্যাহারের পর সরকারও তাঁহাকে সাহায্যের আশ্বাস দেয়। কিন্তু নীলকরদের মধ্যে ইহার ফলে ঘোর চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তাহারা বুঝিতে পারে, প্রজার সাহস বাড়িলে নীলরাজত্ব শেষ হইবে। কাজেই তাহারা য়ুরোপীয় ( ডিফেন্স ) এসোসিয়েশনের মারফৎ ভারত সরকারের নিকট গান্ধিজীকে চম্পারণ হইতে বহিষ্কারের জন্য আবেদন করে। এরূপ অবস্থায়

গান্ধিজীর ভারতরক্ষা বিধানে কারারুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টও ব্যাপার বেশিদূর গড়াইতে না দেওয়ায় মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার তদন্ত শেষ হয় এবং ১২ই মে তিনি তদন্তের বিবরণ সরকারের নিকট দাখিল করেন। অনুসন্ধানকালে তিনি আনুমানিক ৪ হাজার প্রজার বিস্তৃত ও ৮ হাজার সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী গ্রহণ করেন এবং চম্পারণের ২৮৪০টি গ্রামের মধ্যে ৮৪০টি গ্রামের অধিবাসী সাক্ষ্য দেয়।

ইতিমধ্যে গান্ধিজীর সহকর্মীদের চম্পারণ হইতে সরাইয়া দিবার জন্য গান্ধিজীকে সরকার পক্ষ হইতে অনুরোধ করা হয়। পক্ষান্তরে নীলকর সাহেবরা নানাস্থানে গৃহদাহ ও কুঠিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, গান্ধিজীর আন্দোলনের ফলে তাহাদের জীবন বিপন্ন এবং উত্তেজিত প্রজারাই এই সব কুকাণ্ড ঘটাইতেছে। এমনকি নীলকররা মিথ্যা সাক্ষী সাজাইয়া নিজেদের সাধু প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায়। পরন্তু গবর্ণমেণ্ট ৪ঠা জুন চম্পারণে জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক এবং নীলচাষ সম্পর্কে তদন্তের জন্য ৭জন সদস্য সহ এক কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত করে। গান্ধিজী উহার অন্যতম সদস্য হইবেন বলিয়া স্থির হয়। ইহা সত্ত্বেও নীলকর-সমর্থক সংবাদপত্রগুলি গান্ধিজীকে বহিষ্কারের জন্য আন্দোলন চালায়। অস্তিত্বলোপের পূর্বেও শেতাঙ্গ নীলকররা তাহাদের 'শত্রুকে' শেষবারের মত মরণ কামড় দেয়।

১৭ই জুলাই হইতে ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত কিষাণ ও নীলকরদের সাক্ষ্য লওয়া হয় এবং ১৮ই অক্টোবর বিহার সরকার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করে। উহাতে নিম্নোক্ত মর্মে সুপারিশ করা হয় যথা (ক) 'তিন কাঠিয়া' প্রথা লোপ করা হইবে; (খ) শস্য বপন করিতে হইলে কবুলিয়ৎ স্বেচ্ছা প্রণোদিত ও অনধিক তিন বৎসর কাল স্থায়ী হইবে, এবং প্রজার ইচ্ছামত ওজন দরে নীলের দাম স্থির হইবে; (গ) যে-সব জমিতে নীল চাষ না করার

জন্য খাজনা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল তাহা শতকরা ২৬৲ টাকা কমান হইবে; (ঘ) আদায়ীকৃত 'তাওয়ানের' এক চতুর্থাংশ প্রজাকে ফেরৎ দিতে হইবে (বেতিয়া রাজকে 'শরহবেশী' ও 'তাওয়ান' ফেরৎ-হিসাবে ১লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দিতে হয়); (ঙ) 'আবওয়াব' আদায় বেআইনী হইবে; এবং ছোটখাট অন্যান্য ৭টি বিষয়।

গান্ধিজী ১৫ই অক্টোবর ভাগলপুর যুবসম্মেলনের সভাপতিত্ব করিয়া আমেদাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে সুপারিশসমূহ কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী করার জন্য ২২শে নভেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় 'চম্পারণ ভূমি সংক্রান্ত আইনের' খসড়া পেশ করা হয় এবং নীলকরদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ৪ঠা মার্চ (১৯১৮) উহা গৃহীত হয়। কাজেই গান্ধিজীর ইচ্ছানুরূপ প্রায় সর্ববিষয় নিষ্পন্ন হওয়ায় সাধারণ প্রজা, জমিদার ও নীলকরের দ্বিবিধ দাসত্ব ও শতাব্দীব্যাপী নিরঙ্কুশ অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করে।

এই ঘটনার কয়েক বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ নীলকর তাহাদের কুঠি ও জমিজমা বিক্রয় করিয়া জেলা ত্যাগ করে।

বিহার শুধু গান্ধিজীর ভাবী বৃহত্তর কর্মতৎপরতার পরীক্ষাস্থল বলিয়াই বিবেচিত হয় না, বিহারের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবনের প্রতিষ্ঠাও তাঁহা দ্বারা সম্ভব হয়। চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময় যে-সব একনিষ্ঠ কংগ্রেসসেবী গান্ধিজীর পার্শ্বচর ছিলেন তাঁহারা হাতেকলমে সত্যাগ্রহের কৌশল আয়ত্ত করিয়া বিহার ও সর্ব্বভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীবাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আবার গান্ধিজীও তাঁহার অনুরাগী শিষ্যদের যথাযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। চম্পারণ সত্যাগ্রহে বিহারই লাভবান হয় নাই, গান্ধিজীও ব্যক্তিগতভাবে স্বীয় কর্ম্মসূচী ও ভাবাদর্শকে ভারতের মাটিতে প্রথমবার বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হন। এই হেতু গুজরাটের মত বিহারও তাঁহার নিকট এত প্রিয়; বিহার তাঁহার মানস সন্তান।

গান্ধিজীর সংস্পর্শে বিহারী নেতাদের জীবনধারার পরিবর্তন সূচিত হয়; প্রচলিত ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা ও বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তে তাঁহারা অনাড়ম্বর ও সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইতে থাকেন। অধিকন্তু আরও ব্যাপকভাবে ঐ নূতন ভাবধারা বিস্তারের উদ্দেশ্যে গান্ধিজী বাহির হইতে ছয় মাসের জন্য আনীত আদর্শ স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকার সহায়তায় চম্পারণে তিনটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নৈতিক ও মানসিক সর্ববিধ দাসত্ব, অশিক্ষা-কুশিক্ষা এবং সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের চ্যুতিবিচ্যুতি হইতে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি ঐ সব বিদ্যায়তনের মারফৎ পরীক্ষামূলক চেষ্টা করেন। তবে ১৯২২ সালের পর স্থানীয় যোগ্য লোকের অভাবে ঐ গুলি বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু এপর্যন্ত বিহারের রাজনীতি ক্ষেত্রে কখনও উপযুক্ত কর্মী ও নেতার অভাব দেখা দেয় নাই। কিষাণ আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার ঘটিলেও গান্ধী-শিষ্যপ্রশিষ্যরা এখনও প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আছেন।

চম্পারণ সত্যাগ্রহে সাফল্য লাভ করার পর গান্ধিজী উপর্যুপরি দুইটি সত্যাগ্রহ সংগ্রামে জড়িত হইয়া পড়েন; উহার একটি গুজরাটের খেড়া নামক স্থানে, অপরটি আমেদাবাদে। কাজেই অনধিক দুই বৎসর কাল মধ্যে গান্ধিজীকে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হয়। ইহার ফলে তাঁহার প্রবর্তিত নূতন কর্মসূচীর সহিত যেমন দেশবাসী পরিচয় লাভ করিয়া নূতন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ও সমষ্টিগত আত্মশক্তির চর্চা করিতে আরম্ভ করে, তেমনি সমগ্র দেশের দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ হয়। একদিকে তাঁহার যোগত্যা ও অন্যদিকে নিজেদের সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করিয়া প্রবীণ নেতৃবর্গ তাঁহাকে ক্রমশ নেতৃত্বের আসন ছাড়িয়া দিতে থাকেন।

গান্ধী-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এই যে উহাতে সর্বদা নীতিগত প্রসঙ্গ সংশ্লিষ্ট থাকে। কাজেই চম্পারণের মত খেড়া সত্যাগ্রহেও নীতির প্রশ্ন জড়িত ছিল।

## খেড়া সত্যাগ্রহ

১৯১৮ সালে গুজরাটের খেড়া নামক স্থানে অজন্মা হইলে কৃষকের অশেষ দুর্গতি হয়; তাহাদিগকে অন্নাভাব ও অর্থাভাবের সম্মুখীন হইতে হয়। কাজেই তাহারা পূর্বরীতি অনুযায়ী খাজনা মকুবের জন্য আবেদন জানায়; কৃষকেরা দাবী করে যে টাকায় চার আনার বেশী শস্য উৎপন্ন হয় নাই, এমনকি উহার চেয়েও কম পরিমাণ শস্য জন্মিয়াছে; পক্ষান্তরে সরকারী আমলারা বলে যে টাকার চার আনার চেয়েও বেশী পরিমাণ শস্য জন্মিয়াছে। এই হেতু ভূমিরাজস্ব বিধান অনুযায়ী তাহাদের খাজনা হ্রাস করা যায় না। এই সম্পর্কে আপোষরফার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইলে গান্ধিজী কৃষকদিগকে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সুসংহত করার উদ্দেশ্যে তিনি স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন জানান। ইহাতে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়।

এই সময় বল্লভ ভাই প্যাটেল আইন ব্যবসায়ে বিপুল পসার ত্যাগ করিয়া কর্মক্ষেত্রে গান্ধিজীর পাশে আসিয়া দাঁড়ান। অবশ্য তিনি পূর্ব হইতেই কংগ্রেসে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন; কিন্তু রাজনীতিতে এবারই তিনি পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

খেড়া সত্যাগ্রহ উপলক্ষে গান্ধিজী ও বল্লভভাই-এর মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়; তাহা ইদানীন্তনকাল পর্যন্তও অক্ষুন্ন আছে; অদ্যাপিও সর্দার প্যাটেল ও তাঁহার অনুগামীরা তাঁহাদের নেতাকে ছায়ার মত অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। এইহেতু গুজরাট শুধু গান্ধিজীর জন্মভূমিই নহে, ভাবী নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযোগী কর্মভূমিও বটে।

সানুচর গান্ধিজী ও প্যাটেল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কৃষকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে থাকেন, তাহাদিগকে সর্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হইতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে সবকিছু ঝুঁকি বহনে প্রস্তুত করেন; এইভাবে কৃষকরা গান্ধীনীতিতে শিক্ষিত হইতে থাকে; তাহারা ক্রমশ উপলব্ধি করে, সরকারী কর্মচারীরা তাহাদের প্রভু নহে, তাহাদের সেবক মাত্র।

সরকার কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকে না; কৃষকের স্পর্ধা ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা জনৈক কৃষকের শস্য বেআইনীভাবে আটক করে; ইহার বিরুদ্ধে একদল কৃষক মোহন লাল পাঁড়ের নেতৃত্বে সরকারী হেফাজত হইতে সমুদয় শস্য অপসারিত করে। এই অপরাধে তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া দণ্ডিত করা হয়।

সরকার ও কিষাণের মধ্যে যে-সংঘর্ষ শুরু হইয়াছিল, অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার অবসান ঘটে। নানাকারণে সরকার আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হয় না। অথচ তাহারা নিজেদের মুখরক্ষার ভানও করে। তাহারা বিনা-ঘোষণায় গরীব কিষাণদের খাজনা আদায় স্থগিত রাখিয়া কিষাণদের দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করিয়া নেয়। কিন্তু ইহার ফলে অতি অল্প-সংখ্যক লোকই উপকৃত হয়; তবে এতদ্দ্বারা নীতির দিক হইতে সত্যাগ্রহের জয় হইলেও এই ব্যবস্থায় পূর্ণ জয়লাভ হয় নাই। তথাপি সমগ্রভাবে উহার ফলাফল সাধারণের উপর নিঃসন্দেহে শুভদায়ক হয়; গুজরাটের কিষাণদের জড়তা ভাঙ্গে; তাহাদের মধ্যে শ্রেণীগত চেতনা ও রাজনীতিক জাগরণের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

## আমেদাবাদে মালিক-মজুর বিরোধ

শ্রীমতী অনসূয়া বাঈ সরাভাই নীরব কর্মী; ১৯১৬ সাল হইতে তিনি আমেদাবাদের শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষামূলক কাজ করিবার সময় তাহাদের

দৈনন্দিন অভাব অভিযোগের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হন এবং এইভাবে শ্রমিক আন্দোলনে লিপ্ত হইহা পড়েন।

১৯১৮ সালে মিল মালিক ও তাঁতিদের মধ্যে মজুরী বৃদ্ধি লইয়া এক বিরোধেব উদ্ভব হয়; কিন্তু স্বয়ং মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়া তিনি গান্ধিজীর উপদেশ যাচ্ঞা করেন। গান্ধিজী তাঁহার আহ্বানে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া এক অভিনব ব্যবস্থা করেন। তিনি আপোষে বিরোধ মিটাইবার উদ্দেশ্যে মিল মালিকদিগকে সালিশ ব্যবস্থা মানিয়া নিতে সম্মত করান এবং শ্রমিকদের তরফে তিনি ও তাঁহার বিশ্বস্ত সহচর বল্লভ ভাই সালিশী নিযুক্ত হন। কিন্তু আপোষ আলোচনা ফাঁসিয়া যায়।

শ্রমিকরা উপায়ান্তর না দেখিয়া দাবী মানাইবার জন্য ধর্মঘট করে। এই চরম ব্যবস্থা গান্ধিজীর মনোমত না হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং শ্রমিকদের দিয়া স্বীয় অনুমোদিত উপায়ে সংশোধন ব্যবস্থা করান। কিন্তু মালিকরা মজুরদের কোন সঙ্গত কথায়ও কর্ণপাত করিতে চাহেনা। এরূপ অবস্থায় গান্ধিজী নূতন উপায় উদ্ভাবনের জন্য কিয়ৎকাল সুনির্দিষ্ট কোন উপায় অবলম্বনের জন্য পথ নির্দেশ না করিয়া কাপড়ের কলের বাৎসরিক লাভালাভ, জীবিকা নির্বাহের বর্ধিত ব্যয়ের হার এবং কল-পরিচালনার ব্যয় প্রভৃতি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবন করেন। সমস্ত দিক পর্যালোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মজুরদের বেতন শতকরা ৩৫ টাকা বৃদ্ধি করা ন্যায়সঙ্গত। তবে শ্রমিকদের দাবী ইহার চেযে বেশী থাকিলেও তাহারা গান্ধিজীর প্রস্তাব মানিয়া নেয়। অথচ মিলমালিকরা শতকরা ২০৲ টাকার বেশী মজুরী বাড়াইতে সম্মত হয় না। অধিকন্তু তাহারা কোনরূপ উত্তেজনা ও গোলযোগের কারণ না ঘটায়ও ১৯১৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী সবকয়টি মিলে তালাচাবি লাগায় (lockout)।

মিল মালিকদের এই অহেতুক ও জবরদস্ত মনোভাবে গান্ধিজী একান্ত

বিরত বোধ করেন। কিন্তু তিনি নূতন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী এক অভিনব ব্যবস্থা করেন। তিনি শ্রমিকদের মধ্যে সংহতি স্থাপনের জন্য তাহাদের দিয়া শপথ করাইয়া নেন যে, দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাহারা কাজে যোগ দিবে না এবং মিল বন্ধ রাখার সময় শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এমন কিছু করিবে না। অধিকন্তু অনসূয়া বাঈ, শঙ্কর লাল ব্যাঙ্কার ও ছগনলাল গান্ধী প্রমুখ নেতা ও কর্মী ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে থাকেন এবং নানাস্থানে সভাসমিতির অনুষ্ঠান হইতে থাকে; গান্ধী-রচিত প্রচার-পত্রও এই সঙ্গে বিলি করা হয়; উহাতে তিনি মালিক-মজুর বিরোধের উপরই শুধু জোর দেন না; এই বিরোধকে তিনি নৈতিক ও মানসিক সংগ্রাম বলিয়াও অভিহিত করেন। শ্রমিকদের মধ্যে আত্মবল জাগ্রত করাই ছিল উহার উদ্দেশ্য।

কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার মধ্যে এক সপ্তাহকাল সংগ্রাম চালনার পর শ্রমিকদের মধ্যে ক্লান্তি ও চঞ্চলতার লক্ষণ দেখা দেয়; তাহারা আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে না পারিয়া কাজে ফিরিয়া যাইতে চাহে; অবশ্য মিল মালিকদের তুলনায় তাহাদের আর্থিক সঙ্গতি ও সংগঠন শক্তি ছিলনা বলিয়াই তাহারা দৌর্বল্য দেখায়। এই হেতু তাহাদের মধ্যে ভাঙ্গনের লক্ষণ দেখা দেয়। ইহাতে গান্ধিজী চিন্তিত হইয়া পড়েন। তিনি উপলব্ধি করেন, মিলশ্রমিকরা সত্যাগ্রহের কার্যক্রমের সহিত সুপরিচিত হয় নাই, নৈতিক বিজয়লাভকে তাহারা আর্থিক ক্ষতির তুলনায় তেমন প্রাধান্য দিতে অপারগ। কাজেই তাহাদের মধ্যে সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, শ্রমিকরা পূর্বগৃহীত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী না চলিলে তিনি প্রায়োপবেশন করিবেন।

গান্ধিজীর আমরণ অনশনের সংকল্প সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় শুভার্থী, বন্ধুবান্ধব ও দেশবাসীর একাংশের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে তাঁহার এই অভিনব আত্মনাশের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনেকে কঠোর

সমালোচনাও করেন। তাঁহারা বলেন যে, তিনি মিলমালিকদের দিয়া শ্রমিকদের দাবী পূরণ করাইয়া নিবার জন্য অন্যায়ভাবে তাহাদের উপর চাপ দিতেছেন। গান্ধিজী স্বীকার করেন, উহা প্রায়োপবেশনের পরোক্ষ ফল; প্রত্যক্ষ ফল হইল, শ্রমিকদের পূর্ব সংকল্পে অটুট রাখা।

এরূপ অবস্থায় মজুররা নিজেদের অনুসৃত ব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে; তাহারা সংগ্রামের বৈষয়িক লাভালাভ ও পারিবারিক ব্যয়-সঙ্কুলানে অক্ষমতার প্রশ্ন তুলিলে গান্ধিজী তাহাদিগকে অন্য কোন কাজ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতে বলেন। কিন্তু তিনি শ্রমিকদের খাদ্যাদি দিয়া সাহায্য করার ব্যবস্থা সমর্থন করেন না। তিনি মনে করেন, উহাতে সংগ্রামের নৈতিক মূল্য হ্রাস পাইবে। এই হেতু সবরমতী আশ্রম নির্মাণের কাজে অনেককে নিয়োগ করা হইলে তাহাদের অন্নসংস্থান হয় এবং সাময়িক-ভাবে তাহাদের সংগ্রাম-শক্তি ও মনোবল বাড়ে।

গান্ধিজীর প্রায়োপবেশনের ফলে মালিক-শ্রমিক বিরোধে এক গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হয়; দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে নেতৃবৃন্দ মালিকদের নিকট তার পাঠাইয়া গান্ধিজীর জীবন রক্ষা করিতে ও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী স্বীকার করিয়া লইতে অনুরোধ জানাইতে থাকেন। কাজেই মালিকদের মুখরক্ষা হইতে পারে এবং শ্রমিকদেরও দাবী মিটিতে পারে, এমন অবস্থার সৃষ্টি হইলে গান্ধিজীর প্রায়োপবেশনের চতুর্থ দিবসে আপোষ-মীমাংসার জন্য সালিশ নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারা শ্রমিকদের মূল দাবী (শতকরা ৩৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি) মানিয়া লওয়ার সুপারিশ করেন।*

* এই ব্যাপারের পর আমেদাবাদ কাপড়কল শ্রমিক সমিতির (Ahmedabad Textile labour Association) ভিত্তি স্থাপিত হয়। শ্রীমতী অনসূয়া বাঈ সরাভাই ও শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার উহার প্রতিষ্ঠাতা। উক্ত সমিতি গান্ধীবাদে অর্থাৎ সত্য ও অহিংসার পথে আপোষে বিরোধ মীমাংসার পক্ষপাতী।

মালিকশ্রমিক বিরোধে গান্ধিজীর হস্তক্ষেপের ফলে যে-জয়লাভ হয়, তাহাতে দেশবাসীর নিকট তাঁহার নেতৃত্ব আর এক নূতন রূপে দেখা দেয়। কেননা আত্মনিগ্রহের পথে প্রতিপক্ষের মনে করুণা উদ্রেক করিয়া তাহাকে দিয়া ন্যায্য দাবী স্বীকার করাইয়া লওয়ার প্রথা অভূতপূর্ব। এই ব্যাপারের পর গান্ধিজীর সংগঠন শক্তি ও আন্দোলন চালনার যোগ্যতা সম্পর্কে নেতৃবর্গও সংশয়হীন হন এবং দেশবাসীও তাঁহাকে নেতা বলিয়া মানিয়া লইতে দ্বিধা করে না।

## দুর্যোগের ঘনঘটা

ভাবী শাসনসংস্কার লাভের আন্দোলন শুরু হইলে দেশে দুই শ্রেণীর মতবাদের উদ্ভব হয়; সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ দক্ষিণ-পন্থী নেতা উহাকে ভারত সম্রাটের অনুগ্রহ বা পুরস্কার বলিয়া মনে করেন; পক্ষান্তরে বেশান্ত প্রমুখ বাম-পন্থী দল উহাকেই ভারতবাসীর স্বাভাবিক দাবী বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকেন। কাজেই হোমরুল আন্দোলনকে গবর্ণমেন্ট একাধিক কারণে সুনজরে দেখিতে পারেনা; তাহাদের ধারণা হয়, বৃটিশবিরোধী শক্তিসমূহ সংহত করিয়া সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যকে সংঘর্ষে আহ্বান করাই উহার উদ্দেশ্য। এই হেতু হোমরুল আন্দোলনের মুখপাত্রগণ এবং ইংরেজবিরোধী ও বিপ্লবী সন্দেহে ভারতের বহু খ্যাত-অখ্যাত নেতা ও দেশকর্মী গ্রেপ্তার ও অন্তরীন হন। পক্ষান্তরে য়ুরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশসাম্রাজ্য রক্ষায় মোতায়েন ভারতীয় সৈন্যরা জার্মান-কামানের বলিতে পরিণত হওয়ায় এবং রংরুট সংগ্রহের জবরদস্তীতে ভারতের তথাকথিত সামরিক শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দানা বাঁধিতে থাকে। শুধু তাহাই নহে; একদিকে সরকারী চাকরির গহন প্রবেশ পথগুলি অধিকতর দুর্গম করিয়া তোলা হয় এবং অন্যদিকে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী 'সাম্রাজ্যের অংশীদার'রূপেও সাম্রাজ্যিক সম্মেলনে এবং

সাম্রাজ্যিক সমর পরিষদে ( ১৯১৭ সালে ) কংগ্রেসের বে-সরকারী প্রতিনিধি গ্রহণের প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়।

সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ব্যাপার রাওলাট কমিটির সুপারিশ; উহা যেমন অসময়োচিত, তেমনি আমলাতন্ত্রের অভিসন্ধিপরায়ণ মনোভাবেরও পরিচায়ক। ইহার ফলে দেশবাসীর মনে ক্রমশ ধারণা জন্মিতে থাকে যে, সমূহ বিপদে পয়োমুখ ইংরেজ রাষ্ট্র-নীতিকরা ভারতবাসীকে রাষ্ট্রক্ষমতাদানের যে-আশ্বাস-বাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা সুদিনের আবির্ভাবে ইংরেজ বণিকবুদ্ধির নিকট মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতে চলিয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট 'বিপ্লব আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ষড়যন্ত্রের গতি-প্রকৃতি ও ব্যাপকতা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিলের জন্য স্যার সিড্‌নী রাওলাটকে সভাপতি এবং মিঃ কুমার স্বামী শাস্ত্রী, স্যার বেসিল স্কট, স্যর ভের্নী লোভেল ও স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্রকে সদস্য করিয়া এক কমিটি গঠন করেন। কমিটি সাময়িকভাবে প্রযুক্ত ভারতরক্ষা বিধানকে স্থায়ী করার জন্য সুপারিশ করে। কিন্তু এই ব্যবস্থাও পূর্বকল্পিত; উহাতেও প্রভুর কণ্ঠস্বরের হুবহু প্রতিধ্বনি শুনা যায়। কেননা ইতিপূর্বে ৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড নবোদ্ভূত আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিসমূহের আক্রমণাত্মক গতি লক্ষ্য করিয়া হুম্‌কি দেন যে আন্দোলনকারীদের সায়েস্তা করার জন্য আইন প্রণীত হইবে। অথচ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, তৎকালে বাঙলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লব আন্দোলন নানা কারণে ক্রমশ স্তিমিত হইয়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিলেই চলে।

এই প্রসঙ্গে সরকারী আক্রোশ ও বিরুদ্ধ মনোভাবের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। ভারতরক্ষা বিধানে আটক ষোল শত বন্দীর বিষয় পর্যালোচনার জন্য দুইজন হাইকোর্টের বিচারপতি লইয়া গঠিত কমিটি

আটশত ছয় জনের বিষয় বিবেচনা করেন ; কিন্তু বহু বিবেচনা করিয়া তাঁহারা মাত্র ছয় জনকে মুক্তিদানের সুপারিশ করেন। এই সব কারণে রাওলাট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে পর ভারতের নানাস্থানে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয় ; দেশবাসীও উহার সুপারিশকে নবজাগ্রত রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চালনা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া বর্ণনা করে। এই সম্পর্কে ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় উত্থাপিত প্রস্তাবে রাওলাট রিপোর্টের তীব্র নিন্দা করা হয় ; উহার মধ্যেই বিক্ষুব্ধ জনমতের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায়।

সংকটে বৃহৎ দানের প্রতিশ্রুতি দিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধহস্ত ; কিন্তু সঙ্কটোদ্ধারে ক্ষুদকণা বিতরণ করিয়া খুসী করার কার্পণ্য তাহারা কখনও করে না। এমনকি ধাপে ধাপে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের মত সাড়ম্বর ঘোষণার পরও চেম্‌সফোর্ড-গবর্ণমেণ্ট ১৯১৮ সালের ১৪ই মে প্রাদেশিক সরকার সমূহকে এই মর্মে নির্দেশ দেয় যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য নির্বাচিত ও এক-চতুর্থাংশ মনোনীত হইবে ; অধিকন্তু তাহাদের আয়ব্যয় নির্দ্ধারণের ক্ষমতাও থাকিবে। উনবিংশ শতাব্দীর নবম পাদে লর্ড রিপনের আমলে সর্বপ্রথম স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু মধ্যবর্তীকালে এদিকে আর তেমন উদ্যম দেখা যায় না। এইহেতু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পূর্বোক্ত ব্যবস্থায় বেসরকারী কর্তৃত্বের মাত্রা বাড়িলেও ভাবী শাসন সংস্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যে তাহা করা হয়, তাহাও নিঃসন্দেহ।

এই ব্যাপারের অব্যবহিত পর ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কিন্তু উক্ত রিপোর্ট প্রণয়ণ সম্পর্কে কিছুকাল পূর্বে ( ১৯৩৪ সালে ) বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে ; উহার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পূর্বকল্পিত দুরভিসন্ধিই প্রকট।

মণ্ট-ফোর্ড শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রণেতা বলিয়া কথিত তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ড ১৯১৬ সালের প্রথম দিকেও ভারতে টেরিটরিয়াল ফোর্সের বৃটিশ বাহিনীভুক্ত একজন মেজর ছিলেন। ঐ সময় তিনি জানিতে পারেন যে, তাঁহাকে ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করা হইয়াছে; তিনি রাজনির্দেশ অনুযায়ী বিলাত গেলে ভাবী ভারত শাসন পরিকল্পনা পূর্ব হইতেই রচিত হইয়া আছে বলিয়া অবগত হন। পরবর্তীকালে উক্ত পরিকল্পনার সহিত তাঁহার ও ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগুর নাম যুক্ত করা হয় মাত্র। এই ঘটনা কতকটা আজগুবী বলিয়া মনে হইলেও উহার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

ভারতসচিব পদে নিযুক্ত হইয়াই মিঃ মণ্টেগু ভারতে বিভিন্ন দলীয় নেতাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলাপআলোচনার পর শাসনতন্ত্র রচনা করা হইবে বলিয়া সদিচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাকে লোকচক্ষুর সমক্ষে ধূম্রাবরণ সৃষ্টির অপকৌশল ছাড়া অন্য কিছু বলিয়া অভিহিত করা যায় না; কেননা, ভাবী শাসনতন্ত্র কার্যকর করিবার পক্ষে উপযুক্ত ও সহযোগিতাকামী ব্যক্তিদের বাছাই করিবার এবং দেশের অগ্রগামীদল বা দলসমূহ বিরোধী হইলে তাঁহাদের সহযোগিতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইবার উদ্দেশ্যেই তিনি এদেশে আসেন। অধিকন্তু ভারত ভ্রমণকালে তাঁহার খাস কর্মচারী ছাড়াও স্যর মেস্টন (পরে লর্ড) ও মিঃ (পরে স্যর) উইলিয়াম ম্যারিসের মত ঝানু শাসকরাও তাঁহার সহযাত্রী হন; পরবর্তীকালে কেন্দ্রে ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্ববণ্টন সংক্রান্ত যে-মেস্টনী সিদ্ধান্ত হয়, বাঙলার পক্ষে তাহা হানিকর হয়। পক্ষান্তরে স্যর উইলিয়ম ম্যারিস যুক্তপ্রদেশের পুলিশের ইন্সপেকটর জেনারেল হন।

নানা ব্যাপারে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে, লর্ড মেস্টন, স্যর উইলিয়ম ম্যারিস ও মিঃ লায়নেল কার্টিস তথাকথিত মণ্টফোর্ড শাসন

সংস্কার পরিকল্পনার মূল উদ্ভাবক। স্যর উইলিয়ম মেয়ার উহার নামাকরণ করেন ডায়ার্কি (Diarchy) বা দ্বৈতশাসন; তদনুযায়ী ১৯১৯ সালের শাসনসংস্কার আইন উক্ত নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই, মিঃ লায়নেল কার্টিস ১৯০৫-৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় 'এশিয়াবাসী সংক্রান্ত দপ্তরের' সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহারই উদ্ভাবিত অপ-ব্যবস্থার ফলে ভারতীয়দের পক্ষে ট্রান্সভাল প্রবেশে কষ্টকর ও অপমানজনক হইয়া দাঁড়ায়।

বুয়র যুদ্ধশেষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ আফ্রিকার সিবিল সার্বিস সংগঠন কল্পে মেসার্স মেস্টন-ম্যারিস-কার্টিসকে নিয়োগ করে। তাঁহারাও যথাশীঘ্র কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের রাজনীতিক অবস্থা পর্যালোচনা শুরু করেন এবং কালক্রমে মণ্টেগুচেম্‌সফোর্ড শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ণে সফল হন। তবে উক্ত খসড়ার অধিকাংশ তাঁহাদের প্রথমোক্ত দুইজনের রচনা এবং শেষোক্ত ব্যক্তি উক্ত কার্যে বহুলাংশে তাঁহাদের সহায়তা করেন। এই ভাবে ১৯১৬ সালের মার্চের মধ্যে সমগ্র পরিকল্পনা বিন্যস্ত হয়।

কিন্তু সরকারী ব্যবস্থানুযায়ী মণ্ট-ফোর্ড শাসনতন্ত্রে ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু কংগ্রেস-লীগ চুক্তির মূল লক্ষ্য ও কার্যক্রম অগ্রাহ্য করিয়া শুধু সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা সমর্থন ও মুসলমান সদস্য সংখ্যা গ্রহণের ধারা মানিয়া নেন। অধিকন্তু মণ্ট-ফোর্ড শাসনতন্ত্রে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে কতকগুলি অতিরিক্ত নির্বাচনমণ্ডলী সৃষ্টি করিয়া ও স্বার্থ খাড়া করিয়া বিরোধের বনিয়াদ আরও পাকা করিয়া রচনা করা হয়।

বলা বাহুল্য, দেশবাসী ইহাকে সরল মনে গ্রহণ করিতে পারেনা এবং উহাকে অভিনন্দন জানাইতেও কুণ্ঠিত হয়।

শাসন সংস্কারের মর্ম অবগত হইবার পূর্বে দক্ষিণপন্থী নেতারা ত বটেই, কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত যুদ্ধান্তে বৃটিশ সরকার পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী

ভারতবাসীকে শাসন ব্যাপারে দরাজ হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে বলিয়া আশা করেন। ইহার কারণও যে কিছুটা না ছিল এমন নয়; অধিকন্তু যে-যুদ্ধে পনের লক্ষ ভারতবাসী জড়িত হইয়া একলক্ষ প্রাণ হারায় এবং নগদে ও পণ্যদ্রব্যে হাজার কোটীর টাকারও অধিক দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সঙ্কটে সহায়তা করে এবং প্রাচ্যের শান্তিরক্ষা পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ টাকার এক মোটা অংশ ভারত সরকারকে বহন করিতে হয়, তাহার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নৈতিক বাধ্য-বাধকতা তিলমাত্রও স্বীকার করিবে না, ইহা তিলক ও গান্ধীর মত নেতাও কল্পনা করিতে পারেন নাই। শাসন সংস্কারের ঘোষণা ও আশ্বাসে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ ইতিপূর্বে মত পরিবর্তন করেন। এবার তিলক ও বেশান্ত ক্রমশ সংস্কারকামী হইতে থাকেন এবং রাজনীতিতে এইহেতু তাঁহাদের প্রতিপত্তি হ্রাসের সূচনা হয়।

## তিলক ও গান্ধী

তিলক তাঁহার রাজনীতিক জীবনের প্রথম দিকে আপোষবিরোধী বিপ্লবপন্থী হইলেও পরবর্তীকালে [ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ] পারস্পরিক সহযোগিতার নীতিতে ( responsive co-operation) আস্থাশীল হইয়া পড়েন এবং তিনি ভারতে বৃটিশ নীতির কঠোর সমালোচক হইয়াও যুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহের জন্য কিছুকাল আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিবেশে তিনি রাজনীতিক সুযোগ গ্রহণের জন্যই সর্তাধীনে তাহা করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বোম্বাই-এর গবর্ণর যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক আহ্বান করিলে তিলক ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন; এই হেতু তাঁহাকে দুই মিনিটের বেশি সময় বলিবার সুযোগ

দেওয়া হয় না। ইহা সত্ত্বেও তিলকের পূর্বের মতামতের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্যকলাপে শংকা বোধ করিতে থাকে; এই হেতু মহারাষ্ট্রে ১৯১৮ সালে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পূর্ব-অনুমতি ব্যতীত তাঁহাকে সভা আহ্বান পর্যন্ত করিতে দেওয়া হয় না। যুদ্ধের শেষ দিকে তিনি গান্ধিজীকে জানান যে, ভারতীয়দিগকে সৈন্য বিভাগে কমিশন দেওয়া হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে সক্ষম হইলে মহারাষ্ট্র হইতে তিনি ৫ হাজার রংরুট সংগ্রহ করিয়া দিবেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, তিলক সর্তাধীনে সরকারকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। ইহা সত্ত্বেও চরমপন্থী তিলককে সহযোগিতাকামী হইতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অধিকাংশ বামপন্থী কংগ্রেসসেবীর পূর্বের ন্যায় তেমন শ্রদ্ধা অটুট ছিল না; তাঁহার প্রতি একমাত্র বেশান্তেরই শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকে। কাজেই ১৯১৮ সালে তিলককে গবর্ণমেণ্টও নানাভাবে নির্যাতন করিতে ছাড়েনা, আবার কংগ্রেসেও তাঁহার সর্বব্যাপক প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। তিলকের উভয়-সংকটমূলক রাজনীতিই এজন্য দায়ী। পক্ষান্তরে গান্ধিজী যদিও ( স্যার সুরেন্দ্রনাথের মত ) যুদ্ধের প্রথমাবধি রংরুট সংগ্রহ ব্যপদেশে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সফরকালে স্বীয় স্বাস্থ্য বিপন্ন করিয়া তোলেন, তথাপি ভারতের কয়েকস্থানে কিষাণ ও মজুরদের পক্ষ হইয়া সরকার ও মালিকদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়ায় তাঁহার অনুসৃত নীতি ও কার্যক্রমের মর্ম অনুধাবন করিতে দেশবাসী কথঞ্চিৎ সমর্থ হয়।

তিলক সংগ্রামপন্থী হইলেও সংগ্রামের কোন কার্যসূচী দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিতে পারেন না; পক্ষান্তরে গান্ধিজী অহিংসবাদী ও আপোষকামী হইয়াও আন্দোলন পরিচালনার উপযোগী কার্যক্রম একাধিকবার দেশের নিকট উপস্থিত করেন এবং উহার কার্য্যকারিতাও পরীক্ষিত হয়।

ইতিপূর্বে মডারেড-নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের মধ্যে সংগ্রামের তাগিদ ছিল না; নেতৃবৃন্দ নিয়মতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ও শাসক শক্তির আশ্বাসে আস্থাশীল

ছিলেন। কাজেই বঙ্গভঙ্গ ও মহাযুদ্ধের সময় সঙ্ঘর্ষের আহ্বান আসিলেও তাহাতে তাঁহারা ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। ইহার ফলে কংগ্রেস দেশবাসীর অন্তরে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই; পক্ষান্তরে চরমপন্থী বিপ্লববাদী ও জাতীয়তাবাদীদের সঙ্ঘর্ষের মধ্যে রুদ্ধকণ্ঠ জনমতের অভিব্যক্তি দেখা যায়। তাঁহাদের দাবীও ক্রমশ উচ্চকিত হইয়া উঠিতে থাকে। বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দেশবাসীর অন্তর জুড়িয়া বসে, তাঁহারাই হইয়া উঠেন সকলের নমস্য। আর কংগ্রেস হইয়া পড়িল আইনজ্ঞ মহাশয় ব্যক্তিদের বক্তৃতামঞ্চ।

গান্ধিজী এই নিষ্ক্রিয় দৈন্য ও চরমপন্থার মধ্যবর্তী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন; অবশ্য ইহা তাঁহার জীবনদর্শন ও কর্মপদ্ধতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি এই সময় এক নূতন পথান্বেষী হন। একদিকে তিনি সরকারী আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া তদনুযায়ী কার্যে প্রবৃত্ত হন, অন্যদিকে তাহাদের ঔদ্ধত্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে যুঝিতেও পরাঙ্মুখ হন না।

এই আপোষ ও দ্বন্দ্বের রফামূলক দ্বৈতবাদ গান্ধীনীতির অপরিহার্য অঙ্গ। এই হেতু অহিংস সাধক হইয়াও যখন তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ রণনীতির সমর্থনে সৈন্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হন, তাহাতে একাধারে তাঁহার সত্যাগ্রহনীতির মূলসূত্র ও প্রতিপক্ষের আপদে সাহায্য দানের আকাঙ্ক্ষাই পরিস্ফুট হয়। ১৯১৪ সালের ১৪ই জুলাই যুদ্ধারম্ভের পর তিনি ৬ই আগস্ট বিলাত যান এবং তথাকার প্রবাসী ভারতীয়দের লইয়া এক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করেন। এই সম্পর্কে তিনি ভারতীয়দের এক সভায় যে-বক্তৃতা দেন, তাহার অন্তর্নিহিত সুর ও মনোভাবে অনেকে আপত্তি করেন। কিন্তু গান্ধিজী 'ইংরেজের বিপদের সময় দাবী উপস্থিত করা যুক্তিযুক্ত মনে' করেন না। অধিকন্তু 'লড়াই-এর সময় নিজেদের অধিকারের দাবী মুলতুবী রাখার সংযম রক্ষা করা—সভ্যতা ও দূরদৃষ্টির দিক হইতে আবশ্যক' বলিয়া মনে করেন।

এই ব্যাপারে নাজেহাল হইয়াও তিনি বিপন্ন বৈরীকে অধিকতর বিপন্ন

করিয়া আদৌ সুবিধা গ্রহণ করিতে চাহেন না। বরং তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বিপদে গবর্ণমেন্টকে সহায়তা করিলে ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে।

১৯১৮ সালে জুন মাসে গুজরাটের খেড়া জেলায় সৈন্য সংগ্রহের জন্য তিনি এক বক্তৃতা দেন ; উহাতে তিনি বলেন-- "ভারতীয় সৈন্যের সহায়তায় যুদ্ধে জয়লাভ করা হইলে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অস্বীকার করা যাইবে না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, আশু কিছু লভ্য না হইলে পরবর্তীকালে আমরা প্রতারিত হইব। সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনায়কদের আশ্বাসে আস্থাহীন হইলে আমাদের আত্মশক্তিতে আস্থা হারাইতে হইবে। উহা আমাদের দুর্বলতার লক্ষণ। × × আমাদের স্বকীয় যোগ্যতা ও শক্তির উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। 'স্বরাজ্য' লাভে ইচ্ছা থাকিলে সাম্রাজ্যের সহায়তা করা আমাদের কর্তব্য এবং নিঃসন্দেহে আমরা সাহায্যদানের পুরস্কার লাভ করিব।' ইহার মধ্যে গান্ধিজীর যুদ্ধ-সমর্থক নীতির বিরুদ্ধবাদী সমালোচকদের প্রতি উত্তর দানের প্রয়াস সুস্পষ্ট।

১৯১৭-১৮ সালে মহাযুদ্ধে ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হয় ; বৃটেন পর্যাপ্ত সহায়তার অভাবে বিষম বিপন্ন হইয়া ধনে-জনে ভারতের অধিকতর সাহায্য চায়। এই সময় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ ভারতবাসীদের বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, বৃটেনের স্বার্থে নহে, ভারতের স্বার্থেই যুদ্ধে তাহাদের সাহায্য করা উচিত। ১৯১৮ সালের ২রা এপ্রিল তিনি এক বিবৃতিতে বলেন,—

'য়ুরোপে প্রাধান্য স্থাপনই জার্মান শাসকদের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, এশিয়ার উপর আধিপত্য করাও তাহাদের উদ্দেশ্য। এই হেতু ভারতের কর্তব্য জার্মানীকে বাধা দিয়া এশিয়াকে রক্ষা করা।' এই ঘোষণার পরবর্তী ধাপ হিসাবে ২৭শে এপ্রিল দিল্লীতে যুদ্ধ সম্মেলন আহূত হয় ; উহাতে

যোগদানের জন্য ভারতীয় নেতৃবর্গ আমন্ত্রিত হন। বৈঠকে এই মর্মে সম্রাটের বাণী পঠিত হয় যে 'সাম্রাজ্যের সহায়তা করিলে ভারতের অভীষ্ট লাভ হইবে। [ The need of the Empire is India's opportunity ]

গান্ধিজী প্রথমে উক্ত বৈঠকে উপস্থিত থাকিতে অসম্মত হন; তবে তিলক ও বেশান্তকে উহাতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ না করার জন্যই যে তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত করেন তাহা নহে; যুদ্ধান্তে রাশিয়ার ভাগে তুরস্কের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল দেওয়া হইবে বলিয়া বৃটেন রাশিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে, তিনি এই মর্মে খবর শুনিতে পাইয়াই উক্ত সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু উহার অল্পকাল মধ্যে আভ্যন্তরীন বিপ্লব হেতু রাশিয়া যুদ্ধ হইতে সরিয়া পড়ে। এই হেতু গান্ধিজী স্বীয় সিদ্ধান্ত পাল্টাইয়া দিল্লী বৈঠকে যোগ দিতে স্বীকৃত হন ও তদনুযায়ী তিলককে দিল্লীতে আসিতে তার করেন।

তৎকালে ভারতীয় রাজনীতিতে তিলকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনন্যসাধারণ ছিল; কাজেই তিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তিলকের সমর্থন একান্ত প্রয়োজন। এরূপ অবস্থায় দিল্লী প্রবেশে বাধানিষেধ হেতু তিলক তাঁহার অনুরোধমত তথায় যাইতে অস্বীকার করিলে গান্ধিজী উহার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তদনুযায়ী তিলকের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় এবং নেতৃবৃন্দ বৈঠকে যোগ দেন। গান্ধিজীও ভাবী শাসন সংস্কার সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের আশ্বাস পাইয়া তাহাদিগকে সর্বপ্রকার সহায়তা করিতে রাজি হন; তিনি ঐ সুযোগে সরকারী বৈঠকে দেশীয় ভাষায় (হিন্দুস্থানীতে) সর্বপ্রথম বক্তৃতা করেন; তাহাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

নেতৃবর্গের সমর্থন ও আশ্বাস সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় সম্পর্কে জনসাধারণ ক্রমশ সন্দেহপরায়ণ হইয়া উঠে। তাহাদের কথায় ও কাজে আকাশপাতাল অসামঞ্জস্য দেখা যাইতে থাকে। বিপ্লবপন্থী ব্যতীত সর্ব

শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ যখন যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তখনও গবর্ণমেণ্ট জনমত রুদ্ধ করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কোচের জন্য বিবিধ দমন-মূলক আইন প্রণয়নে বিরত হয় নাই। একদিকে তাহারা ভাবী শাসন সংস্কারের প্রতি নেতৃবর্গের মারফৎ দেশবাসীকে উন্মুখ করিয়া তুলিতে থাকে, অন্যদিকে সম্ভাব্য প্রতিকূলাচারীদিগের কণ্ঠরুদ্ধ করিবার ব্যবস্থার মহড়া চলে। বরাভয় ও অরাতিনাশনের দ্বৈত আয়ুধে সজ্জিত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট রণে অবতীর্ণ হইবার আয়োজন করে।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর মাদ্রাজ কংগ্রেসে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত ভারতের সমমর্যাদার দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় বটে, কিন্তু তৎসহ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধে সাহায্যের অঙ্গীকারও দেওয়া হয়। তবে স্যর সুরেন্দ্রনাথের মত সর্বজনমান্য নেতা যখন উহাকে বৃটেনের অনুগ্রহদত্ত দান বলিয়া অভিহিত করেন, তখন অ্যানি বেশান্তের মত নবাগত পর্যন্ত ঐ মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বলেন যে, "ভারতের দাবীকে অনুগ্রহদত্ত দান বলিয়া অভিহিত করা যায় না ; তাহার এদাবী ভারতের জনসাধারণের দাবী ; উহার পশ্চাতে বিশ্ববাসীর নৈতিক সমর্থন রহিয়াছে।' [How India wrought for freedom—By Annie Beasant] কাজেই যুদ্ধে সাহায্যের বিনিময়ে স্বায়ত্ত শাসনের জন্য কংগ্রেস যে-দাবী জানায়, তাহার মধ্যে প্রার্থনার চেয়ে অধিকারবোধই বেশি ব্যক্ত হয়। কংগ্রেসে বামপন্থী দল ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করায় এবং কংগ্রেসের বাহিরে সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের চাপ পড়ায় কংগ্রেসের দাবীতে দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। সশস্ত্র বিপ্লবীরা ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে দেশের স্বাধীনতার জন্য যে-অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেন, তাহাতে স্বভাবতই তাঁহারা দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও আস্থাভাজন হন। কংগ্রেসী নেতারা তখন জনমতের এই সুস্পষ্ট লক্ষণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বিপ্লবীদের প্রচেষ্টার ফলেই তখন

মুক্তিকামীদের মনে এই প্রত্যয় জন্মে যে স্বাধীনতা প্রার্থিত বস্তু হিসাবে আসিবে না, মূল্য দিয়া তাহা অর্জন করিতে হইবে।

## দ্বিধাজড়িত নেতৃত্ব

ইহা সত্ত্বেও কংগ্রেস 'বৃটেনের বিপদকে ভারতের সুযোগ' বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হয়। সেরূপ অবস্থায়ও নীতির দিক হইতে বৃটেনের সদিচ্ছার উপর একান্ত নির্ভরশীল থাকাই তাঁহারা সঙ্গত মনে করেন। মনোগতভাবে অধিকারবোধ জন্মিলেও কার্যত কংগ্রেসী নেতৃবর্গের মধ্যে বৃটিশ শক্তির উপর আস্থা ও নির্ভরশীলতা থাকিয়া যায় এবং সেইজন্যই যুদ্ধে বৃটিশ শক্তির সহিত সহযোগিতার পথই তাঁহারা বাছিয়া নেন। বৃটেনের নিকট হইতে সুবিচার পাওয়ার প্রত্যাশা মনে মনে ছিল বলিয়াই বিপদের দিনে বৃটেনকে বিব্রত করার নীতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পরিহার করিয়া চলেন এবং তাঁহাদের এই দ্বিধাজড়িত মনোদৌর্বল্যের সুযোগ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধরগণ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী স্পষ্টত প্রকাশ পাইলেও দেশবাসীর সমক্ষে নেতৃবর্গ কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা উপস্থিত করিতে পারিলেন না। সক্রিয়তার অভাবেই কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শগত মিল থাকিলেও নীতিগত পার্থক্য দেখা দিল। সশস্ত্র বিপ্লবীরা যে-পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা গণআন্দোলনের অনুকূল ছিল না। তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাঁহাদের কর্মপন্থা স্বভাবতই ছিল গোপন। ইহা সত্ত্বেও সেনা বিদ্রোহ হইলেই তাহা ব্যাপকতা লাভ করিয়া গণআন্দোলনে পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু সেই সম্ভাবনা প্রায় একরূপ গোড়াতেই অন্তর্হিত হওয়ায় দেশের মধ্যে প্রকাশ্যে গণবিদ্রোহজনক কোন সক্রিয় কর্মপন্থা বিপ্লবীদের পক্ষে উপস্থিত করা সম্ভব হইল না।

স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবীরাই ছিলেন তখন অগ্রণী। তাঁহারা বাদে যেসকল বামপন্থী ছিলেন, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কল্পনাও তাঁহারা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তবে ইচ্ছা করিলে তাঁহারা তখন দেশবাসীর সমক্ষে যে-এক সক্রিয় বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের কর্ম্মসূচী উপস্থিত করিতে পারিতেন, তাহা সহজে অনুমান করিতে পারা যায়। কিন্তু বৃটিশ শক্তির সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দ্বারা লাভবান হওয়া যাইবে কিনা, এবিষয়ে তাঁহাদের মনে সংশয় ছিল এবং এই সংশয় ছিল বলিয়াই তাঁহারা তখন কোন সক্রিয় আন্দোলনের উপায় নির্ধারণ করা তেমন প্রয়োজন বোধ করেন নাই। একদিকে বৃটিশ সুবিচারে আস্থা এবং অন্যদিকে জাতির শক্তিতে সংশয়, এই দুই মনোভাবের দ্বন্দ্বে পড়িয়া তখনকার কংগ্রেসের কর্ণধারগণ এক বৃটিশ তোষণ-নীতির আশ্রয় নেন। অধিকন্তু নিজেদের দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য নৈতিক দোহাই পাড়িয়া একরূপ বিনাসর্তে ধনজন দিয়া যুদ্ধে বৃটিশ শক্তিকে সাহায্য করেন।

দেশে তখন আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী লইয়া যে-মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল, লক্ষ্ণৌ-চুক্তি তাহারই অনিবার্য পরিণতি। ভারতের অখণ্ড জাতীয় দাবীকে উপস্থিত করিবার জন্যই কংগ্রেস মুসলমানদিগকে কিঞ্চিৎ সুবিধা দিয়াও তাহাদের সহিত লক্ষ্ণৌ-চুক্তি সম্পাদন করেন। দাবী যাহাতে সর্বজনগ্রাহ্য হইতে পারে তজ্জন্য কোন কোন সর্তে (যেমন স্বতন্ত্র নির্বাচন) গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিকেও কিছুটা ক্ষুণ্ণ করা হয়। কিন্তু এই চুক্তির ফলে ভারতের জাতীয় জীবনে এক নূতন ঐক্যানুভূতি আসে এবং অবিভক্ত জাতীয় ভারত বিদেশীর দৃষ্টিতে অভিনব মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু এই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে-সংগ্রামায়োজন করা প্রয়োজন ছিল, নেতৃবর্গ তাহাতে পরাঙ্মুখ হন। বলা বাহুল্য কোন দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহার পশ্চাতে সংগ্রামশীল শক্তি থাকা আবশ্যক; তাহা

না হইলে বিপক্ষ অনায়াসেই সেই দাবীকে অগ্রাহ্য করিতে পারে। কার্যত হইলও তাহাই। বৃটিশ শক্তি যখনই বুঝিল, লক্ষ্ণৌ চুক্তির পশ্চাতে ভারতীয় নেতৃবর্গের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নাই তখনই তাহারা ছেড়া কাগেজর মত তাহা বর্জন করে। কেবল সেখানেই তাহারা থামিল না, ভারতের জাতীয় দাবীকে দাবাইয়া দিবার জন্য পাল্টা আঘাত হানিয়া বসিল। দেশের সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী শক্তিকে দমনের জন্য ১৯১৫ সালে তাহারা ভারতরক্ষা আইন জারী করিল এবং তাহার প্রথম আঘাত পড়িল ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে তখনকার সর্বাপেক্ষা অগ্রণী দল সশস্ত্র অভ্যুত্থানকামীদের উপর। ক্রমে সেই নাগপাশ দেশের রাজনীতিক চেতনাসম্পন্ন প্রত্যেক দেশভক্তকে আবেষ্টন করিল। তিলক-বেশান্তও উহার খপ্পর হইতে রেহাই পাইলেন না। ফলে দেশের মধ্যে যে-বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মূলেই বিনষ্ট হইল। কেবল দমননীতির আশ্রয়ই নেওয়া হইল এমন নহে; ভারতে যাঁহারা তোষণ-নীতিতে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে হাত করিবার জন্য সুচতুর ইংরেজ কূটনীতিকগণ এক নূতন ফাঁদ পাতিলেন। ১৯১৭ সালে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ভারতবাসীকে ভাবী শাসন-সংস্কার দানের আশা দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে চাহিলেন। অথচ দেশবাসীর আস্থাভাজন ব্যক্তিরা লক্ষ্ণৌ-চুক্তিতে বর্ণিত যে-জাতীয় দাবী উত্থাপন করেন, অথবা বড়লাটের ব্যবস্থা পরিষদের ১৯ জন বিশিষ্ট সদস্য ভাবী শাসনতন্ত্রের যে-খসড়া পরিকল্পনা করেন, তাহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ধর্তব্যের মধ্যেই আনিলেন না। পক্ষান্তরে তাহাদেরই পরিকল্পিত শাসনসংস্কার ভারতবাসীরা গলাধঃকরণ করিতে যাহাতে বাধ্য হয়, তজ্জন্য উদ্যোগী হইয়া উঠে।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষের এই অসদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তিলক এই মর্মে মন্তব্য করিলেন যে, শাসন পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য

এবং বেশান্ত বলিলেন যে, উহা ইংলণ্ডের পক্ষে দানের এবং ভারতের পক্ষে গ্রহণের উপযুক্ত নহে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কংগ্রেস আপোষযোগ্য মধ্যপন্থা গ্রহণ করেন এবং ১৯১৭ সালের কংগ্রেসে মণ্টেগু রিপোর্টের দোষ-ত্রুটী দেখাইয়া তাহা সংশোধনের আভাস দেওয়া হয় এবং ভারতরক্ষা আইন, ১৮১৮ সালের তিন আইন ও বিবিধ দমনমূলক আইনের ব্যাপক প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া তদন্তের জন্য একটি পার্লামেণ্টারী কমিশন নিয়োগেরও দাবী জানান হয়।

১৯১৮ সালে দিল্লী কংগ্রেসে তিলক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন; কিন্তু তিনি বিলাতে স্যর ভ্যালেণ্টাইন চিরলের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা পরিচালনা ও অন্যবিধ ব্যবস্থা করায় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়; উহাতে হাকিম আজমল খাঁ ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ৪,৮৬৫ জন প্রতিনিধি উহাতে যোগ দেন। অর্থাৎ কংগ্রেস যতই সরকারী প্রভাব কাটাইয়া আত্মস্থ হইবার উদ্যোগ করে, দেশবাসীও ততই বেশীমাত্রায় উঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে।

দিল্লী অধিবেশন আরম্ভ হইবার দিন কয়েক আগে (১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর) যুদ্ধবিরতি হয়; ইহার ফলে সমগ্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু ভারত সম্পর্কে বৃটিশ নীতির কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত হয় না; বৃটেন পূর্ববৎ কুটিল পথে আবর্তন করিতে থাকে। বরং নবোদ্ভূত পরিস্থিতিতেও বৃটিশ শাসকরা পুরাতন জঙ্গী ও দমনমূলক আইন কায়েম রাখিবারই ব্যবস্থা করে। এইহেতু দেশে বৃটিশ সদিচ্ছা সম্পর্কে যুদ্ধকালে কংগ্রেসের মধ্যে যে-সহযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎকালীন অবস্থায় তাহার পরিবর্তে আশাভঙ্গজনিত বিক্ষোভ ও হতাশ্বাস প্রকট হইয়া উঠে। কংগ্রেস ভাবিয়াছিলেন, যুদ্ধকালে মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রনায়কদের ঘোষণা অনুযায়ী

যুদ্ধোত্তর ভারতের রাষ্ট্রিক আদর্শ ঘোষণার অধিকার দেশবাসীর থাকিবে এবং ভারতবাসীই শাসনতন্ত্র রচনার অধিকারী হইবে। কাজেই যখন মণ্টফোর্ড শাসন পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় তখন স্বভাবতই দেশবাসী বিষণ্ণ ও রুষ্ট হয়। কংগ্রেস দেশবাসীর মনোভাবের প্রতিধ্বনি করিয়া ভাবী শাসনসংস্কারকে অনাবশ্যক ও নৈরাশ্যকর বলিয়া অভিহিত করেন এবং বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া শাসনতন্ত্রের বদলে ভারতবাসীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করেন। অধিকন্তু যুদ্ধের জরুরী অবস্থায় সর্বপ্রকার দমনমূলক আইন অবিলম্বে রদ করার এবং শাসকবর্গের উপর প্রদত্ত যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার, অন্তরীন ও বহিষ্কারের ক্ষমতা, ভারতরক্ষা আইন, সংবাদপত্র দমন আইন, রাজদ্রোহকর সভানুষ্ঠান আইন, পুরাতন ও সর্ববিধ পীড়নমূলক আইন আশু প্রত্যাহার এবং সমুদয় রাজবন্দী, রাজনৈতিক বন্দী ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তির জন্যও কংগ্রেস দাবী করেন। কংগ্রেস আরও দাবী জানান যে, যুদ্ধে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের কথা বিবেচনা করিয়া আসন্ন শান্তি সম্মেলনে ভারতবর্ষের তরফে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কংগ্রেস-মনোনীত তিলক, গান্ধী ও হাসান ইমামকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু উহা অগ্রাহ্য করিয়া নরমপন্থী সতেন্দ্র প্রসন্ন সিংহকে উক্ত সম্মেলনে পাঠান হয়। ইহা ছাড়া, রাওলাট কমিটির রিপোর্ট পুনরায় বিশদ পর্যালোচনা করিয়া কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী কার্য করা হইলে শাসন সংস্কার পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

বলা বাহুল্য, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন দেখা গেলেও প্রাচীন রীতি অনুযায়ী '১৮ সালের কংগ্রেসেও রাজানুগত্য প্রকাশ করিয়া সাফল্য সহকারে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটায়, অভিনন্দন জানান হয়! তবে যুবরাজের ভারতে আগমন সংক্রান্ত

ব্যাপারে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি হইলে কংগ্রেস সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের প্রস্তাব বর্জন করেন।

এইভাবে কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব সমূহের মারফৎ জাতীয় স্বপ্ন ও কামনা রূপায়িত হইয়া উঠিতে থাকে নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই পরিবর্তনশীলতাও নিতান্ত আকস্মিক ব্যাপার নহে ; ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক স্বার্থসংঘাত হেতু কংগ্রেসী কর্মপন্থাও বামপন্থী ও সংঘর্ষপরায়ণতার দিকে গতি নেয়। এই হেতু '১৮ সালের কংগ্রেস্ আত্মানুশীলনের প্রথম পর্যায় অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রত্যয় ও আত্মাধিকার অর্জনের দ্বিতীয় পর্যায়ে উপস্থিত হইলে, সর্ব-শ্রেণীর দেশবাসীর স্ফুটনোন্মুখ রুদ্ধ ভাবাবেগ ও আশাআকাঙ্ক্ষা উহার মারফৎ আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করে। কংগ্রেস সম্মিলিত জাতির আন্দোলনের পাদপীঠে পরিণত হইবার প্রাথমিক অধিকার অর্জনে সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে বিপদোত্তীর্ণ বৃটেন ক্রমশ মীমাংসাবিমুখ হইয়া উঠায় এবং ভারতবাসীর হাতে শাসন ক্ষমতার ভগ্নাংশও হস্তান্তরে কুণ্ঠা প্রকাশ করায় যুদ্ধক্ষত ও শোষিত দেশবাসীর মধ্যে বৃটেনের প্রতি সদিচ্ছার পরিবর্তে অবিশ্বাস ও বৈরভাবের সঞ্চার হইতে থাকে।

## কুখ্যাত রাওলাট আইন ও গণবিক্ষোভ

দেশবাসীর এই পরিবর্তিত মানসিকতার মধ্যে ১৯১৯ সালের ১৯শে জানুয়ারী রাওলাট কমিটির রিপোর্ট বাহির হয় ; উহার সুপারিশ অনুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট ৬ই ফেব্রুয়ারী বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় কল্পিত বিপ্লব ও অরাজকতা দমনকল্পে ভারতরক্ষা আইনকে ভিন্ন নামে কায়েম করার উদ্দেশ্যে রাওলাট বিল নামক এক দমনমূলক আইনের খসড়া পেশ করে।

কিন্তু ভারতবাসীর রাজনৈতিক আন্দোলনের অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সঙ্কোচ করাই ছিল উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। উক্ত আইনে এই মর্মে

বিহিত হয় যে অঞ্চলবিশেষে আপদকালীন অবস্থা ঘোষণা ও উহার অধিবাসীদের সহিত শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী হিসাবে আচরণের এবং সন্দেহবশে গ্রেপ্তার ও নির্বাসনের অধিকার শাসকবর্গের থাকিবে। কাজেই ইহার বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ উত্থিত হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কালের ইঙ্গিত উপেক্ষা করাই স্বীয় স্বার্থ-উদ্ধারের অনুকূল বলিয়া মনে করে। এইহেতু রাওলাট আইন উপলক্ষ করিয়া দেশে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ মাথা চাড়া দেয়; তবে উহার পটভূমিকা ব্যাপক ও বৃহত্তর।

মহাযুদ্ধে ভারতবাসীর মধ্যে যেমন চরম অস্বস্তি ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয় তেমনি সকলের মধ্যে কমবেশী নূতন আকাঙ্ক্ষা ও আশা জাগে। এতকাল এশিয়ার উপর সর্ববিষয়ে য়ুরোপীয় শ্রেষ্ঠত্বের যে-কাহিনী সকলকে শিখান-পড়ান হইতেছিল, তাহার অসারত্ব বিপর্যয়ের সংঘাতে প্রকট হয়। ধনজন ও সম্পদ বলের বিপুল অধিকারী ভারতের প্রয়োজন বৃটিশ সাম্রাজ্য-রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া পড়ে। যুদ্ধের প্রয়োজনে বিদেশে প্রেরিত ইংরেজ সিবিলিয়ান ও সামরিক কর্মচারীর অভাবে ভারতবাসীদের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়; তাহারাও সুচারুরূপে শাসনকার্য নির্বাহ করিতে থাকায় সাধারণ ভারতবাসী নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন এবং ইংরেজ শাসকদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হইতে থাকে। অধিকন্তু স্ব-শাসনের অধিকার সম্পর্কেও যে-মনোভাব গড়িয়া উঠে, তাহাও আত্ম-প্রকাশের পথ খোঁজে। পক্ষান্তরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের মালমশলা সরবরাহ ও শিল্পসম্ভার উৎপাদনে পশ্চাদপদ ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজন অনুভব করে। এই হেতু যে-অনগ্রসর ভারতীয় শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য কয়েকটি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করায় লর্ড মর্লে'র মত উদারনৈতিক ভারত সচিবও তাহাদের উৎসাহ সঙ্কোচ করেন, পরবর্তীকালে যুদ্ধের সময় ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯১৫ সালে ভারতের শিল্পোন্নয়নকল্পে সুনির্দিষ্ট ও আত্ম-

সচেতনশীল ব্যবস্থা অনুসরণের নীতি গ্রহণ করে; অধিকন্তু 'শিল্পসম্ভার উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে এমনভাবে ভারতকে যথা-সম্ভব সাহায্য করার' প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ইহার ফলে ভারতীয় শিল্পোৎ-পাদনে আকস্মিক গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। ১৯১৩-১৪ সালে যেখানে তাহার মোট রপ্তানীর পরিণামের তুলনায় শতকরা ২২'৪ ভাগ মাল উৎপন্ন হইত, সেখানে তাহা '১৮-১৯ সালে বাড়িয়া ৩৬'৬ ভাগ-এ আসিয়া দাঁড়ায়। তাহা ছাড়া সামরিক চাহিদা যোগান দেওয়ায়, নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন হওয়ায় এবং বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হ্রাস পাওয়ায় মৃতপ্রায় শিল্পবাণিজ্য চাঙ্গা হইয়া উঠে।

বোম্বাই-এর কাপড়ের কল ও বাঙলার পাটকলগুলি অসম্ভব মুনাফা লুটিতে থাকে। তাহারা উহাদের অংশীদারদের শতকরা ১ শত হইতে ২ শত টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ বিতরণ করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি শতকরা মাত্র ৯ ভাগ এবং আমদানী বস্ত্র (অধিকাংশই বৃটেন হইতে) শতকরা ৬৪ ভাগ ভারত-বাসীর অভাব পূরণ করিত; কিন্তু '২১ সালে ভারতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ বাড়িয়া শতকরা ৪২ ভাগ হয় এবং আমদানী বস্ত্রের পরিমাণ কমিয়া শতকরা মাত্র ২৬ ভাগ-এ আসিয়া দাঁড়ায়। আর আমদানী বস্ত্রের উপর গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৭½ টাকা শুল্ক ধার্য করায় ভারতীয় মিল মালিকরা খুসী হয়; অবশ্য ল্যাঙ্কশায়ারের প্রতিযোগিতা তেমন ছিল না বলিয়া উক্ত ব্যবস্থা হয়। তবে মধ্য প্রাচ্যের সমর চাহিদা মিটাইবার জন্য এখানে বৃটিশ-নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি মূল শিল্পের পত্তন করা হয়। যে-ভারতীয় ইস্পাত ও লৌহ শিল্পে ১৯১৩ সালে বার্ষিক ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ১৯ শত টন ছিল তাহা যুদ্ধের প্রয়োজনে বাড়িয়া '১৮-১৯ সালে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৮৯০ টন হয়। অধিকন্তু সামরিক চাহিদা যোগান দেওয়ায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন

হওয়ায় এবং বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হ্রাস পাওয়ায় এবং সর্বোপরি মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় ভারতের মৃতপ্রায় বিবিধ শিল্প পুনর্জীবন লাভ করে,। এই হেতু কয়েকটি নূতন শ্রমশিল্পেরও পত্তন হয় এবং সমগ্রভাবে ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ফাঁপিয়া উঠে। তাহা ছাড়া ভারতে বৃটেনের পণ্যদ্রব্য আমদানীর পরিমাণও যথেষ্ট হ্রাস পায়।

১৮৭০ সালে সুয়েজ খাল খননের পর ১৮৮০ সালে ভারতে বৃটিশ উৎপন্ন দ্রব্য শতকরা ৮১·১ ভাগ আমদানী হয়; কিন্তু যুদ্ধারম্ভে জার্মান মালের প্রতিযোগিতায় ও অন্যবিধ কারণে উহা হ্রাস পাইয়া শতকরা ৬২·৩ ভাগে পরিণত হয়; পক্ষান্তরে ঐ সময় ভারতে জার্মাণ মালের পরিমাণ শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধান্তে বৃটিশ মাল আমদানীর পরিমাণ আরও কমিয়া যায়; কিন্তু পরাজিত জার্মাণী বাণিজ্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান বাজার জাঁকিয়া বসিতে সুরু করে এবং ১৯২০ সালে ভারতে উভয় দেশের আমদানী মালের হার যথাক্রমে শতকরা ১২ ও ৯ ভাগ হয়। ইহার উপর ভারতীয় পুঁজিবাদ খানিকটা পরিপুষ্ট হওয়ায় এবং শ্রমশিল্পে নূতন প্রাণসঞ্চার হওয়ায় তাহারাও বাজারে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। কাজেই ইহার সামগ্রিক ফলাফল বৃটিশ বাণিজ্যস্বার্থের প্রতিকূল হইয়া পড়ে।

যে-ভারতীয় বাণিজ্য মুখ্যত আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল, তাহার মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় উহা পণ্যোৎপাদন ও শিল্পোন্নয়নের দিকে গতি নেয়। মূল প্রকৃতির এই পরিবর্তন সূচনায় বৃটিশ বণিকস্বার্থ যেমন নূতন প্রতিযোগীর সম্মুখীন হইয়া তাহাদের নানাভাবে দাবাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে থাকে তেমনি নবোদ্ভূত ভারতীয় পুঁজীবাদী ও শিল্পপতিরাও তাহাদের অগ্রগতির পথে বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা দেখিয়া বৃটিশ-বিরোধিতা ও স্বাজাত্যবোধের অনুকূল ক্ষেত্র হিসাবে

বৃটিশবিরোধী ভারতীয় জনসাধারণকে নিজেদের আকাঙ্খাপূরণের উপযুক্ত বাহন মনে করে। এই হেতু তাহারা নবজাগ্রত আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন যোগাইতে থাকে; অধিকন্তু তাহারা আন্দোলনে পরোক্ষ ও সম্ভবক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সাহায্য করিবার নীতি গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে এই সময় বৃটিশ মুদ্রার সহিত ভারতীয় টাকার দর বাঁধিয়া দেওয়ার ব্যাপারে ঘোর বিভ্রাটের সূচনা হয় এবং বৃটিশ বাণিজ্যের অনুকূলেই ভারতীয় টাকার মূল্য এক শিলিং চার পেন্স না হইয়া এক শিলিং ছয় পেন্স নির্ধারিত হয়; ইহার ফলে বৃটেনের নিকট ভারতের পাওনা বহু অর্থ নষ্ট হয় এবং ভারতীয় বাণিজ্যও ব্যাহত হয়। পক্ষান্তরে সরকারী শুল্কনীতিরও পরিবর্তন সূচিত হয়; বৃটিশ মাল আমদানীর ব্যাপারে কিছু সুবিধা দেওয়া হয় এবং ভারতে বৃটিশ-নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ও শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি করায় ভারতীয় পুঁজিবাদীদের মুনাফা হ্রাস পায়। কাজেই ভারতীয় মূলধনী ও শিল্পপতিরা বিশেষ বিক্ষুব্ধ হইয়া বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ায়।

পক্ষান্তরে যে-পটু ও অপটু মজুর শ্রেণীর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে ধনিক শ্রেণীর অপরিমেয় মুনাফা ও বিত্তলাভ হয়, তাহাদের অবস্থা কিন্তু আদৌ উন্নত হয় না; যুদ্ধকালীন অবস্থায় তাহারা যেমন পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ রোজগার করে, তেমনি মূল খাদ্যবস্তু ও নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের দাম তিন বা চতুর্গুণ বৃদ্ধিতে তাহারা সাধারণভাবে দিশেহারা হইয়া পড়ে; তাহাদের জীবনযাত্রার মান বাড়িলেও তাহারা দারিদ্র্যের কবল হইতে নিস্তার পায় না; বাসগৃহ, পরিধেয় ও খাদ্য বস্তুরও কোন উন্নতি হয় না। পরবর্তীকালে যুদ্ধান্তে উৎপাদন হ্রাস হওয়ায় তাহাদের মধ্যে বেকার সমস্যা দেখা দিতে থাকে এবং অনেকের আয় কমিয়া যাওয়ায় বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়।

১৯২০ সালে দেশে নানাস্থানে নৈসর্গিক দুর্বিপাকে অজন্মা হয় ও সাধারণভাবে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়া যায়। কাজেই কৃষকদের অবস্থাও খারাপ হইয়া পড়ে। যুদ্ধকালে কৃষিজাত মালের উৎপাদনের তুলনায় চাহিদাধিক্যে যে-পরিমাণে মালের যত দাম ছিল, তাহার সমপরিমাণ বস্তুর দাম তিনগুণ হ্রাস পায়; পক্ষান্তরে যুদ্ধে মূল্যাধিক্যের সুযোগলাভেও সাধারণ কৃষক বঞ্চিত হয়; জমিদার, মহাজন, মুনাফাখোর ও মধ্যসত্ব-ভোগীরাই তাহাদের অধিকাংশক্ষেত্রে শোষণ করে এবং মোটা টাকা তাহাদের পকেটে যায়। একমাত্র বড় জোতদার ছাড়া সাধারণ কিষাণের অদৃষ্ট পূর্বের ন্যায় এবং বহুক্ষেত্রে তাহার চেয়েও শোচনীয় হইয়া পড়ে; যুদ্ধান্তে অজন্মার সময়ও মহাজন, দালাল ও জমিদারদের সুদ ও আনুষঙ্গিক অত্যাচারে তাহারা অধিকতর নিঃস্ব হয়। কাজেই কিষাণ চাঞ্চল্য নানাক্ষেত্রে ব্যাপক আকারে দেখা দেয়।

১৯২০ সালে প্রথম বিশ্বব্যাপী অর্থসংকটের কৃষ্ণমেঘ ভারতের উপরও ছায়া বিস্তার করে। জনসাধারণের আয় হ্রাস পাওয়ায় পণ্যবস্তু ক্রয় তাহাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট সমরঋণ মিটাইবার ও আফগান যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য এবং সরকারী আয়ব্যয়ে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য শুল্কহার বৃদ্ধি করে; ইহার ফলে পণ্যবস্তুর দর বাড়ে। অধিকন্তু নানাস্থানে ইনফ্লুয়েঞ্জার মড়ক আরম্ভ হওয়ায় অসংখ্য লোক প্রাণ হারায়। কাজেই অসন্তোষে ও বিক্ষোভ সর্বব্যাপী হইতে থাকে এবং হিন্দু ও মুসলমান কিষাণদের অভাব অভিযোগ অভিব্যক্তির প থখোঁজে।

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা যুদ্ধের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে না উঠিতে নূতন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তাহাদের মধ্যে বৃত্তি, চাকরি বা শিক্ষা-জীবী মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সাফল্যের শিখরে পৌঁছিলেও অধিকাংশই সুযোগ-সুবিধা বা সামর্থের অভাবে জীবনে সাধারণ স্তরে থাকিয়া যাইতে বাধ্য

হয়। তবে যুদ্ধের সুযোগে যাহাদের স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জনের ক্ষেত্র প্রশস্ত হয় এবং বেকার সমস্যা ঘোচে, যুদ্ধান্তে তাহাদের মধ্যে অনেকের অদৃষ্টে নূতন করিয়া সমস্যা দেখা দেয়; সর্বব্যাপী তমসার মধ্যে যাহাদের পথ-প্রদর্শক হইবার যোগ্যতা ছিল, তাহারাও অন্ধকারে পথ হাতরাইতে থাকে। এমনকি কোন কোন বিষয়ে কিষাণ বা মজুরদের চেয়েও তাহারা অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত হয়। ভূমিহীন এবং প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনধারা হইতে বঞ্চিত এই শ্রেণীহীন মধ্যবিত্তগণ শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজেও অপরাগ, আবার কারিগরী বা শিল্পবিত্তায়ও অপারদর্শী; অথচ তাহারা কিষাণদের মত ভাগ্যের বিধানকে নতশিরে মানিয়া লইতে অভ্যস্ত বা শিক্ষাপ্রাপ্ত নহে; বরং আশাভঙ্গহেতু অনেকাংশে অর্ধশিক্ষিত বা মানসিক গড়নের দিক হইতে অসম্পূর্ণ হওয়ায় তাহারা পুরাতন বা নূতন জীবন-যাত্রা পদ্ধতির কোনটাই পুরাপুরি গ্রহণ বা বর্জন করিতে সমর্থ নয়; তাহারা সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতাও কিয়ৎপরিমাণে হারাইয়া ফেলে। মহাযুদ্ধের আবর্তে যে-ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হয়, তাহার মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা সত্তা অনেকেরই লোপ পায়। আন্তর্জাতিক ভাবসংঘাতে কেহবা বিহ্বল হয়, আবার নবোদ্ভূত সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত সুর ও সূত্রও অনেকের কাছে নিতান্তই অপরিচিত থাকিয়া যায়। কাহারও কাহারও মধ্যে প্রাচীন ভাবধারাকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া বর্তমানকে উপেক্ষা করিবার মত মনোভাবও যে গড়িয়া না উঠে এমন নহে। অধিকন্তু, দেশের বিরাট বেকারবাহিনীর সংখ্যা তাহারাও বৃদ্ধি করে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের প্রয়োজনে নিযুক্ত বেকার শ্রমিক ও কর্মীরা এবং যুদ্ধ-প্রত্যাগত সৈনিক দলভুক্ত লোকজনের কোনরূপ কর্মসংস্থান না হওয়ায় অসন্তোষ ব্যাপক হইতে থাকে এবং তথাকথিত সামরিক শ্রেণীর মধ্যে রংরুট সংগ্রহকালে যে-জবরদস্তী হয় তাহাতে এবং পরবর্তী

সময়ে যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যাধিক্য ও বিপ্লব দমনের নামে সরকারী দমন নীতির প্রকোপে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রবলতর হয়। যুদ্ধ-তহবিলে মোটা রকমের চাঁদা দিতে হওয়ায় জমিদার ও অর্থবান ব্যক্তিদের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষের ভাব ছিল; পরবর্তীকালে তাহাদের সেই বিক্ষোভও গণ-বিক্ষোভের সহিত যুক্ত হইল।

ঘরোয়া অভিযোগ ও দমনমূলক ব্যবস্থায় দেশবাসীর সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের সীমা যখন অতিক্রান্ত-প্রায়, তখন আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাত ভারতবর্ষের তটপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িতে থাকে; উহার সংঘাতে ও প্রভাবে তাহাদের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব দৃঢ়তর হয় এবং বৃটিশশাসিত ও নিয়ন্ত্রিত পরাধীন অন্যান্য দেশে আন্দোলনের সূচনা হওয়ায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দেশবাসী আশাশীল হইয়া উঠিতে থাকে। ইতিমধ্যে পরাজিত তুরস্কের প্রতি বৃটেনের অপমানকর আচরণে ও খিলাফৎ সমস্যায় উত্যক্ত ভারতীয় মুসলমানগণ ক্ষোভ ও রোষে অধীর হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতি ও সামরিক বলের নিকট হতমান প্রাচ্যশক্তি তুরস্কের প্রতি ভারতীয় হিন্দুরা স্বভাবতই সহানুভূতিসম্পন্ন হয়।

ইতিপূর্বে বঙ্গভঙ্গের সময় আদোয়ার রণক্ষেত্রে ইতালীর পরাজয় ঘটিলে এবং প্রাচ্যে জারশাসিত (ভ্লাডিভাস্টকে) রাশিয়া জাপানের হাতে প্রচণ্ড মার খাইলে প্রতীচ্য শক্তির দুর্ভেদ্যতার কাহিনী অলীক বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহার ফলে শ্বেতাঙ্গ-শাসিত দেশসমূহে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের আশা জাগ্রত হয়; বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরাও উহা হইতে যথেষ্ট শিক্ষা ও শক্তি লাভ করেন। পক্ষান্তরে এবার আয়র্লাণ্ডে সিনফিন এবং মিশরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংবাদ ভারতে পৌছিলে দেশবাসী নূতন আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

উহার কিছুকাল পূর্বে রাশিয়ায় অত্যাচারিত জনসাধারণ মহামতি লেনিনের

নেতৃত্বে কৃষিমজুর-রাজ অর্থাৎ সোভিয়েটতন্ত্র স্থাপন করে; উহা নিপীড়িত জগদ্বাসীর নিকট আশার আলোস্বরূপ হয়। পক্ষান্তরে জগলুল পাশার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ মিশরবাসীরা 'মিলনার মিশন' বর্জন করে এবং আয়র্ল্যাণ্ডে বৃটিশ কারাগারে আটক, দেশভক্ত বন্দী ম্যাকসুইনী ৭৫ দিন অনশনের পর ডিসেম্বরে প্রাণত্যাগ করেন। ভারতবাসী তাহাদের শৌর্যময় সংগ্রামে অভিনন্দন জানায়; তাহারা দৃঢ়প্রত্যয় হয় যে, জগতে বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামে তাহারা নিঃসঙ্গ নহে, তাহাদেরও দোসর আছে। কাজেই নিজেদের দাবীর যৌক্তিকতা ও অভিযোগের ন্যায্যতা সম্পর্কে তাহারা অধিকতর শক্তিলাভ করে ও নিঃসন্দেহ হয়।

এহেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় ভারতবাসী মহৎ প্রত্যাশা ও বৃহৎ উদ্বেগে অধীর হইয়া উঠে। কিন্তু সকল সম্ভাবনা সমূলে নাশ করিয়া ১৯১৯ সালের ১০ই মার্চ সরকারী ভোটাধিক্যে রাওলাট বিল আইনের মর্যাদা লাভ করে। অথচ বিপ্লব আন্দোলন এসময় কেন্দ্রভ্রষ্ট ও শক্তিহীন এবং পরিবর্তিত অবস্থায় বহু বিপ্লবী ভিন্ন পথান্বেষী হন। কাজেই জাগ্রত জনমতের প্রতি নিদারুণ উপেক্ষা প্রদর্শন করায় সরকারী অনাচারের প্রতিবাদে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না ও পণ্ডিত বিষ্ণু দত্ত শুক্ল সভ্যপদে ইস্তফা দেন।

রুদ্ধবাক্ ও অক্ষম দেশবাসীর তরফে এজাতীয় নৈতিক প্রতিবাদ নেহাৎ উপেক্ষণীয় নহে। তথাপি অপমানিত ভারতবাসী আর নির্জলা প্রতিবাদে তুষ্ট থাকিতে পারিতেছিল না। তাহারা ক্ষমতালাভের সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কর্মসূচীতে আস্থাশীল হইয়া পড়ে; কিন্তু কোন সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা উদ্ভাবিত না হওয়ায় জনসাধারণের সর্বস্তরে এক অধীর চাঞ্চল্য ব্যাপ্তিলাভ করে।

অথচ মহাযুদ্ধজয়ী ও আধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন ও নিরস্ত্র দেশবাসী সমতালে যুঝিতে অক্ষম। পক্ষান্তরে সশস্ত্র বিদ্রোহের কালও গত এবং বিপ্লব প্রচেষ্টাও অঙ্কুরে বিনষ্ট; কাজেই পথ কি? হাতিয়ার কোথায়?

এই যুগ-সন্ধিক্ষণে দিকভ্রান্ত ও নির্দেশ-প্রত্যাশী দেশবাসীর পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন দক্ষিণ আফ্রিকা-খ্যাত মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী। জাতীয় জীবনের অকূল পাথারে সুদক্ষ কাণ্ডারীর মত তিনি হাল ধরিয়া বসিলেন। চিন্তা, কর্ম ও কৌশলের নৈরাজ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়া তিনি দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ হইয়া শক্তি সংহত করিতে আহ্বান জানাইলেন। নিষ্ক্রিয় কংগ্রেসও অকস্মাৎ কর্মচঞ্চল হইয়া পড়িল এবং বিরাট ভূকম্পের মত দেশব্যাপী প্রবল আলোড়ন জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু গান্ধিজীর প্রত্যক্ষ সংগ্রামকৌশল ভারতে সম্পূর্ণ অভিনব; উহার প্রয়োগবিধি উদ্ভাবিত এবং ব্যাপকভাবে পরীক্ষিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। ইহা সত্ত্বেও তিনি উহাকেই ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে বৃহত্তর পটভূমিকায় প্রয়োগে সাহসী হইলেন। অবশ্য ইতিপূর্বে চম্পারণ ও খেড়ায় এবং আমেদাবাদ মিলধর্মঘটে তিনি নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সীমাবদ্ধ আকারে যে-সাফল্যলাভ করেন, তাহাই তাঁহাকে এই দুরূহ কর্মে প্রবৃত্ত হইতে প্রেরণা যোগায়। দেশবাসীও শক্তিশালী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটা হাতিয়ার পাইয়া আশ্বস্ত হয়। এইহেতু তিনি যখন সংগ্রামের ডাক দিলেন তখন তাঁহার রফাপন্থী মনোভাব এবং সৈন্য সংগ্রহে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা সত্ত্বেও এক নরমপন্থী ছাড়া বিপ্লবী তরুণ সম্প্রদায়, আপোষ-বিরোধী জাতীয় দল, বিক্ষুব্ধ মুসলমান সমাজ এবং সংগ্রামমুখী জনতা তাহাতে সাড়া দেয়। এই ব্যাপারে সকলেই যে তাঁহার মতবাদে বিশ্বাসী হইলেন এমন নহে; তাঁহারা উহাকে নীতি হিসাবে না মানিয়া কৌশল হিসাবে গ্রহণ করিলেন।

কংগ্রেস বিভিন্ন মতবাদ ও বৃটিশ-বিরোধী শক্তিনিচয়ের মিলনভূমিতে পরিণত হইল।

এইভাবে সাম্রাজ্যের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হইতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণশক্তির পীঠস্থলরূপে কংগ্রেসের আমূল রূপান্তর ঘটে। কংগ্রেস এই সর্বপ্রথম-বার দেশবাসীর অন্তর জয় করিয়া সর্বসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় হইয়া উঠেন।

রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে গান্ধিজী ভারতবাসীর ক্ষুব্ধ মনোভাবের প্রতিধ্বনি করিয়া ঘোষণা করেন, "এই আইন ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার ও মানুষের জন্মগত স্বাভাবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী; অতএব যেপর্যন্তনা এই অসঙ্গত ও অপমানকর আইন প্রত্যাহৃত হইবে সেপর্যন্ত আমরা একযোগে তাহা মানিয়া নিতে অস্বীকার করিব; নিরুপদ্রব প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া উহাকে আমরা বাধা দিব।"

তিনি মাদ্রাজ হইতে জানাইয়া দিলেন যে ৩০শে মার্চ (১৯২০ সাল) হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি বোম্বাই-এ সত্যাগ্রহ সভা গঠন করেন; তাহা ছাড়া তিনি আন্দোলন আরম্ভের তারিখ পরিবর্তন করিয়া ৬ই এপ্রিল দিন স্থির করেন। ঐদিন আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে ২৪ ঘণ্টাকাল উপবাস, সমস্ত স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ ও ও জনসভায় রাওলাট আইন প্রত্যাহারের প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য তিনি নির্দেশ দেন।

এজাতীয় কার্যক্রমের সহিত দেশবাসী পরিচিত ছিল না; সত্য ও অহিংসামূলক আত্মিক সংগ্রামের কৌশলও তাহাদের নিকট কৌতূহলের বিষয়ীভূত: ইহা সত্ত্বেও কতকটা পরীক্ষামূলক মনোভাব লইয়া দেশবাসী তাঁহার নির্দেশ শিরোধার্য করে; অসংখ্য ভারতবাসী এই মর্মে প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করে যে, "আমরা এই সংগ্রামে সত্যের অনুসরণ

করিয়া চলিব এবং ধনজন ও সম্পত্তি সম্পর্কিত সর্বপ্রকার হিংসামূলক কার্য হইতে বিরত থাকিব।" ইহাই সত্যাগ্রহের সূচনা।

## জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড

গান্ধিজীর নূতন নির্দেশের বিষয় দেশের কোন কোন স্থানে সময়মত বিজ্ঞাপিত না হওয়ায় দিল্লী ও পাঞ্জাবের কয়েকস্থানে পূর্বনির্দিষ্ট ৩০শে মার্চ হরতাল পালিত হয়। কিন্তু নবদীক্ষিত সত্যাগ্রহে অপটুত্ব হেতু দিল্লীর রেলস্টেশনে জনকয়েক আন্দোলনকারী ও দোকানদারের মধ্যে বচসা হয়; তাহার ফলে যে-হাঙ্গামা ঘটে তাহাতে সৈন্যদল জনতার উপর গুলি চালায়। উহাতে জনতা অশান্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বহু কষ্টে তাহাদের শান্ত করেন এবং সকলের অনুরোধে তিনি হিন্দুমুসলমান ঐক্য ও সত্যাগ্রহ সম্পর্কে দিল্লীর জুমা মসজিদে বক্তৃতা পর্যন্ত করেন। সরকারী জুলুমে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়তর হয়।

পুলিশনিগ্রহে পীড়িত দিল্লীবাসীদের বিপদে সহানুভূতি জ্ঞাপন কল্পে গান্ধিজী ৮ই এপ্রিল দিল্লী রওনা হন; কিন্তু তাঁহার দিল্লী ও পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়; তিনি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া অগ্রসর হইলে পুলিশ পাহারায় স্পেশাল ট্রেনযোগে বোম্বাই লইয়া গিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

পূর্ব হইতেই সারা দেশ বারুদাগারে পরিণত হইয়াছিল; গান্ধিজীর গ্রেপ্তার সংবাদে তাহাতে যেন অগ্নিশলাকা নিক্ষিপ্ত হইল। এই ব্যাপারে রংরুট সংগ্রহের জুলুমে ক্রুদ্ধ পাঞ্জাবীদের বিক্ষোভে সর্বাপেক্ষা মাত্রাধিক্য প্রকাশ পায়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উহার বিরুদ্ধে যে-পাল্টা প্রতিশোধ নেয় তাহা অভাবনীয় ও ভয়ঙ্কর। ওডায়ার-চালিত পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট বিক্ষোভ প্রকাশের

উৎস মুখ চাপিয়া দিবার জন্য বিবিধ আয়োজন করে। তদুপরি ১০ই এপ্রিল অমৃতসরের বরেণ্য নেতৃদ্বয় ডাঃ কিচলু ও ডাঃ সত্য পালকে দেশান্তরিত করার উদ্দেশ্যে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহার ফলে স্বভাবত উত্তেজিত জনসাধারণ অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠে; এবং নেতৃদ্বয়ের মুক্তির দাবী করিবার জন্য যখন জনতা দলবদ্ধ ভাবে ডেপুটী কমিশনারের বাংলোর দিকে রওনা হয় তখন তাহাদের স্পর্ধা দাবাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ দুইবার গুলি ছোড়ে। উহার ফলে ২০ জন নিহত ও ১৫।২০ জন আহত হয়। এই ঘটনার পর শান্ত জনতা উত্তেজিত হইয়া কয়েকটি অফিসআদালত পোড়াইয়া দেয় এবং ব্যাঙ্ক লুট করে। ইহা ছাড়া তিন জন শ্বেতাঙ্গ এবং কেল্লার নিকট একজন শ্বেতাঙ্গ নিহত এবং মিস সেরউড নাম্নী জনৈকা শ্বেতাঙ্গ মহিলা লাঞ্ছিত হয়।

ইহা সত্ত্বেও সহরে শান্তি স্থাপিত হয়; তথাপি কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জেঃ ডায়ার ১১ই এপ্রিল অমৃতসরের শাসনভার গ্রহণ করিয়া পরদিন সভাসমিতি বন্ধের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। কিন্তু ১৩ই এপ্রিল বৈকালে নেতৃদ্বয়ের মুক্তির জন্য লালা কানাইয়ালালের সভাপতিত্বে জালিয়ানওয়ালাবাগে জনসভা হইবে বলিয়া প্রচার করা হয়। পরে প্রকাশ পায়, হংসরাজ নামক জনৈক গুপ্তচর পুলিশের সহিত যোগসাজসে উক্ত সভা ডাকে।

মজা এই, জেঃ ডায়ার সভা বন্ধের কোন ব্যবস্থাই করে না; বরং সভানুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যথারীতি বাগের নিকটবর্তী স্থানে ওৎ পাতিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে এবং তাহার মেসিনগানগুলি পূর্ব হইতে বাগের প্রধান প্রবেশমুখে স্থাপন করা হয়।

১৩ই এপ্রিল বৈশাখী পূর্ণিমা দিবস; দূর গ্রামগ্রামান্তর হইতে আগত আনুমানিক দশ হাজার অসন্দিগ্ধ নিরপরাধ লোক সভাস্থলে জমায়েত হয়। কিন্তু কালবিলম্ব না করিয়া সৈন্য সহ ডায়ার রক্তপিপাসু বাঘের

মত নরনারীশিশু নির্বিশেষে সকলের উপর দশ মিনিটকাল মোট ১৬ শত গুলি নিঃশেষে চালায়।

প্রাণভয়ে পলায়িত ও চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত জনতা যেখানে বেশী ভিড় করে, সেদিকে তাক করিয়াই গুলি ছোড়ার আদেশ দেওয়া হইতে থাকে।

বাগের একটিমাত্র প্রবেশ ও নির্গমন পথ প্রশস্ত; কাজেই জনতার মধ্যে কেহবা প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া রক্ষা পায়, আবার অনেকে মাটিতে শুইয়া পড়ে, কেহ কেহ আগমনির্গম পথে জড়াজড়ি করিতে থাকে। ইহার ফলে দুর্বল ব্যক্তিরা সাধারণত পদপিষ্ট হইয়া মরে এবং অপেক্ষাকৃত সবল ব্যক্তিদের অনেকে গোলাবৃষ্টিতে প্রাণ হারায়। তবে বাগের চতুষ্পার্শ্বে বড় বড় বাড়ী থাকায় অসহায় লোকজনের অধিকাংশ সেনাদলের কৃপায় উপর একান্ত নির্ভরশীল হইয়া পড়ে।

গুলিবর্ষণ শেষ হইবার সঙ্গে ডায়ার সেনা সহ বীরদর্পে ছাউনীতে চলিয়া যায়। হতাহত ব্যক্তিদের খোঁজ লওয়াও উক্ত নরাকার পশু প্রয়োজন মনে করে না।

গুলিতে যাহারা নিহত হয় সরকারী মতে তাহাদের সংখ্যা ৩৭৯ জন এবং আহতদের সংখ্যা দেড় হাজার এবং বেসরকারী মতে আনুমানিক এক হাজার লোক নিহত হয়।

ইহাতেও ডায়ারের পৈশাচিকবৃত্তি চরিতার্থ হয় না। লেডি ডাক্তার মিস সেরউড যে-রাস্তায় লাঞ্ছিত হয়, সেরাস্তায় চলাচলকারীদের হামাগুড়ি দিয়া যাইতে বাধ্য করা হয়। কয়েকদিন সমানে বহু লোককে এই অপমান সহ্য করিতে হয়। এমনকি সৈন্যরা সেরউড ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট সন্দেহে ধৃত কয়েক ব্যক্তিকে বিচারের পূর্বেই অকুস্থলে নিয়া প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করে; তাহাদের পরে বিচার হয়।

এই সম্পর্কে বেসরকারী তদন্ত কমিটির নিকট সাক্ষ্যদানকালে শ্রীসন্তরান বলেন—

"আমি রেলে চাকরি করি। এপ্রিল মাসের শেষে বাড়ী যাইবার সময় শুনি যে সেরউডের মামলা সম্পর্কে আমার ছেলে মঙ্গৎরামকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহার ৮ দিন পর মঙ্গৎরাম ও অপর কয়েকটি বালককে টিকটিকিতে বাঁধিয়া বেত মারা হয়। আমার ছেলে বহুবার অজ্ঞান হইয়া পড়ে; জ্ঞান হইবামাত্র পুনরায় তাহাকে বেত্রাঘাত করা হয়।"

শ্রীমতী ঈশ্বর কুমারী বলেন,—"আমাদের বাড়ীর নিকট প্রথমে একটি শিখ বালককে বেত মারা হয়। তাহার পরিধানে কাপড় ছিল; পরে তাহাকে উলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাত করা হয়। সৈন্যরা সকল বালককেই উলঙ্গ করিয়া বেত মারে। তৃতীয় বালকটি তিনবার অজ্ঞান হয়। প্রত্যেক-বার তাহাকে তুলিয়া রাস্তার উপর শোয়ান হয় এবং তাহার গলায় খানিকটা জল ঢালা হয়। পরে জ্ঞান হইলে সৈন্যরা আবার তাহাকে বেত মারে।"

এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই, অমৃতসরে জঙ্গী আদালতে গুরুতর অপরাধের দায়ে ২৯৮ জন অভিযুক্ত হয়; তন্মধ্যে ৫১ জন প্রাণদণ্ডে, ৪৬ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে, ২ জন দশ বৎসর, ৭৯ জন ৭ বৎসর, ১০ জন ৫ বৎসর এবং ১৩ জন তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

শুধু অমৃতসরেই নহে,—লাহোর, গুজরানওয়ালা, কাসুর ও পাঞ্জাবের অন্যান্য কয়েক স্থানেও দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটে; এইহেতু গবর্ণমেণ্ট সামরিক আইন জারী করিয়া অমানুষিক অত্যাচার করিবার অজুহাত পায়। তাহারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে, পাঞ্জাবে সাধারণের গমনাগমন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত এবং দীর্ঘকাল সামরিক আইনের নাগপাশে সমুদয় প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ করিবার চেষ্টা করে। ভারতবর্ষ হইতে সমগ্র পাঞ্জাবকে কার্যত বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হয়। লালা হরকিষণ লাল ও রামভুজ দত্ত চৌধুরীর

মত প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও পাঞ্জাব হইতে নির্বাসিত এবং লালাজীর ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। এমনকি ঘটনা অনুষ্ঠানের পরও এক বৎসরকাল সমুদয় বিষয় জগদ্বাসী জানিতে পারে নাই।

## ডায়ারের অমানুষিক নৃশংসতা

হাণ্টার কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে ডায়ার যেসব নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি করে তাহা পৈশাচিকতায় অতুলনীয়, যথা :—

প্রঃ—আপনার সেনাগণ জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে, একথা আপনার মনে হয় নাই? উঃ—না, আমি স্থির করিয়াছিলাম, সভা চালান হইলে জমায়েত সকলকে নিঃশেষে মারা হইবে। প্রঃ—যেদিকে বেশি ভিড় ছিল, সেদিকেই গুলি চালাইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন? উঃ—হাঁ, তাই। প্রঃ—সাঁজোয়া গাড়ীগুলি বাগে লইয়া যাইবার উপযুক্ত পথ থাকিলে মেসিনগান দিয়াই গুলি করিতেন? উঃ—সম্ভবত তাহাই করিতাম।

প্রঃ—কতকলোক আত্মরক্ষার জন্য শুইয়া পড়িয়াছিল, ইহা কি আপনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন? উঃ—হাঁ। প্রঃ—আপনার সেনারা উহাদের উপরও গুলি চালায়? উঃ—যাহারা মাটির উপর শায়িত ছিল, অন্য ভাল লক্ষ্য থাকিলেও তাহাদের উপর তাক করিয়া গুলি করা হয়। প্রঃ—সমবেত লোকজনকে বাগ ছাড়িয়া যাইতে বলিলে বাগ ছাড়িত না, একথা মনে করার হেতু আছে কি? উঃ—হাঁ, তাহা হয়ত হইত; গুলিবর্ষণ না করিয়াও আমি হয়ত তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিতে পারিতাম। প্রঃ—তবে কেন তাহা করেন নাই? উঃ—কিছুকাল তাহাদের সরাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া হাসিত; উহাতে আমি বোকা বনিতাম।

প্রঃ—গুলিচালনার পর আহতদের শুশ্রূষার জন্য কোন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কি? উঃ—না; নিশ্চয়ই নয়। তাহা আমার কাজ নয়। হাসপাতাল খোলা ছিল, ডাক্তাররাও ছিল। আহতেরা সাহায্য চাহিলেই পাইত। প্রঃ—৫ হাজার বা ততোধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেকে আপনার ঘোষণার কথা জানিত না; ইহা কি আপনার জানা ছিল? উঃ—হয়ত অনেকে আমার ঘোষণার কথা জানিত না। প্রঃ—ইহা জানিয়াও কি আপনার মনে হয় নাই যে, গুলিচালনার পূর্বে জনতাকে স্থানান্তর যাইতে বলা উচিত? উঃ—না, তাহা আমার মনে হয় নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই, জঙ্গী আইন অগ্রাহ্য হইয়াছে; কাজেই বন্দুক হইতে গুলি ছোড়াই তৎক্ষণাৎ কর্তব্য মনে করি।

## বেসরকারী তদন্ত কমিটির নিকট সাক্ষ্য

লালা গিরিধারীলাল বাগের নিকটস্থ লালা ধোলনদাসের বাড়ীর ছাদ হইতে হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলেন,—

"দেখিলাম, গুর্খারা (মনে হইল ৪০।৫০) মহারাণীর মর্মর মূর্তির দিকে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া দৌড়াইয়া গেল। তাহারা দুই কাতারে বাগের ভিতরকার উঁচু জমিটির উপর দাঁড়ায়। তাহাদের তৎক্ষণাৎ গুলি চালাইতে আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু জনতাকে কোনরূপ সতর্ক করা হয় না। বাগে ১২ হইতে ১৫ হাজার লোককে সমবেত হইতে দেখিয়াছিলাম। সৈন্যরা দশ পনের মিনিট গুলি ছোড়ে, ফলে শত শত লোক নিহত অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হয়। উহাদের মধ্যে অনেক গ্রামবাসী ছিল; তাহারা বৈশাখী মেলা দেখিবার জন্য অমৃতসরে আসিয়াছিল। সবচেয়ে বীভৎস ব্যাপার এই, লোকজন বাগের দ্বারগুলি দিয়া পলাইতে চেষ্টা করিলে উহাদের দিকে

তাক করিয়া গুলি করা হইতে থাকে। বাগে মোট ৪।৫টি ছোট দরজা। ঐগুলির উপর বারিধারার মত গুলিবৃষ্টি করা হয়। সৈন্যরা সব চেয়ে ঘনসন্নিবিষ্ট জনতার মধ্যে অধিক গুলি ছোড়ে। ইহার ফলে বাগের প্রত্যেক স্থানে লোক মরে; প্রাণভয়ে পলায়মান জনতার পদতলে পিষ্ট হইয়াও অনেকে প্রাণ হারায়। যাহারা প্রাণ বাঁচাইবার জন্য উবু হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, গুর্খারা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাদের উপরও গুলি করে। গুলিবর্ষণ বন্ধ হইবার পর সেনাদল সহ সেনানীরা চলিয়া গেল; কিন্তু হতাহতদের সম্পর্কে কোনই ব্যবস্থা করা হইল না।

বহু লোক লালা ধোলনদাসের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। অমি আহতদের যথাসম্ভব শুশ্রূষা করি। এই সময় আমার জনৈক বন্ধুর [ হাকিম সিংহ ] জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিয়া খবর দেয় যে, তাহার পিতা তখনও প্রত্যাবর্তন করে নাই। আমি উদ্বিগ্ন হইয়া বন্ধুর খোঁজে জালিয়ানওয়ালাবাগে যাই। মড়ার উপর মড়া; স্থানেস্থানে গাদা হইয়া পড়িয়া ছিল; লোকজন নিজেদের বন্ধুবান্ধবের খোঁজে সেইগুলি ঘাটিয়া দেখিতেছিল। শবগুলির কাহারও মাথা ফাটা, কাহারও চক্ষুতে গুলিবিদ্ধ, কাহারও বা মস্তক, বক্ষ বা পদ ছিন্ন। দেখিলাম, কয়েকটি মহিষও গুলিতে নিহত হইয়া পড়িয়া আছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। মৃতের সংখ্যা হাজারের উপর হইবে।"

লালা গুরুদত্ত সিংহ তদন্ত কমিটির নিকট বলেন:—"গুলি এড়াইবার জন্য আমি শুইয়া পড়িয়াছিলাম। কয়েকটি গুলি আমার শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গেল। তারপর দেখি, সৈন্যরা হাঁটু গাড়িয়া শায়িতদের উপরও গুলি ছুড়িতেছে। একবার আমার পায়ে ও অন্যবার আমার গোড়ালীতে গুলি লাগে। আমার নিকট একটি ১২ বৎসরের বালক ৩ বৎসরের একটি শিশুকে জড়াইয়া ধরিয়া মহানিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছিল। আমার প্রতিবেশী ১২ বৎসরের একটি ব্রাহ্মণ বালকও নিস্তার পায় নাই।"

মহম্মদ ইসমাইল বলেন—"বাগের বিপরীত দিকে আমার দোকান। গুর্খারা চলিয়া যাইবার পর আমার মামাতো ভাইয়ের খোঁজে বাগে গিয়াছিলাম। অন্ততঃ ১৫ শত লোক নিহতাবস্থায় পড়িয়াছিল। কতকগুলি শিশু নিহত হইয়াছে দেখিলাম। কাহের দীন তেলী ৬।৭ মাসের শিশুকে কোলে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। উহারা উভয়েই নিহত হয়। বাগে ১৬ হইতে ২০ হাজার লোক জমায়েৎ হইয়াছিল। উহার মধ্যে ৪।৫ শতই শিশু।"

রতনদেবী বলেন ঃ—

"জালিয়ানওয়ালার নিকটেই আমার বাড়ী। আমার স্বামীর খোঁজে আমি কাঁদিতে কাঁদিতে আর ২জন মহিলা সহ বাগে গেলাম। মড়ার উপর মড়ার গাদা; আমি সেগুলির মধ্যে স্বামীর সন্ধান করিতে লাগিলাম। কয়েকটি মড়ার গাদা পার হইয়া আমি স্বামীর শবের সন্ধান পাই। ঐস্থানে যাইবার পথ রক্তপ্লাবিত ও শবপূর্ণ ছিল। * * রাত্রি ৮টা বাজিয়া গেল ——— সান্ধ্য আইনের মেয়াদ আরম্ভ। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা সত্ত্বেও চারপায়া আনার জন্য যাহারা গিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসিল না। এইহেতু অন্যের সাহায্য লাভের আশায় আবলোয়া কাটারার দিকে যাত্রা করি। কিন্তু কাহারও সাহায্য না পাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। বাগে ফিরিয়া স্বামীর শব আগুলিয়া বসিয়া থাকি; দৈবক্রমে একখানা বাঁশের লাঠি পাওয়া যায়; তাহা দিয়া আমি কুকুর তাড়াইতেছিলাম। একটি বার বৎসরের ছেলে তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছিল; কিন্তু তাহাকে জল দেওয়া গেল না। রাত্রি দুইটার সময় সুলতান গ্রামের জনৈক জাঠ তাহার পা দুইটি তুলিয়া দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে। তাহার পা দেওয়ালে আটকাইয়া গিয়াছিল। আমি তাহার রক্তসিক্ত কাপড় টানাটানি করিয়া পা

ছাড়াইয়া দিলাম। ভোর ৬টায় লালা সুন্দর দাস ও তাঁহার পুত্রদ্বয় ও আমার কয়েকজন প্রতিবেশী চারপায়া সহ উপস্থিত হন ; তাঁহাদের সাহায্যে আমি আমার পতির শব গৃহে আনয়ন করি। আমি সমস্ত রাত্রি বাগে কাটাই ;, তখনকার মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, গাদাগাদা মড়া পড়িয়াছিল, কেহ চিৎ, কেহ উবু। কতকগুলি নির্দোষ শিশুও নিহত অবস্থায় পতিত ছিল। সে দৃশ্য জীবনে ভুলিবার নহে।"

পাঞ্জাব মহাযুদ্ধে ধনজন দিয়া সাধ্যাতিরিক্ত সাহায্য করে বটে, কিন্তু যুদ্ধারম্ভে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ অ্যাসকুইথ ও শেষদিকে মিঃ লয়েড জর্জের প্রতিশ্রুতি এবং ভারতসচিব মণ্টেগুর ঘোষণা অনুযায়ী আশ্বাস পূরণের দাবী জানাইবে, ইহা বিপন্মুক্ত শাসকদের পক্ষে অসহ্য। তাহারা পাঞ্জাবকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা দাবাইয়া দিতে সংকল্প করে এবং পাঞ্জাবকে দৃষ্টান্ত হিসাবে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিবে বলিয়া চূড়ান্তধরণের দমন-নীতি অবলম্বন করে। এই উপলক্ষে বিগত শতকের জীর্ণ আইন পর্যন্ত পুনরায় বলবৎ করা হয়। পাঞ্জাবের লাট ও'ডায়ার বড়লাট চেম্‌সফোর্ডের অনুমতিক্রমে ১৮০৪ সালে প্রযুক্ত এক ঘুণধরা আইন বলে লাহোর ও অমৃতসরে ১৫ই এপ্রিল এবং গুজরানওয়ালা ও অপর কয়েকটি জেলায় ১৬ই, ১৯শে ও ২৪শে এপ্রিল জঙ্গী আইন জারীর আদেশ দেয়।

ইতিমধ্যে তৃতীয় আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় পাঞ্জাবের অবস্থা অধিকতর ঘোরাল ও শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই সম্পর্কে ৪ঠা মে পাঞ্জাবে সর্বপ্রথম সেনা সমাবেশ করা উপলক্ষে সামরিক আইনের মেয়াদ ১১ই জুন পর্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার পরবর্তী ২৫শে আগস্ট পর্যন্ত একমাত্র রেলওয়ের চৌহদ্দি ছাড়া সামরিক আইন বিভিন্ন অঞ্চলে কমবেশিব হাল থাকে। এই দমন নীতির প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ সরকার-দত্ত সর্বোচ্চ রাজসম্মান 'নাইট' উপাধি বর্জন করিয়া বিপন্ন দেশবাসীর পাশে আসিয়া

দাঁড়ান এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের একমাত্র ভারতীয় সদস্য স্যর শঙ্করণ নায়ার পর্যন্ত মিলিটারী জবরদস্তী বরদাস্ত করিতে না পারায় পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার ফলে সর্বস্তরের ভারতবাসীর মধ্যে বৃটিশ শাসনের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ সংক্রামিত হইয়া পড়ে।

পাঞ্জাবের সামরিক শাসনকালে প্রদেশ হইতে গমনাগমন নিয়ন্ত্রিত ত হয়ই, পণ্ডিত মালবীয় ও মিঃ এণ্ড্রুজ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত পাঞ্জাব প্রবেশে ব্যর্থকাম হন; মিঃ এণ্ড্রুজ পাঞ্জাব প্রবেশের চেষ্টা করিলে গ্রেপ্তার হন।

প্রায় বৎসরাধিক কাল পর এই জঘন্য অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ পাইলে বিশ্বাবাসী ঘৃণা ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে; বৃটিশ সমদর্শিতা ও সুশাসনের প্রতি ভারতবাসীর সামান্যতম শুভেচ্ছার ভাবও উহার ফলে চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়।

এস্থলে অনুষ্ঠিত অমানুষিক অনাচারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য যথা ঃ—অমৃতসরে মিস সেরউড যেরাস্তায় লাঞ্ছিত হয়, ডায়ার কর্তৃক তথায় চলাচলকারীদের বুকে হাটান, জেঃ ক্যাম্বেল কর্তৃক পাইকারী সেলামের আদেশ, কর্ণেল জনসন কর্তৃক ছেলেদের নূতন নামডাক প্রবর্তন, অমৃতসরে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ, ভারতীয়দের সাইকেল ও গাড়ীচড়া নিষিদ্ধ, কেল্লার নিকট প্রকাশ্য বেত্রাঘাতের জন্য মঞ্চ নির্মাণ এবং বালকবালিকা নির্বিশেষে সকলকে নগ্নগাত্রে বেত্রাঘাত, আর্ত ও অনশন-গ্রস্তের সেবায় নিযুক্ত লঙ্গরখানা বন্ধ, মহিলাদের উপর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের অপমানকর ব্যবহার, ছাত্র ও শিক্ষকগণকে নির্বিচারে কারাগারে প্রেরণ, পাঁচ হইতে সাত বছরের ছেলেদের দিয়া বৃটিশ পতাকা অভিবাদন করান, হাতে শিকল ও কোমরে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়া করাইয়া রাখা, বন্দীদের খোঁয়াড়ে আবদ্ধ রাখা এবং সর্বোপরি নিরীহ

জনতার উপর বিমান হইতে বোমা ও মেসিনগানের গোলা বর্ষণ প্রভৃতি। জনসাধারণকে হতমান ও ভীতিগ্রস্ত করার জন্যই এই ব্যবস্থা হয়। সিপাহী অভ্যুত্থানের পর এজাতীয় বর্বরতা ও নৃশংসতা আর দেখা যায় নাই।

জালিয়ানওয়ালাবাগের স্বেচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডে ইহাই বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, বিদেশী রাজশক্তির স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ চলিবে না। বস্তুত জেঃ ডায়ারও সদম্ভে নিজমুখে ঘোষণা করে যে, ভারতবাসীর মনে উক্তরূপ ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই ঐ হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা দমনের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অনাচারই পরবর্তীকালে ভারতব্যাপী আন্দোলনের উপলক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। এই হেতু ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীকে লক্ষ্য করিয়া গান্ধিজী বলেন—

"৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল ভারতের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল সমগ্র জাতির মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত বিপুল জাগরণ আসে। ১৩ই এপ্রিল জাতিকে আত্মবলি দিতে হয়; তাহাতে হিন্দু, মুসলমান ও শিখের সম্মিলিত রক্তধারা এক খাতে প্রবাহিত হয়। মহামৃত্যুর মধ্যেই তাহারা ঐক্য লাভ করিয়া গিয়াছে।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২রা এপ্রিল, ১৯২৫)

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, পুলিশ দিল্লীর পথে গান্ধিজীকে গ্রেপ্তার করে ও বোম্বাই আনিয়া মুক্তি দেয়। কিন্তু তাহার গ্রেপ্তার সংবাদে জনসাধারণের মধ্যে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ দেশের বিভিন্ন স্থানে গবর্ণমেণ্ট-বিরোধী দাঙ্গায় পরিণতি লাভ করে। উত্তেজিত জনতা আমেদাবাদে কয়েকজন ইংরেজ ও ভারতীয় সরকারী কর্মচারীকে খুন করে; ১২ই এপ্রিল বিরামগ্রাম ও নদীয়াতে হাঙ্গামা দেখা দেয়; কলিকাতায় পুলিশের গুলিতে ৫।৬ জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়।

দেশব্যাপী বিক্ষোভের যে এজাতীয় পরিণতি ঘটিবে, গান্ধিজী তাহা স্বপ্নেও আশা করেন নাই; তিনি ভাবিয়াছিলেন, প্রবল উত্তেজনার মুখেও জনসাধারণ শান্ত থাকিয়া প্রয়োজন হইলে চরম আত্মদানে প্রস্তুত থাকিবে,—মৃত্যুর মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। এই নির্ভয় আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়াই প্রতিপক্ষের অন্তর জয় করা হইবে। বস্তুত তাঁহার অনুসৃত নিরুপদ্রব প্রতিরোধের শিক্ষাও তাহাই; উহাই তিনি চম্পারণ, খেড়া ও আমেদাবাদে সাধারণকে শিক্ষা দেন। অথচ বৃহত্তরক্ষেত্রে উক্ত নীতির প্রথম প্রয়োগ কালে জনতার বিপথগামিতায়, অহিংস বিধির বিপরীত আচরণে তিনি বিক্ষুব্ধ হইয়া বিব্রত বোধ করেন। তবে তিনি মনে করেন যে, 'অসদভিপ্রায়ী যে-সব লোক প্রকৃত প্রতিরোধকারী নহে, তাহারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া থাকে।' এইহেতু তিনি স্বয়ং আমেদাবাদে গিয়া পুনরায় শান্তি ফিরাইয়া আনিতে সহায়তা করেন। পক্ষান্তরে দেশবাসীর অধীর উত্তেজনা, তীব্র বৃটিশ-বিরোধিতা এবং অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত পরিণামে তিনি চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং অবস্থা তাঁহার আয়ত্ত-বহির্ভূত হইতে পারে বলিয়া শঙ্কা বোধ করেন। এইহেতু তিনি সমগ্র দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃসংস্থাপনে সহায়ক হইবার মানসে সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন।

ইহাতে দেশবাসী জনসাধারণ বিরক্তি ও উষ্মা প্রকাশও যে না করে এমন নহে; আন্দোলন আরম্ভের মুখে স্বয়ং প্রবর্তক কর্তৃক আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেওয়ায় দেশব্যাপী উৎসাহ ও উত্তেজনায় ভাটা পড়ে। কিন্তু বহিঃপ্রকাশের উৎস-মুখে চাপা পড়ায় সাধারণের অবরুদ্ধ বেদনা ও 'বক্ষোভবহ্নি ক্রমশ ধূমায়িত হইতে থাকে এবং তাহাই পাঞ্জাবের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ভিন্ন পথে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে; পাঞ্জাবের অপমান ও অনাচার সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করে। নূতন আত্মসম্মানবোধে

উদ্বুদ্ধ জাতি সমগ্র ব্যাপারে তদন্তের জন্য রয়াল কমিশন নিয়োগের দাবী করিতে থাকে; ভারত গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে জড়িত থাকায় তাহাদের নিযুক্ত তদন্ত কমিশনের ব্যবস্থা জনসাধারণের নিকট অনভিপ্রেত বলিয়া গণ্য হয়।

পাঞ্জাবের অত্যাচার কাহিনী ভারতের সীমানা ছাড়াইয়া সমুদ্রপারবর্তী দেশেও পৌছে; কাজেই বিশ্ববাসীর নিকট মুখ-রক্ষার উদ্দেশ্যে বড়লাট অবশেষে লর্ড হাণ্টারের সভাপতিত্বে সেপ্টেম্বর মাসে একটী তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে। কিন্তু কমিশনের সমগ্র কার্যকলাপ প্রভাবিত ও ব্যর্থ করার জন্যই যেন আবার সরকার ১৮ই সেপ্টেম্বর কসুর মাপ আইন (Indemnity Act) প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভোটাধিক্যে পাশ করাইয়া নেয়। অত্যাচারের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের যাহাতে কোনরূপ মামলায় জড়ান না যায় এবং তাহাদের নিকট ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি আদায় সম্ভব না হয়, তদুদ্দেশ্যে প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও উক্ত আইন রচিত হয়। এক হাতে দান করিয়া অন্য হাতে কাড়িয়া লইবার এই জঘন্য ব্যবস্থায় তদন্ত কমিটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কাহারও মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না।

ইহা সত্ত্বেও কংগ্রেসের তরফ হইতে তদন্ত কমিটির সহিত সহযোগিতা করা হয় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তদন্ত কালে উহার বৈঠকে প্রথমদিকে উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু তদন্তে সুবিধার্থ কয়েকজন সামরিক আইনে বন্দীকে কমিশনের নিকট উপস্থিত করার প্রস্তাব করা হইলে তাহা অগ্রাহ্য হয়। এই অনুচিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ভারত সচিবের নিকট আপীল করিয়াও কোন ফল হয় না। এইহেতু হাণ্টার কমিটির নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কংগ্রেসের সন্দেহ জন্মে এবং উক্ত কমিটি নামমাত্র তদন্ত করিয়া সরকারী দোষস্খালনের চেষ্টা করিবে বলিয়া মনে হয়।

এরূপ অবস্থায় কংগ্রেস সাধারণের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটী বেসরকারী তদন্ত কমিটী গঠন করেন; এম কে গান্ধী, সি আর দাশ, এম আর জয়াকর, ফজলুল হক ও আব্বাস তায়েবজী উক্ত কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। তাঁহারাও তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া কাজ আরম্ভ করেন এবং মোট ১৫ শত ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। এই কাজে পণ্ডিত মালবীয়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মিঃ এণ্ড্রুজ ও মিঃ শাস্তনম্ কমিটিকে সহায়তা করেন।

প্রায় ছয় মাস পর ২৬শে মার্চ (১৯২০ সাল) বেসরকারী তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং উহারও দুইমাস পর ২৮শে মে হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুইটি কমিটির রিপোর্টের ফলাফল প্রায় বিপরীত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়। এমনও মনে হয় যে, বেসরকারী কমিটির তদন্তফলের পাণ্টা জবাব দিবার চেষ্টাই যেন সরকারী কমিটিতে করা হয়।

বেসরকারী কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পাঞ্জাবের অনাচারের জন্য জে: ডায়ার প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সামরিক ও অসামরিক কর্মচারী এবং পাঞ্জাবের লাট ও'ডায়ার সহ বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ড পর্যন্ত দায়ী। অধিকন্তু পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারীর যৌক্তিকতা ও বিদ্রোহের সম্ভাবনা অস্বীকার করা হয়। পক্ষান্তরে সরকারী তদন্ত কমিশনের সংখ্যাগুরু ইংরেজ সদস্যরা শাসকবর্গকে সমস্ত দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিবার এবং ইংরেজ কর্মচারীদের অপরাধ লঘু করার চেষ্টা করেন। তাঁহারা সামরিক আইন জারীর প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে করেন। তবে আফগান যুদ্ধের বা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সহিত উহার সংস্রব ছিল না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়। সসঙ্কোচে ইহাও স্বীকার করা হয় যে ডায়ার অত বেশী গুলি করার অনুমতি না দিলেই ভাল করিত।

জনসাধারণ এইহেতু স্বভাবতই বে-সরকারী তদন্তের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে; কিন্তু ভারত সরকার ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হাণ্টার কমিটির অধিকাংশ সদস্যের (ভারতীয় সদস্য স্যর চিমনলাল শীতলবাদ ও পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল কংগ্রেস তদন্ত কমিটির মূল বিষয়ের সহিত প্রায় একমত হন) মতামত গ্রহণ করে। তবে কমন্স সভায় (৮ই জুলাই, ১৯২০ সাল) উক্ত প্রসঙ্গ আলোচনাকালে ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু দুঃখ করিয়া বলেন যে জেঃ ডায়ার 'স্বীয়বিশ্বাসমত' কাজ করিলেও 'গুরুতর বিচার বিভ্রম' করে। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়টি প্রস্তাব আকারে উত্থাপিত হইলে ভারত সরকারের তরফে স্যর ভিন্সেণ্ট গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া আশ্বাস দেন যে, এ জাতীয় ব্যাপার আর ঘটিবে না। সরকার এ অভিমত মানিয়া নেয় যে, জেঃ ডায়ার ক্ষমতাতিরিক্ত আচরণ করে এবং সে অবস্থানুযায়ী মনুষ্যোচিত ব্যবহার করে নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও তাহার কাজ অনুমোদন করে না। কিন্তু লর্ড সভায় ১২৯-৮৬ ভোটে কমন্স সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে দুঃখ করিয়া এবং ডায়ারের বীরত্বে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অধিকন্তু জনসভায় তাহাকে সম্বর্ধনা জানাইয়া ও সম্মান দেখাইয়া বীরত্বসূচক তলোয়ার উপহার দেওয়া হয় এবং ভারতে অবস্থিত ইংরেজ মহিলারা ডায়ারকে 'ত্রাণকর্তা' হিসাবে ২০ হাজার পাউণ্ড (তিন লক্ষ টাকা) চাঁদা ভেট দেওয়ায় ভারতবাসীর মন তিক্ততায় ভরিয়া যায়।

অবশ্য ডায়ারকে সেনাবিভাগ হইতে পদচ্যুত এবং তাহাকে সরকারী কাজের অনুপযুক্ত বিবেচনা করা হয়; কিন্তু তাহা ভারতবাসীর গভীর ক্ষতে প্রলেপ মাত্র; সরকারী চাকরি না থাকিলেও ডায়ার প্রভৃতি অত্যাচারীদের ক্ষতি ইংরেজ সাধারণ নানাভাবে পোষাইয়া দেয়;

কর্ণেল জনসন নামক অপর এক পাপী ভারতে এক নামজাদা ইংরেজ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে মোটা মাহিনার চাকরি পায়।

কাজেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভারতবাসী গভীর শংকিত হইয়া পড়ে; পুনরায় বিভিন্ন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে উত্তেজনা ও গণবিক্ষোভও প্রবল আকার ধারণ করিতে থাকে। অধিকন্তু মণ্টেগুর ঘোষণা অনুযায়ী ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দানের প্রতিশ্রুতিও ছেদো আশ্বাস বলিয়া প্রমাণিত হয়। ১৯১৯ সলের ২৩ শে ডিসেম্বর মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার পার্লামেণ্টে * ভারত শাসন আইন বলিয়া বিধিবদ্ধ হইলে তাহাতে ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনই ব্যবস্থা হয় না। শাসনতন্ত্রে ভারতবাসীকে নামমাত্র অধিকার দিলেও গবর্ণমেণ্ট পূর্বের মত পূরা স্বৈরাচারীই থাকিয়া যায়। ভারতবাসীর নিকট কোন ব্যাপারে তাহাদের জবাবদিহী হইতে হয় এরূপ কোন ত্রুটি ও ফাঁক রাখা হয় না। এই ব্যাপারকে ক্ষমতাহীন এক গবর্ণমেণ্টের উপর দায়িত্ব চাপাইয়া দিবার এবং উহাকেও আবার নানা স্বার্থ-সংঘাতে কণ্টকিত করিবার অপকৌশল বলিয়া গণ্য করা হয়। বস্তুত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে ক্ষমতা দিবার অভিনয় করিয়া প্রকৃত ক্ষমতায় বঞ্চিত করিয়া রাখে। পূর্বের মতই শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রেরিত বড়লাট ও ছোটলাটদের হাতে সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে; তাহাদের সব কিছু নাকচের (veto) ও বহালের( (certificate) এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জরুরী আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা (ordinance) দেওয়া হয়; ভারত সচিবের মারফৎ ইণ্ডিয়া হাউসই পূর্ববৎ সূত্রধারের কাজ করিতে থাকে। কেন্দ্রীয়

* স্যর সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহকে লর্ড পদবীতে উন্নীত করিয়া সহকারী ভারতসচিব পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি লর্ড সভায় আসন গ্রহণ করেন এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফে উক্ত বিল উত্থাপন করেন। ভারতবাসীকে তুষ্ট করিবার এই নূতন কায়দাও পরিবর্তিত অবস্থায় দেশবাসীর মনঃপুত হয় না।

ব্যবস্থা পরিষদে অধিকাংশ সদস্য নির্বাচিত হইলেও তাঁহারা সিবিলিয়ানদের মাসহারা, ভাতা, সৈন্য ব্যয়, দেশীয় রাজ্য প্রভৃতি বিশেষ দফায় আলোচনা ও ভোটদানের অধিকার লাভ করেন না। পক্ষান্তরে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায়ও সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্য ঘটে। কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলা, অর্থব্যয়, পুলিশ প্রভৃতি দফা 'সংরক্ষিত' বিষয় ( reserved ) বলিয়া গণ্য হয় এবং সরকারী নীতি বা আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণে আইন সভা সমূহের কোনও ক্ষমতা থাকে না। সরকারী কর্মচারীরাই ঐগুলি ইচ্ছা মাত্র পরিচালনা করিতে থাকে। পক্ষান্তরে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ( যথা মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ড ), জনস্বাস্থ্য ও ঔষধপত্র বিতরণ সংক্রান্ত অপেক্ষাকৃত স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও নামমাত্র ক্ষমতা ভারতীয় মন্ত্রীদের নিকট অর্পণ করা হয়; কিন্তু ঐসব ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ের জন্য অর্থসচিবের উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখা হয় এবং এমনকি প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষমতা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাই কুখ্যাত ডায়ার্কি বা প্রাদেশিক দ্বৈতশাসন।

ভারতীয়দের সকল ক্ষমতায় বঞ্চিত রাখিয়াও ইংরেজ শাসকরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই। ভারতীয় রাজনীতি বিভেদসংকুল ও জটিলতর করিয়া তুলিবার অভিসন্ধিতে তাহারা পৃথক নির্বাচনের ভিত্তি ব্যাপকতর করিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও উহা প্রসারিত করে; অধিকন্তু নূতন কয়েকটি কায়েমী স্বার্থ খাড়া করিয়া ও নূতন নির্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টি করিয়া বিরোধের ভিত্তি বেশ পাকা করিয়াই রচনার ব্যবস্থা হয়। কেননা কংগ্রেস-লীগ চুক্তির আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি বর্জন করিয়াও পৃথক নির্বাচন ও মুসলমান সদস্য সংখ্যা সংক্রান্ত ধারা দুইটি ভারত শাসন আইনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পরবর্তীকালে স্বার্থান্বেষীরা তৃতীয় পক্ষ শাসক সম্প্রদায়ের উস্কানি ও সহায়তায় ক্ষমতা দখলের উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইবার সুযোগ

পায়। অধিকন্তু পাঞ্জাবের শিখগণ ও বৃটীশ ভারতের য়ুরোপীয়, ভারতীয় খৃষ্টান ও ফিরিঙ্গীরা স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার লাভ করে; জমিদার, বণিকসভা ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের জন্যও বিশেষ নির্বাচক মণ্ডল সৃষ্টি হয়। কাজেই সমগ্র দেশবাসীকে সীমাবদ্ধ আকারে হইলেও কয়েকটি স্বার্থ ও শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলা হয় এবং সাধারণ নাগরিক স্বার্থ ও দেশহিতের পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে দলীয় স্বার্থ উগ্র হইয়া উঠিবার অবকাশ থাকে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট বক্তিরাও আত্মশক্তিতে আস্থা হারাইয়া প্রতিপদে শাসকদের সমর্থনের প্রত্যাশী হইয়া পড়ে। ইহাই ভারতীয় রাজনীতিতে মূষল পর্বের সূচনা।

অবশ্য নয়া শাসন সংস্কারের মূলে গলদ থাকিলেও কয়েকটি বিষয়ে সুস্পষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব নির্ণীত হয় যথা ভারত সচিব, ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের কর্তৃত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ; অর্থব্যয় সম্পর্কে ভারত সরকারের স্বাধীন ক্ষমতালাভ; ভারতবাসীর প্রত্যক্ষ ভোটদানের অধিকার ও ভোটদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি (৫৩ লক্ষ); ঊর্ধ্বতন পদে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগ, সিবিল সার্বিসে এক তৃতীয়াংশ ভারতীয় নিয়োগের ব্যবস্থা এবং বিলাতে ও ভারতে যুগপৎ সিবিল সার্বিস পরীক্ষাগ্রহণ এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গকে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে 'রাজন্যমণ্ডল' (Chamber of Princes) গঠন প্রভৃতি।

ইহা সত্ত্বেও ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের এক নূতন স্তর-বিন্যাস রচিত হয়। উহাতে নামমাত্র শাসনক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থার সহিত নূতন কায়েমী স্বার্থ ও ভারতীয় বণিক সমাজের মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয়; বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা স্বীয় স্বার্থে ভারতে শিল্পোন্নয়ন ব্যাপারে বাধা দান নীতি

ত্যাগ করিয়া শিল্পপ্রসারে সামান্যমাত্রায় সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে ; কিন্তু তাহাও নিতান্ত সীমাবদ্ধ আকারে ; ভারতীয় শিল্পের শৈশবাবস্থা ও উহার সীমাবদ্ধ উৎপাদন সামর্থ হেতু তাহারা শোষকবৃত্তি বর্জনের ভাণ করিয়া উপচিকীর্ষু সুবিধান্বেষীর ভূমিকায় অবতরণ করে এবং ভারতীয় বণিককুল, নূতন ধনী ও শিল্পপতিদের সহিত আঁতাত গড়িতে উদ্যত হয়।

সিপাহী অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইবার পর ইংরেজ বণিক শাসন দণ্ড হাতে লইয়া সমগ্র ভারতের উপর শুধু প্রভুত্বই বিস্তার করে না, বৈষয়িক ব্যাপারেও ভারতকে নানা কৌশলে ইংল্যাণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া ফেলে ; বৃটেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও স্বার্থের সহিত ভারতের গাঁটছড়া বাঁধা পড়ে। অধিকন্তু শাসক হিসাবে ইংরেজ ভারতের কায়েমী স্বার্থসংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়, বিশেষ করিয়া নবসৃষ্ট জমিদার ও রাজন্যবর্গ এবং ইংরেজী শিক্ষিত নব্য গোষ্ঠির সহায়তায় তাহাদের শাসন দৃঢ়তর করে। এইভাবে উপনিবেশিক সাম্রাজ্য শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ ভারতকে এতকাল যে-নীতি অনুযায়ী তাঁবে রাখিতে সমর্থ হয়, বঙ্গভঙ্গের সময় উহার ব্যর্থতা প্রমাণিত হইলে তাহারা নূতন করিয়া শাসননীতি ঝালাই করে। এই উদ্দেশ্যে মর্লেমিণ্টো শাসনসংস্কারে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আইনগত মর্যাদা দিয়া তাহারা স্থায়ী বিরোধের বিষবৃক্ষ রোপন করে। আবার উহাকেই তাহারা মণ্টফোর্ড পরিকল্পনায় জটিলতর ও কুটিলতর করিয়া নূতনভাবে বণিক ও ধনিকশ্রেণীর সহিত সখ্যতাস্থাপনে প্রয়াসী হয়। কেননা, পরিবর্তিত পরিবেশে তাহাদের নূতন সাম্রাজ্য-সহচরের প্রয়োজন উপস্থিত হয় ; জমিদার প্রভৃতি ভূমির সহিত সম্পর্কিত জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতাদের এককালে আবশ্যক থাকিলেও নূতন অবস্থায় তাহাদের সাহায্য তেমন অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয় না। কাজেই তাহাদের দমননীতি ও ক্ষমতা হস্তান্তরের অনিচ্ছায় ভারত-বাসীর মধ্যে যে-জাতীয় আন্দোলন ও চেতনার উদ্ভব হয়, তাহার রশ্মিধারণ

ও বেগ সংযত করিবার উপযোগী এক বিশিষ্ট শ্রেণীর ভারতবাসীর সহায়তা ও বন্ধুত্বই তাহাদের কাম্য হয়। এটুকু তাহারা বুঝিতে পারে, আসন্ন ভবিষ্যতে কোন আন্দোলনের সৃষ্টি হইলে পেশা ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তাহার মস্তিষ্ক হইবে বটে, তবে বণিকগোষ্ঠি উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে ; অধিকন্তু আন্দোলনের ভারকেন্দ্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-চালিত বাঙলা হইতে শিল্প ও বণিক-প্রধান বোম্বাইএ স্থানান্তরিত হইবে। সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া শাসন পরিকল্পনায় ও সরকারী নীতিতে সংস্কার সাধিত হয় এবং শাসকবর্গ শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতীয়দের দোসর হিসাবে লাভ করার উদ্দেশ্যে সামান্যমাত্রায় সুবিধাদানের নীতি গ্রহণ করে। সুবিধাভোগী শ্রেণীকে তুষ্ট করিয়া সুবিধা-বঞ্চিত জনসাধারণের উপর নষ্টপ্রায় প্রভাবকে পরোক্ষে উজ্জীবিত করিবার এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতির রূপান্তর।

কিন্তু শাসন সংস্কার অভিপ্রেত হইলেও তৎকালীন অবস্থায় ভারতীয়দের ক্রমবর্ধিত আশাআকাঙ্ক্ষার আদৌ অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হয় নাই ; কাজেই পূর্বসৃষ্ট বিক্ষোভে নূতন অভিযোগ যুক্ত হইলে জনসাধারণের সর্বস্তরে অসন্তোষ বিসর্পিত হইতে থাকে ; ইংরেজ শাসনকে ভারতের অধঃপতনের মূলহেতু বলিয়া সকল শ্রেণীর মধ্যে কমবেশি ধারণা বদ্ধমূল হইয়া পড়ে।

এই পটভূমিকায় ১৯১৯ সালের অমৃতসর কংগ্রেসের অধিবেশন।

ইংরজেশাসনের বধ্যভূমি অমৃতসরকে সান্ত্বনা দানের এবং নিগৃহীত পাঞ্জাবকে সাহসে সঞ্জীবিত করিয়া তোলার উদ্দেশ্যই ঐ স্থানে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করা স্থির হয়। এদিকে অধিবেশন আরম্ভের দিনকয়েক আগে বৃটিশ পার্লামেন্টে ১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর মণ্টফোর্ড রিপোর্ট-সম্বল ভারত শাসন আইন গৃহীত হইলে, অধিবেশনের কার্যক্রম তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করার চেষ্টা যে না হয় এমন নহে। কেননা শাসন সংস্কার গ্রহণ বা বর্জন সংক্রান্ত প্রস্তাব

লইয়া প্রবীন ও নবীন নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। একদিকে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় উত্থাপিত প্রস্তাবে শাসন সংস্কার প্রত্যাখান করিতে বলা হয়; পক্ষান্তরে তিলক, পণ্ডিত মালবীয় ও গান্ধিজী পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসন সংস্কার কার্যকর করিতে পরামর্শ দেন। বহু তর্কবিতর্কের পর দাশ মহাশয়ের মূল প্রস্তাবের সহিত গান্ধিজীর সংশোধন প্রস্তাব জুড়িয়া দিয়া বলা হয় যে, "স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন সাপেক্ষ যথাশীঘ্র উহা আয়ত্তের জন্য জনসাধারণ শাসন সংস্কারের সহিত সহযোগিতা করিবে।" এই প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত অর্থ ইহাই যে দেশের রাজনীতিক উত্তাপ চরমসীমায় পৌঁছিলে এবং জনসাধারণ অধীর হইয়া উঠিলেও গান্ধিজী উহাকে কাজে লাগাইবার মত অনুকূল মুহূর্ত বলিয়া মনে করেন না; জাতীয় অবিচার ও অপমান সত্ত্বেও গান্ধিজী গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নীতি অনুযায়ী বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেন। তবে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করিলেও তাঁহার আপোষ প্রস্তাবই আপাতত মানিয়া নেওয়া হয় এবং তাহাই ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। পক্ষান্তরে মিসেস বেশান্ত উত্থাপিত বিকল্প প্রস্তাব কংগ্রেসে নাকচ হইয়া যায়।

অমৃতসরে বিভিন্ন ধরণের মোট ৫০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়; উহাতে জনমতের প্রতিধ্বনিই করা হয় যথা পাঞ্জাব দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে ডাকিয়া পাঠান, শ্রমিক ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুরবস্থার প্রতিবিধান, সংবাদপত্র দলন ও রাওলাট আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু গান্ধিজী পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে জনসাধারণের অনুষ্ঠিত হিংসামূলক আচরণের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব উপস্থিত করেন; তাহা বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে অগ্রাহ্য হইলে তিনি আপোষহীন দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করেন; এই বিষয়কে তিনি মূল নীতিগত প্রশ্ন বলিয়া মনে করেন এবং উহা গৃহীত

না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসে পর্যন্ত উপস্থিত থাকিতে অস্বীকার করেন। আশ্চর্য এই, গবর্ণমেণ্টের নিকট নতি স্বীকার করিয়াও গান্ধিজীর আপোষ রফায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের:নীতিগত প্রশ্নে অবিচল থাকার স্ববিরোধিতায় অনেকেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। বহু বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার সহিত তাঁহার মতদ্বৈধও হয় এবং তাঁহারা তাঁহার মনোভাবেব যৌক্তিকতাও স্বীকার করেন না। বরং তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন যে সরকারী প্ররোচনা ও অনাচারের পাল্টা জবাব হিসাবে জনসাধারণ যে-হাঙ্গামায় অনিচ্ছায় জড়াইয়া পড়ে, তাহার মধ্যে নীতি সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপন অসমীচীন; কিন্তু গান্ধিজীর অভিমত এই যে, সরকার পক্ষ হইতে হিংসার প্ররোচনা সত্ত্বেও জনতার অহিংস থাকা উচিত; অন্যথায় তাহাদের আচরণ নিন্দাত্মক ও নীতিবিরোধী। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেস গান্ধিজীর নৈতিক চাপে বাধ্য হইয়াই জনতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত আচরণের নিন্দা করেন।

কংগ্রেস কেন ব্যক্তিবিশেষের এজাতীয় খেয়ালের নিকট আত্মসমর্পণ করিল, সমগ্র জাতির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিকে অসদাচরণ বলিয়া অভিহিত করিয়াও কেন ব্যক্তিগত ইচ্ছা সকলেব উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল, সেসম্পর্কে নানা ভাষ্য হইয়াছে। তবে তৎকালে গান্ধিজীর প্রস্তাব স্বীকার করিয়া নিবার একটি প্রধান হেতু এই যে, সঙ্কটে তাঁহার নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়া কংগ্রেস যুক্তিযুক্ত ও সময়োচিত মনে করেন না; পরন্তু দেশবাসীকে লক্ষ্যাভিমুখে চালনার উপযোগী পরিবর্ত ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব দৃষ্ট হয়।

প্রবীন নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিলক, বেশান্ত ও বিপিন পাল প্রমুখ নেতার প্রভাব তখন অস্তগামী; অন্যদিকে নবীন নেতৃবৃন্দও কোনরূপ আকর্ষণীয় কর্মপদ্ধতি দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিতে অপরাগ। কাজেই এই দুই-এর মধ্যবর্তী গান্ধী-পদ্ধতির সমালোচনা ও বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তাঁহার 'নীতিগত' অপ্রিয় প্রসঙ্গে সকলকে বাধ্য হইয়াই নির্বাক থাকিতে হয়।

ইহা সত্ত্বেও বলা যায়, অমৃতসর অধিবেশনে কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে দ্বিধা-জড়িত থাকে। উহার কর্মপদ্ধতিও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না; এমনকি পূর্ব হইতে আশু বাড়াইয়া কংগ্রেস উদ্যোগআয়োজনের ভার নিজে গ্রহণ না করিয়া গবর্ণমেণ্টের উপরই সংস্কার চালু করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এইহেতু যুবরাজের সম্ভাব্য ভারত আগমনে সম্বর্ধনা জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কিন্তু ইহারই সঙ্গে তুরস্ক সম্পর্কে গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে আসন্ন দুর্বিপাকের পূর্বাভাস সূচিত হয় এবং বক্‌রঈদে গোহত্যা বন্ধের জন্য এবং তুরস্ক ও খিলাফৎ সম্পর্কে জনকয়েক বৃটিশ মন্ত্রীর প্রতিকূল মনোভাবের প্রতিবাদ করায় কংগ্রেস মুসলমান সমাজের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইহা হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্য ও সহযোগিতার পরিচায়ক।

তবে লক্ষ্যের বিষয়, আন্তর্জাতিক সমর্থন ও গুরুত্বের প্রতিও কংগ্রেস অবহিত হইয়া উঠেন এবং এইহেতু ইংল্যাণ্ড হইতে সদ্য-প্রত্যাগত তিলক ও অন্যান্য কংগ্রেসী প্রতিনিধি এবং আমেরিকা-প্রত্যাগত লালা লাজপৎ রায়ের কৃতকার্যে ধন্যবাদ জানান হয়। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে তিলক শ্রমিকদলকে ভারতীয় ব্যাপারে কংগ্রেসের অনুরাগী করিয়া তুলিতে সমর্থ হন এবং ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্যস্থানে ভারতের যথার্থ সংবাদ পরিবেষণকল্পে স্থায়ী মিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন; পক্ষান্তরে লালাজী সমগ্র যুদ্ধকালে নির্বাসিত অবস্থায় আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণকালে ভারত প্রসঙ্গ প্রচার করিয়া সকলকে ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তোলেন। অধিকন্তু প্রবাসী ভারতীয়দের দুরবস্থার প্রতিও কংগ্রেস সম্যক অবহিত থাকেন। ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়রা সম্পত্তি অর্জনের বা ব্যবসা করার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয় এবং পূর্বআফ্রিকায় সমস্যা দেখা দেয়; এগুজ আফ্রিকার এব্যাপারে

কাজ করায় ও পাঞ্জাবে যথাসাধ্য সেবা করায় কংগ্রেসের প্রশংসাভাজন হন।

দেশব্যাপী দুর্যোগ সম্ভাবনায় কংগ্রেসের গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি অপমানাহত জনসাধারণও উহাকে নিজেদের আশাভরসার স্থল বলিয়া মনে করিতে থাকে। অমৃতসর কংগ্রেস অধিবেশনে ৩৬ হাজার (তার মধ্যে ১২শত কিষাণ প্রতিসিধিসহ ৬ হাজার কংগ্রেস প্রতিনিধি) তাহার প্রমাণ।

কংগ্রেসের ক্রমবর্ধিত জনপ্রিয়তায় গবর্ণমেণ্ট শংকিত হইয়া উঠে; পরন্তু শাসন সংস্কার চালু করার ব্যাপারেও উদ্বেগ বোধ করে। তাহারা বুঝিতে পারে যে, কংগ্রেসকে খুশী করিতে না পারিলে লীগকে দলে ভিড়ান যাইবে না এবং উভয়ের সহযোগিতা না পাইলে শাসন সংস্কার বিফল হইবে। কাজেই সাধারণের অভিযোগের হেতু ও সন্দেহাতুর মনোভাব দূর করার প্রয়াস হিসাবে কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হইবার একদিন পূর্বে তাহারা মধুর ভাষায় রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়; আলী ভ্রাতৃদ্বয় জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সোজা কংগ্রেসে যোগ দিয়া ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা জেল হইতে রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া আনিয়াছেন; ইহাতে বিপুল আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হয়।

## নেতৃত্ব সমস্যা ও গান্ধিজী

কংগ্রেসে নেতৃত্ব সমস্যা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। জ্ঞান-ভূয়িষ্ঠ নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস হইতে অপসৃত হইবার পর জাতীয় জীবনে কর্মবীর তিলক, বেশান্ত মালবীয়, জিন্না, লাজপত রায়, পাল, গান্ধী, দাশ ও নেহরু প্রমুখ জন

কয়েক নেতা উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে নরমপন্থী নেতারাও মণ্টেগুর ইঙ্গিতে গঠিত উদারনৈতিক দলে সম্মিলিত হইয়া স্ব স্ব পরিবেশ অনুযায়ী কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়া কাজ করিতে থাকেন। কিন্তু দেশবাসীর অভাবঅভিযোগ ও আকাঙ্খার সহিত তাল রাখিতে না পারায় তাঁহারা ক্রমশ সকলের সহানুভূতি-বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। কংগ্রেসের প্রবীন ও নবীন নেতাদের মধ্যেও নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া যায়; এক প্রান্তে তিলক, বেশান্ত ও পাল অন্যপ্রান্তে গান্ধী এবং মধ্যপথে অপরাপর নেতৃবৃন্দ অবস্থান করিতে থাকেন। এরূপ অবস্থায় বামপন্থী তিলক ও বেশান্তের রাজনীতিক মতামত দ্রুত রূপান্তরিত হইয়া পারস্পরিক সহযোগিতায় পর্যবসিত হয় এবং জাতীয় সংকটকালে তাঁহারা নূতন পরিস্থিতি অনুযায়ী কোন নূতন ভাবধারা ও কর্মপদ্ধতির সন্ধান দিতে পারেন না। তবে বেশান্ত ও তিলকের মধ্যে গুণ ও কর্মগত পার্থক্য লক্ষণীয়। হোমরুল লীগের প্রতিষ্ঠার গৌরব তিলকের প্রাপ্য হইলেও বেশান্ত উহাকে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন এবং প্রধানত তাঁহার আরব্ধ আন্দোলনের ফলেই দেশবাসী শাসন সংস্কার ও অন্যবিধ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়; এ ব্যাপারে তিনি নির্যাতনও বরণ করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং দেশবাসীও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করে। ইহা সত্ত্বেও তিনি বিপ্লবধর্মী নহেন, তিনি সংস্কারপন্থী ও নিয়মতান্ত্রিক ভাবধারায় লালিত। কাজেই পরবর্তীকালে তাঁহার রাজনীতিক মতামত নিয়মতান্ত্রিক খাতে প্রবাহিত হওয়ায় তিনি ক্রমশ সকলের আস্থা হারাইতে থাকেন। বস্তুত ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব উল্কাপিণ্ডের মত বিস্ময়কর, কিন্তু ক্ষণ-স্থায়ী। অথচ তিলক তাঁহার বিপরীত-ধর্মী; বেশান্তের মত তিনিও ভারতীয় এবং বিশেষ করিয়া হিন্দু সংস্কৃতিতে গভীর ব্যুৎপন্ন; তবে কংগ্রেসী রাজনীতির গোড়া হইতে বামপন্থী

আন্দোলনের তিনি অন্যতম ধারক ও বাহক। স্বদেশহিতে তাঁহার অনুপম আত্মোৎসর্গ ও অনন্যসাধারণ নেতৃত্বক্ষমতা তাঁহাকে দেশবাসীর অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে; অথচ গান্ধিজীর আগমনকে তিনি সম্বর্ধনা জানাইতেও কুন্ঠিত হন না এবং তাঁহাকে প্রথমাবধি নানারূপ বন্ধুসুলভ সদুপদেশ দিয়া পথ-নির্দেশে সহায়তা করেন। ইহা সত্ত্বেও গান্ধিজী যখন সুনির্দিষ্ট ও সৃজনশীল কার্যক্রম লইয়া দেশবাসীব নিকট উপস্থিত হন, তিনি বেশান্তের মত তাঁহার বিরোধিতা না করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষার সুযোগ দেন; এমনকি মৌলিক নীতিগত প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলেও দেশবাসী গান্ধিজীর কার্যপদ্ধতি মানিয়া লইলে তিনি তাহা সমর্থন করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। এইহেতু তিলক কার্যক্ষেত্রে প্রথমদিকে গান্ধিজীর রাজনীতিক গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ঘোর বিরোধিতা করিয়া শেষ জীবনে তাঁহারা শিষ্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় ও তাঁহার নিকট পরাভূত হওয়ায় গ্লানিজনক বা কংগ্রেস ত্যাগ করার হেতু বলিয়া মনে করেন নাই। তাই ১৯২০ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পূর্বে তিলকের মৃত্যু হইলে গান্ধিজী বিশেষ বিচলিত হইয়া বলেন,—"আমার সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থলের অন্তর্ধান ঘটিল।" ইহার কারণ এই, তৎকালে অনুচর ও বন্ধুহীন গান্ধিজী ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে নিতান্ত অসহায় বোধ করেন; একদিকে আত্মাভিমানী মারাঠী ও বাঙালী রাষ্ট্রনীতিকরা তাঁহার বিরোধিতা করেন, অন্যদিকে দাশ প্রভৃতির মত উদীয়মান নেতারা তাঁহার কার্যক্রমে আস্থাশীল ছিলেন না। কাজেই প্রবীন ও নবীনের মধ্যপথে সেতুযোজনার প্রয়োজন ও অবকাশ থাকিলেও তিনি সহযোগী বন্ধু ও সহকর্মী অনুচরের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতে থাকেন। কলিকাতা কংগ্রেসে তাঁহার এই ব্যক্তিগত সংকট চরমে উঠে।

১৯১৯ সালের এপ্রিল হইতে যেমন সরকারী অনাচারে দেশে সংকট দেখা দেয় তেমনি কংগ্রেসে বিভিন্ন দলের মধ্যেও ভাঙ্গনের সুরু হয়। রাওলাট বিল লইয়া ইহার প্রথম সূচনা। বেশান্তের মত নির্যাতিতা নেত্রীও যখন রাওলাট বিলে প্রতিবাদের কিছুই নাই বলিয়া মত প্রকাশ করেন তখন রীতিমত বিস্ময়ের ভাব দেখা যায়। অতঃপর আসন্ন শাসন সংস্কার সম্পর্কে বিলাতে লর্ড সেলবোর্ণের সভাপতিত্বে পার্লামেণ্টারী সিলেক্ট কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইলে ভারত হইতে কংগ্রেস, উদারনৈতিক দল এবং দ্বিধা-বিভক্ত হোমরুল লীগের দুই দল প্রতিনিধি স্ব স্ব বক্তব্য পেশ করিতে বিলাত যাত্রা করেন। বেশান্ত নবসৃষ্ট ন্যাশনাল হোমরুল লীগের প্রতিনিধি হিসাবে পার্লামেণ্টোরী কমিটির নিকট সাক্ষ্য দেন। এদিকে তিনি সামান্য রদ-বদল করিয়া মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করিতে আরম্ভ করেন। অধিকন্তু বিলাতে কংগ্রেসের তরফ হইতে তিলক প্রমুখ নেতা সভাসমিতি ও সম্বর্ধনা সভায় ভারতের আশাআকাঙ্ক্ষার কথা বৃটিশ জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করিবার সময় বেশান্ত ও কংগ্রেসের বিলাতী শাখা তাঁহাদের তীব্র বিরোধিতা করিতে থাকেন।

লক্ষ্যের বিষয়, বিলাতে থাকিতেই তিলকের রাজনৈতিক মতামত দ্রুত পরিবর্তিত হইতে থাকে। তিনি বলেন যে, যাহা মিলিবে তাহাই গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট ক্ষমতালাভের জন্য লড়াই করিতে হইবে। এমনকি শাসন-সংস্কার আদৌ আশানুরূপ না হওয়া সত্ত্বেও অমৃতসর কংগ্রেসের যাত্রাপথে পার্লামেণ্টে ভারত শাসন আইন গৃহীত হওয়ায় তিনি ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে রাজাকে সম্বর্ধনা জানান এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সংস্কার গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

কংগ্রেসে এজাতীয় অবস্থা অপ্রত্যাশিত ; সকলেই উপলব্ধি করেন যে মতান্তরই নহে, পথান্তরও অবশ্যম্ভাবী। কাজেই অমৃতসর কংগ্রেসে অন্যান্য

বিষয়ের সহিত উহাকে উপলক্ষ করিয়া প্রবীন ও নবীন নেতৃবর্গের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

এই সময় খ্যাতনামা আইনজীবী চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় ক্রমশ নেতৃত্বের পুরোভাগে আসিয়া উপস্থিত হন। অবশ্য ১৯১৭ সালে বেশান্তকে সভানেত্রী পদে বরণ করা লইয়া যে-মতভেদ দেখা দিয়াছিল, তিনি সেসময়ই প্রথম সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তী তিন বৎসর কাল কংগ্রেসের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিয়া তিনি অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা বলিয়া পরিগণিত হন। অমৃতসর কংগ্রেসে উত্থাপিত মূল প্রস্তাব (যাহা গান্ধিজীর সংশোধিত প্রস্তাব সহ গৃহীত হয়) তাঁহারই রচিত। উহা শাসন সংস্কার প্রত্যাখ্যানের পক্ষে হইলেও গান্ধিজীর আপোষরফামূলক সংশোধন প্রস্তাব মানিয়া লওয়ায় কার্যত স্বীকৃতিসূচক হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই উহাতে উভয়ের প্রাধান্যই কার্যত স্বীকৃত হয়। অধিকন্তু মূল প্রস্তাব সহযোগিতামূলক হওয়ায় তিলকও কোনরূপ অসুবিধা বোধ করেন না। কিন্তু বেশান্ত উহার বদলে যে বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

১৯২০ সালের মে মাসে তুরস্কের সহিত মিত্রপক্ষের শান্তিচুক্তির বিবরণ প্রকাশিত হইবার পর নেতৃত্ব প্রতিযোগিতার পরবর্তী অধ্যায় রচিত হয়। গান্ধিজী সময়ের সহিত তাল রাখিয়া বিক্ষুব্ধ মুসলমান সমাজের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষা করিয়া চলেন এবং ক্ষুব্ধ খিলাফতী মুসলমানদের সমক্ষে প্রতিকারের পন্থা নির্দেশ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেভার্স সন্ধিসর্ত সংশোধনকল্পে অসহযোগ আন্দোলন সংগঠনের সংকল্প ঘোষণা করেন। কিন্তু তিলক এব্যাপারে তাঁহার সহিত একমত হইতে অক্ষম হন; তবে তিনি গান্ধিজীর প্রয়াসে বাধাও দেন না। পক্ষান্তরে তিনি নিজের সুবিধা ও আদর্শমত কাজ করিবার জন্য 'কংগ্রেস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' গঠন করেন।

বেশান্তও চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন না; কিন্তু তিনি সহকর্মীদের সহিত

কার্যক্রম সম্পর্কে একমত হইতে পারেন না অথবা দেশবাসীর প্রগতিশীল মনোভাবও আমলে আনেন না ; এই হেতু নিঃ ভাঃ হোমরুল লীগ হইতে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন ; ঐ সুযোগে গান্ধিজী প্রাচীন হোমরুল লীগপন্থীদের স্বীয় মতে আনিয়া এপ্রিলের ( ১৯২০ সাল ) তৃতীয় সপ্তাহে উহার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। লীগের creed বা মূল নীতি পরিবর্তন করিয়া তিনি উহার নাম স্বরাজ সভা করেন। এই উপলক্ষে গান্ধিজী এক বিবৃতি প্রচার করেন ; উহাতে তিনি বলেন যে, "কংগ্রেসকে আমি দলীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করি না। আশা করি, সকল দলই কংগ্রেসকে জাতীয়তার পীঠস্থান বলিয়া মনে করিবে এবং তাহারা স্ব স্ব কার্যক্রম জাতির নিকট উপস্থিত করিয়া উহার কার্যসূচী স্থির করিতে সচেষ্ট হইবে। কংগ্রেস যাহাতে জাতীয় সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, এমন ভাবেই আমি লীগের নীতি নির্ধারণে যত্নবান হইব।" তিলকও নিজ দলের কার্যক্রম ঘোষণা করিয়া তদনুযায়ী কাজ করিতে থাকেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হইতে পারে তিনি এরূপ কিছু করিবেন না।

হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট ( ২৮শে মে ) বাহির হইবার পর ৩০শে মে কাশীতে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হয় ; তিলক খিলাফৎ আন্দোলনে পূর্ণমাত্রায় সম্মতি দিতে অক্ষম হন বলিয়াই উহাতে যোগ দেন না ; তবে কংগ্রেসের যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন বলিয়া তিনি কথা দেন। কিন্তু আন্দোলন আরম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে ৩১শে জুলাই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় জাতি তাহার নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হয়।

## তুরস্ক ও খিলাফৎ সমস্যা

১৯২০ সালে ১লা জানুয়ারীর প্রথম সূর্যোদয় সুপ্রভাতের সূচনা করে। ঐদিন এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে দাসত্বপ্রথা

রহিত হইবার পর ভারত হইতে বিভিন্ন বৃটিশ উপনিবেশ ও ডমিনিয়নে চুক্তিবদ্ধ মজুর প্রেরণের যে-ব্যবস্থা এতকাল বলবৎ ছিল তাহা গভর্ণমেণ্ট রহিত করে। ইহার ফলে নাতাল ও মরিসাসে শ্রমিক প্রেরণ বন্ধ হয় এবং ফিজি, ত্রিনিদাদ, বৃটিশ গায়েনা, সুরিনাম ও জামাইকায় চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় মজুর দাসখৎ হইতে মুক্তি পায়। কাজেই এতদিনের অভিযোগ দূর হওয়ায় ভারতীয়দের মনে যে কিঞ্চিৎ সন্তোষ দেখা দিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সম্পদ আহরণ করিয়া বৃটেনের শক্তি ও বিত্ত বৃদ্ধিকল্পেই ভারতীয় মজুররা ক্রীতদাসের মত নিয়োজিত হয়; উক্ত ব্যবস্থা ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত যোগসাজসে করা হয় বলিয়া প্রবাসী ভারতীয়গণ নাগরিকের অধিকার ও মনুষ্যোচিত ব্যবহার লাভেরও যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। ইদানীন্তনকাল অবধি ফিজি প্রভৃতি স্থানে ভারতবাসীর প্রতি যে উৎপীড়ন চলিতেছে, তাহা পূর্বকৃত কর্ম এবং রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জের মাত্র।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান কালে গান্ধিজী ভারতবাসীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেন; এদেশে আসিয়াও তিনি সকল দোষের আকর চুক্তি-বদ্ধ মজুর প্রেরণ বন্ধের জন্য এই মর্মে হুমকি দেন যে ১৯১৭ সালের ৩১শে মের মধ্যে ঐ ঘৃণ্য প্রথা বন্ধ না হইলে তিনি সত্যাগ্রহ করিতে বাধ্য হইবেন। ইহাতে বিপদ বুঝিয়া বড়লাট ১২ই এপ্রিল আশ্বাস দেন যে যুদ্ধকালীন বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী শ্রমিক সংগ্রহ স্থগিত থাকিবে। কিন্তু ইতিপূর্বে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় এসম্পর্কে পণ্ডিত মালবীয় কর্তৃক উত্থাপিত এক প্রস্তাব গৃহীত হইলেও তিনি বলিয়াছিলেন যে প্রস্তাবানুযায়ী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে কিছু সময় লাগিবে। অথচ কিছুকাল পর প্রকাশ পায় যে আরও পাঁচ বছর শ্রমিক সংগ্রহ করিয়া যাইবার জন্য

তিনি বিলাতের উপনিবেশ দপ্তরের সহিত গোপন ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে মিঃ এণ্ড্রুজ সরকারকে উত্তর দিতে আহ্বান করেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট উহার কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। কাজেই গোপন চুক্তির কথা ফাঁস হইয়া যাওয়ায় গান্ধিজী উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেন। উহাতে বাধ্য হইয়া গভর্ণমেণ্ট তরফ হইতে চুক্তিবদ্ধ মজুর প্রেরণ বন্ধ সম্পর্কে যেআশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, তাহাই এতকাল পরে বাস্তবে পরিণত করা হয়; এই হেতু ভারতবাসীও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

কিন্তু ইহা দিগন্তছায়ী মেঘঘেরা আকাশে চকিত বিদ্যুৎবিকাশের মত ক্ষণস্থায়ী। কেননা ২৫শে মার্চ (১৯২০ সাল) পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কংগ্রেসী এবং ২৮শে মে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে, জনসাধারণ ঘৃণা ও ক্রোধে চঞ্চল হইয়া উঠে। অধিকন্তু এই মর্মান্তিক ক্ষতে সরকারী প্রলেপ ব্যবস্থায় ও বৃটিশ জনমতের উপেক্ষায় পরিস্থিতি অধিকতর অসহনীয় হয়।

সর্বোপরি ১৪ই মে সেভার্স সন্ধিসর্তের ধারা প্রকাশিত হইলে বৃটেনের গূঢ় অভিসন্ধি সম্পর্কে কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকেনা। কাজেই খিলাফতী মুসলমানগণও কংগ্রেসের সহিত একযোগে প্রতিকারপন্থা উদ্ভাবনে রত হয়। ইহাতে নূতন শক্তি-সংযোগ ঘটায় কংগ্রেস বলীয়ান হইয়া উঠে এবং বাহির ও ভিতরের ঘটনাবর্তে উহার নীতি ও কর্মকৌশল দ্রুততালে অপ্রত্যাশিত পরিণামের পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

## ভারতীয় সংহতি ও মুসলীম রাজনীতি

মুসলীম রাজনীতিতেও বন্যাবেগ সঞ্চারিত হয়। তাহারা প্রচলিত ব্যবস্থা ও অভ্যস্ত জীবনধারা পিছনে ফেলিয়া বৃহত্তর আন্দোলনের হোমাগ্নিশিখায় শুদ্ধ হইতে ব্রতী হয়।

যুদ্ধকালে ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ ভারতীয় মুসলমানদের মনস্তুষ্টির জন্য এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাহারা যুদ্ধে যোগ দিলে তুরস্কের প্রতি অন্যায় করা হইবে না। এই আশ্বাসদানের কারণ এই যে, ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের সুলতানকে খলিফা ও পবিত্র তীর্থস্থানের রক্ষক বলিয়া গণ্য করিত। কাজেই তুরস্কের সুলতানের পরাজয়ে মুসলমানদের ধর্মনাশের আশংকা থাকায় মিঃ লয়েড জর্জ ঘোষণা করেন, "তুরস্কের নিকট হইতে তুর্কী-প্রধান ও সমৃদ্ধ এশিয়া মাইনর ও থ্রেস কাড়িয়া নিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছি না।" ঐ আশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিয়া ভারতীয় মুসলমানগণ যুদ্ধে যোগ দেয়; কিন্তু যুদ্ধান্তে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী তাঁহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির নূতন ভাষ্য করেন। এইহেতু বিশ্বাসভঙ্গের দরুণ মুসলমানগণ স্বতই ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠে।

মুসলমানদের নিম্নোক্ত দাবী ছিল যথা :—আরব, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন (সমুদয় তীর্থস্থানসহ) খলিফার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন থাকিবে। কিন্তু যুদ্ধাবিরতির সর্ত অনুযায়ী থ্রেস গ্রীসের কুক্ষিগত হয় এবং এসিয়াস্থিত তুরস্ক সাম্রাজ্য বৃটেন ও ফ্রান্সের অভিভাবকাধীন হইয়া পড়ে। খোদ তুরস্ক মিত্রপক্ষীয় একটি কমিশনের শাসনাধীন হয় এবং পরিণামে তাহারাই তুরস্কের প্রকৃত শাসনকর্তা হইয়া দাঁড়ায়; আর তুর্কী সুলতান কার্যত মিত্র-পক্ষের বন্দী হইয়া থাকেন। ইহাতে ভারতীয় মুসলমানগণের পক্ষে বৃটিশ-দ্বেষী হইয়া পড়া আদৌ আদর্শজনক ছিল না।

নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় বিশিষ্ট কংগ্রেসী ও খিলাফতী নেতৃবৃন্দ অমৃতসর কংগ্রেসের সময় এক বৈঠকে মিলিত হন এবং উহাতে গান্ধিজীর নেতৃত্বে খিলাফৎ আন্দোলন সংগঠনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আঘাত সংঘাতের মুখে মুসলীম লীগ বৃটিশদ্বেষী হইলেও কার্যত নবজাগ্রত ও উত্তেজিত মুসলমান সমাজকে আকাঙ্খিত লক্ষ্যাভিমুখে চালিত করিতে অপারগ হয়।

কার্যক্ষেত্রে উহার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিশেষ অনুভূত হয় না। এইহেতু উহার পরিবর্তে কংগ্রেসের সহিত নিবিড় সহযোগিতায় যে-খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয়, তাহাই আন্দোলনে মুসলমানদের চালনার ভার গ্রহণ করে।

১৯২০ সালের জানুয়ারীর মধ্যভাগে আলী ভ্রাতৃদ্বয় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক বিবৃতি দেন। উহার মর্ম অনুযায়ী ১৯শে জানুয়ারী ডাঃ আন্সারীর নেতৃত্বে এক মুসলমান প্রতিনিধিদল 'তুর্কী সাম্রাজ্যরক্ষা ও খলিফা হিসাবে সুলতানের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজন' বড়লাট সমীপে বিবৃত করেন।

বড়লাট প্রতিনিধিবৃন্দকে বলেন যে বিষয়টি আর বৃটেনের হাতে নাই; অন্যান্য রাষ্ট্রও উক্ত সিদ্ধান্তের সহিত সংশ্লিষ্ট; পক্ষান্তরে বিশিষ্ট ফরাসী, ইংরেজ ও মার্কিন সংবাদপত্রসমূহে চিরকালের মত প্রাচ্য সংক্রান্ত প্রসঙ্গ নিষ্পত্তির যৌক্তিকতা বারংবার প্রতিপাদিত হওয়ায় মুসলমানদের সন্দেহ গভীরতর হয়। প্রভাবশালী বৃটিশ ও মার্কিন মহলে এরূপ মতামতও ব্যক্ত হইতে থাকে যে, তুর্কীদিগকে কনস্টান্টিনোপল হইতে বিতাড়িত করিলেই চলিবে না; উহাকে চতুর্থ শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে। এই হেতু ফেব্রুয়ারী ও মার্চে খিলাফৎ প্রসঙ্গ ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবোধক হইয়া দাঁড়ায়।

মুসলীম নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতি মারফৎ গবর্ণমেণ্টকে হুঁসিয়ার করিয়া দিয়া 'আরব ও অন্যান্য ধর্মস্থানসমূহ খলিফার অধীন রাখার' দাবী করেন। এই দাবী প্রবলতর করার উদ্দেশ্যে ২০শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত তৃতীয় খিলাফৎ সম্মেলনের অধিবেশনে মুসলমানদের দাবী পুনরায় ঘোষিত হয়। উহাতে নেতৃবর্গ মিত্রপক্ষের রাষ্ট্রনায়কদিগকে পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'সঠিক সিদ্ধান্ত না হইলে গুরুতর পরিণামের সম্মুখীন হইতে হইবে' বলিয়া হুমকী দেন।

এবিষয়ে চূড়ান্ত বুঝাপড়ার উদ্দেশ্যে মৌলানা মহম্মদ আলীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বিলাত যান। কিন্তু ১৭ মার্চ মিঃ লয়েড জর্জ তাঁহাদের সোজা বলিয়া দেন যে তুরস্কের ভাগ্যও অন্যান্য খৃষ্টান দেশের অনুরূপ হইবে; তবে অন্যের চেয়ে তাহাকে ধর্মীয় ব্যাপারে সামান্য সুবিধা দেওয়া হইবে। যেসব দেশ তুর্ক জাতির বাসভূমি নয়, তাহাদের উপর তুরস্কের শুধু ধর্মীয় প্রাধান্য বর্তমান থাকিবে। ইহাতে ভারতীয় মুসলমানরা মর্মাহত হয়।

এরূপ অবস্থায় ১৯শে মার্চ জাতীয় শোক দিবস বলিয়া ধার্য হয়; নেতৃবৃন্দ ঐ দিন উপবাস, প্রার্থনা ও হরতাল করিতে নির্দেশ দেন। গান্ধিজী ঘোষণা করেন যে খিলাফৎ সমস্যা ভারতীয় মুসলমানদের অনুকূলে সমাধান করা না হইলে তিনি অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন,—"যে-অধিকার হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে জীবনমরণতুল্য, তাহা অন্যায়রূপে হরণ করিয়া ইংল্যাণ্ড কখনও যেন না ভাবে যে আমরা নতশিরে তাহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইব।"

মুসলমান প্রতিনিধি দল য়ুরোপে অবস্থানকালেই ১৪ মে (১৯২০) মিত্রপক্ষের সহিত তুরস্কের শান্তি সর্তাবলী এবং উহারও দুই সপ্তাহ পর হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট বাহির হয়; ইহাতে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি পড়ে।

ইত্যবসরে খিলাফৎ কমিটি বিশেষ তৎপর হইয়া উঠে: গান্ধিজীর প্রস্তাবিত অসহযোগ এবং দেশবাসীর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ধারণকল্পে ২৮শে মে বোম্বাই-এ উহার এক অধিবেশন হয়; তাহাতে স্থির হয় যে গান্ধিজী-বর্ণিত অসহযোগ আন্দোলনের আশ্রয় গ্রহণই দুঃসহ অপমানের হাত হইতে মুসলমানদের পক্ষে পরিত্রাণের একমাত্র পথ।

ঘটনাবলী দ্রুত আবর্তিত হইতে থাকে ; দেশবাসীও উত্তেজনায় অধীর হইয়া পড়ে। কাজেই সমগ্র বিষয় পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ৩০ মে কাশীতে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হয়। উহাতে হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট ও তুরস্কের উপর আরোপিত শান্তিসর্ত আলোচনা চলে। অধিকন্তু ঐ বিষয় এবং অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণের সমীচীনতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কলিকাতায় বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়।

খিলাফৎ সংশ্লিষ্ট অসহযোগ সম্পর্কে কর্তব্য স্থির করার উদ্দেশ্যে গান্ধিজী ২রা জুন এক সর্বদলীয় নেতৃবৈঠক আহ্বান করেন। উহাতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ভাবী কার্যসূচী রচনার জন্য গান্ধিজী ও জনকয়েক নেতৃস্থানীয় মুসলমানকে লইয়া এক কমিটি গঠিত হয়। কমিটি বিশেষ বিবেচনার পর গবর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগিতার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে শিক্ষায়তন ও আইনআদালত বর্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই নীতি নির্ধারণের স্তর নির্ণয়কালে মৌলনা আজাদ গান্ধিজীর অশেষ সহায়ক হন।

সরকারী সহযোগিতা বর্জনের প্রস্তাব নূতন নহে ; ১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত নিঃ ভাঃ খিলাফৎ সম্মেলন গান্ধিজীর উপদেশ অনুযায়ী অসহযোগিতার প্রস্তাব মানিয়া নেয় ; নানাস্থানে উক্ত প্রস্তাব সমর্থিতও হয়। অতঃপর ১৭ই এপ্রিল (১৯২০সাল) মাদ্রাজ খিলাফৎ সম্মেলন অসহযোগের ভিত্তি প্রসারিত করিয়া উহাতে উপাধি, সরকারী চাকরি, পুলিশ ও সেনাদলের চাকরি বর্জন এবং কর বন্ধের ধারা অন্তর্ভুক্ত করে।

## হিজরৎ ও জেহাদ

এস্থলে একটি অর্থব্যঞ্জক ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সেভার্স সন্ধি-চুক্তিতে তুরস্কের উপর হীনতাব্যঞ্জক সর্ত চাপাইয়া দেওয়ায় একশ্রেণীর ভারতীয় মুসলমান বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি রোষ ও ঘৃণায় দিশাহারা হইয়া পড়ে। তাহারা মুসলমানদের পক্ষে বৃটিশশাসিত ভারতকে বাসের অযোগ্য বলিয়া মনে করে। এই ব্যাপারে সিন্ধুর মুসলমানগণ অগ্রণী হয়; তাহাদের অনেকে ভারতভূমি ত্যাগ করিয়া আফগানীস্থানের দিকে 'হিজরৎ' আরম্ভ করে; কাজেই আন্দোলন সীমান্ত প্রদেশেও ছড়াইয়া পড়ে। এই ব্যাপারে মোট ১৮হাজার লোক যোগ দেয়। কিন্তু পুলিশ ও সৈন্যদল তাহাদের ব্যাপকভাবে ভারতত্যাগে বাধা দেওয়ায় কয়েকস্থানে মারাত্মক সংঘর্ষ ঘটে; পক্ষান্তরে বৃটীশগবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে আফগান কর্তৃপক্ষও হিজরৎকারীদের অগ্রগমনে বাধা দেয়; ইহার ফলে বহু ধন ও প্রাণ হানি হয়; এইহেতু সংশ্লিষ্ট মুসলমানগণ নানাভাবে বিপন্ন হইয়া ব্যাপক-ভাবে ভারত ত্যাগের পরিকল্পনা বর্জন করে।

ইতিপূর্বে মহাযুদ্ধের সময়ও ইহার সমজাতীয় আর একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল। তবে ঐসময় ভারতত্যাগ জনকয়েক বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহারা প্রধানত বহির্ভারতে তুরস্কের সহায়তায় ভারতে ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

১৯১৫সালের আগস্ট মাসের প্রথমভাগে আবদুল্লা, ফতে আহম্মদ ও মহম্মদ আলী নামক তিনজন সহচরসহ মৌলনা ওবেদুল্লা সিন্ধী নামক জনৈক ইসলামধর্মে দীক্ষিত শিখ ভারতে বৃটিশরাজত্ব উচ্ছেদকল্পে সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আফগানীস্থান যাত্রা করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল,

যুদ্ধের সুযোগে যুগপৎ ভারতের বাহির হইতে সীমান্ত প্রদেশের উপর আঘাত হানিয়া এবং ভারতে অন্তর্বিদ্রোহ ঘটাইয়া বৃটিশশাসনের অবসান ঘটান।

মৌলানা ওবেদুল্লা যুক্তপ্রদেশের সাহারানপুর জেলার বিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন। ঐস্থানে তিনি সুকৌশলে মাদ্রাসার বহু মৌলভী ও ছাত্রকে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত করিতে সমর্থ হন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে দেওবন্দে শিক্ষিত মৌলভীদের সাহায্যে সমগ্র ভারতে অভ্যুত্থান ঘটান সহজ হইবে। কিন্তু মাদ্রাসার ম্যানেজার এই গুপ্ত পরিকল্পনা ফাঁস করিয়া দেওয়ায় তিনি ব্যর্থকাম হন।

ভারতত্যাগের পূর্বে তিনি দিল্লীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই সময় তিনি দুইটি পুস্তক প্রচার করেন; উহাতে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের নিকট সামরিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজন এবং জেহাদ ঘোষণার যৌক্তিকতা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

ওবেদুল্লা কাবুলে গিয়া তুর্ক-জার্মান মিশনের কর্তাদের সহিত অন্তরঙ্গতা স্থাপন করেন। পক্ষান্তরে দেওবন্দের মৌলবী মহম্মদ মিঞা আন্সারী কিছুকাল পর তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার মন্ত্রশিষ্য দেওবন্দের প্রধান মৌলবী মৌলানা মহম্মদ হাসান জনকয়েক বন্ধুসহ হেজাজ (আরব) যাত্রা করেন। তাঁহারা (মহম্মদ আন্সারী সহ) হেজাজে তুর্কী সামরিক গভর্ণর গালিব পাশার নিকট হইতে জেহাদ ঘোষণার আজ্ঞাপত্র গ্রহণ করেন। ফিরিবার পথে মহম্মদ আন্সারী উহা সীমান্তের উপজাতি ও ভারতবাসীর মধ্যে বিতরণ করেন। ঐ আজ্ঞাপত্র 'গালিবনামা' বলিয়া পরিচিত। এস্থলে উহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল যথা:—

"মুসলমানগণ, নির্যাতনকারী খৃষ্টান গবর্ণমেন্টের উপর আঘাত হানো। উহাদেরই অধীনে তোমরা বাস করিতেছ। শত্রুকে গলা টিপিয়া মারার জন্য

সমগ্র শক্তি সংহত কর ; তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের ঘৃণা ও শত্রুতা প্রদর্শন কর।”

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে সভাপতি করিয়া কাবুলে যে-অস্থায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, ওবেদুল্লা ছিলেন তাহার অন্যতম মন্ত্রী ও বিপ্লবী কৃষ্ণবর্মার বন্ধু বরকত উল্লা ছিলেন প্রধান মন্ত্রী।

১৯১৬ সালে কাবুলে জার্মান মিশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইলে তাহারা বৎসরের প্রথমভাবে আফগানীস্থান ত্যাগ করে। ইহা সত্ত্বেও ভারতের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে রুশ-তুর্কিস্থানের গবর্ণর ও রাশিয়ার জারের নিকট আমন্ত্রণ লিপি পাঠান হয়। উহাতে তাঁহাদিগকে ভারতে বৃটিশরাজত্ব উচ্ছেদের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু জারের নিকট রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের স্বাক্ষরিত সোনার পাতে লিখিত পত্র বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে পড়ে।

অস্থায়ী ভারত গভর্ণমেণ্ট তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের সহিতও মিত্রতা স্থাপনে উদ্যোগী হয়। এই উদ্দেশ্যে ওবেদুল্লা তাঁহার পুরাতন বন্ধু মৌলানা হাসানের নিকট পত্র দেন। তিনি মৌলানা আন্সারী লিখিত আর একটি পত্রও এই সঙ্গে হায়দরাবাদের (সিন্ধু) আবদুর রহমান নামক জনৈক বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট পাঠান। উহাতে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, প্রেরিত পত্র যেন বিশ্বাসী হাজী মারফৎ মক্কায় অবস্থিত মহম্মদ হাসানের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। পত্রগুলি হলুদ রং-এর রেশমী কাপড়ের উপর লিখিত ছিল। পক্ষান্তরে ঐগুলিকে তুর্কি গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্পণ করার ভার মহম্মদ হাসানের উপর পড়ে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯১৬ সালের আগস্ট মাসে উক্ত পরিকল্পনার বিষয় অবগত হইয়া সংশ্লিষ্ট সকলকে গ্রেপ্তার করে। ইহাই “রেশমী চিঠির (Silk Letter Case) মামলা” বলিয়া খ্যাত।

এই ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে একদল লোক সর্বস্বের বিনিময়েও ইংরেজ

শাসনের সক্রিয় বিরুদ্ধাচরণ করে। যাহা হউক ভারতে ব্যাপকভাবে অহিংস অসহযোগ প্রস্তাবকে রূপায়িত করার জন্য উদ্যোগ আয়োজন চলে। বিশেষ করিয়া খিলাফৎ সম্মেলনে উক্ত কার্যপদ্ধতি অনুমোদিত হইবার পর গান্ধিজী ১লা আগস্ট হইতে সরকারীভাবে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্বোধন করার বিষয় স্থির করেন। ঐদিন সর্বত্র হরতালও ঘোষিত হয়; গান্ধিজী সরকার-প্রদত্ত কাইজার-ই-হিন্দ পদক ফেরৎ দিয়া আন্দোলন সম্পর্কে বড়লাটকে এক পত্র দেন। অতঃপর অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ সম্পর্কে দেশবাসীর সঠিক মনোভাব পর্যালোচনা করিয়া সাধারণের 'উৎসাহাধিক্য সংযত করার' উদ্দেশ্যে গান্ধিজী আলী ভ্রাতৃদ্বয় সমভিব্যাহারে প্রথমে মাদ্রাজ সফরে বাহির হন। জনসাধারণ তাঁহার আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। কিন্তু এই জাতীয় সঙ্কটে ৩১শে জুলাই লোকমান্য তিলকের তিরোধানে পূর্বব্যবস্থা সংশোধনের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। ভারতবাসী জাতিবর্ণনির্বিশেষে এই আজন্ম নৈষ্ঠিক সাধক ও বীর্যবান দেশনেতার প্রতি রাজোচিত শেষ সম্মান দেখাইয়া নানা-স্থানে জনসভা অনুষ্ঠান, হরতাল ঘোষণা ও স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করে।

ইতিমধ্যে আন্দোলনের সূচনা দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রমাদ গণে। তাহারা প্রথমে উহাকে ততটা আমল দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই; এমনকি উহার প্রতি তাহাদের তাচ্ছিল্য না থাকিলেও কিছুটা কৌতুহল-মিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব দেখা যায়। তবে আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে কতিপয় সদস্য নেতৃবৃন্দের আহ্বানে সাড়া দিয়া যখন পদত্যাগ করেন তখন সরকারের হুঁস হয়। তাহারা আর আন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করিতে পারে না; বরং উহার বিরোধিতা ও মূলোৎ-পাটনের উদ্দেশ্যে তাহারাও পাল্টা ব্যবস্থা করে। প্রথম ধাপে বড়লাট অসহযোগ প্রস্তাবকে 'সর্ব্বপ্রকার মূঢ় পরিকল্পনার মধ্যে মূঢ়তম' বলিয়া অভিহিত করেন; অতঃপর তিনি জাতীয়তাবাদী গোড়ামিকে যেন উপহাস

করিয়াই ডাঃ (পরে স্যর) তেজবাহাদুর সপ্রুকে স্বীয় শাসন পরিষদের সদস্য নিয়োগ করেন।

এই স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে ভবিষ্যৎ কার্যপন্থা নির্ণয়ের জন্য ৪ঠা হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়। উহাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন বামপন্থী নেতা বোমকেশ চক্রবর্তী এবং মূল সভাপতি হন আমেরিকা হইতে সদ্য স্বদেশ-প্রত্যাগত লালা লাজপৎ রায়।

এই অধিবেশন কংগ্রেসের ইতিহাসে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; ইহা জাতীয় জীবনে যুগান্তকারী পর্যায় বলিয়া গণ্য হয়; এতকালের নিয়মতান্ত্রিক পথাশ্রয়ী কংগ্রেস যেমন এবার তাহার অতীতের জীর্ণ খোলস ত্যাগ করিয়া নূতন ভাবাদর্শ ও কর্মধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন, তেমনি দেশবাসীকে অগ্নিপরীক্ষায় আহ্বান জানান। ইহা যুগপৎ আক্রমণোদ্যত গবর্ণমেণ্ট ও ভগ্নোদ্যম দেশবাসীর প্রতি দ্বন্দ্বে আহ্বান,—নৈতিক চ্যালেঞ্জ বটে।

কলিকাতা অধিবেশনে প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয় তিলকের মৃত্যু সম্পর্কে; উহাতে তাঁহার নিষ্কলুষ চরিত্র, অনন্যসাধারণ দেশপ্রীতি, অসীম আত্মত্যাগ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা জানাইয়া তিলক স্মৃতিভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ব্যক্ত হয়। অধিকন্তু অন্যান্য গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট, পাঞ্জাবের অনাচার ও গান্ধিজীর অসহযোগ পরিকল্পনা সমধিক উল্লেখযোগ্য।

বস্তুত অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভের যৌক্তিকতা সম্পর্কে নীতি স্থির করার জন্যই অধিবেশন আহূত হয়। কাজেই উহা লইয়াই সর্বাধিক আলোচনা চলে; আবার উহাকে কেন্দ্র করিয়াই কংগ্রেস যেমন গান্ধী-নেতৃত্ব আংশিকভাবে স্বীকার করিয়া নেয়, তেমনি দেশবাসীর নিকটও একটী সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা উপস্থিত করার সুযোগ উপস্থিত হয়। কাজেই মত ও পথ সমস্যা সমাধানের জন্য গান্ধিজী যে-কর্মসূচী পেশ করেন,

তাহা স্বভাবতই তীব্র সমালোচনার হেতু হইয়া উঠে। একদিকে প্রধানত প্রবীণ মারাঠী ও বাঙালী নেতৃবৃন্দ, অন্যদিকে নবীন চরমপন্থী ও সংস্কারকামী দল তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হন। নিয়মতন্ত্রপন্থী অ্যানি বেশান্ত প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন। তিলকশিষ্য খাপর্দে উহার তীব্র সমালোচনা করেন; বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ অসহযোগ নীতির সহিত একমত হইলেও পরিষদ বর্জনে সম্মতি দিতে পারেন না। উপরন্তু সভাপতি লালা লাজপৎ রায় দফাওয়ারীভাবে গান্ধী-প্রস্তাবের বিভিন্ন ধারার (বিশেষতঃ শিক্ষায়তন বর্জন) ত্রুটী প্রদর্শন করেন। কাজেই বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে গান্ধী-প্রস্তাব গৃহীত হইবে কিনা, সেবিষয়েও সন্দেহ দেখা যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মাত্র ৭টী ভোটাধিক্যে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইহাতে হাল না ছাড়িয়া মূল অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাবের পুনরায় সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। বিষয় নির্বাচনী সমিতি ও প্রকাশ্য অধিবেশনে উভয়ত্র বিপিন পাল মহাশয় সংশোধন প্রস্তাব পেশ করেন এবং চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাহা সমর্থন করেন; মিঃ জিন্না, পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়, শ্রীবিজয় রাঘব আচারিয়া প্রভৃতি মহারথীরা তাহা অনুমোদন করিয়া বক্তৃতা করেন। এই সম্পর্কে চারদিন জোর তর্কবিতর্ক চলে। কিন্তু অবশেষে গান্ধী-প্রস্তাবই ১৮৮৬—৮৮৪ ভোটে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটী নিম্নোক্তরূপ:—

"ভারত ও বৃটীশ গবর্ণমেন্ট খিলাফৎ সমস্যায় ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি যথোচিত কর্তব্য পালন করেন নাই ও বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী স্বেচ্ছায় বিশ্বাসহানি করিয়াছেন; এইহেতু প্রত্যেক ভারতীয় মুসলমান ভ্রাতাকে সহায়তা করা কর্তব্য। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত ঘটনার সময় উভয় গবর্ণমেন্টই পাঞ্জাবের নিরপরাধ অধিবাসীদের রক্ষার ব্যাপারে গুরুতর অবহেলা করিয়াছে এবং কাপুরুষোচিত ও বর্বর আচরণ করা

সত্ত্বেও দোষী সরকারী কর্মচারীদের শাস্তি দিতে অক্ষম হইয়াছে; স্যর মাইকেল ও'ডায়ার কর্ম্মচারীদের অনাচার অনুষ্ঠানের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী এবং তাঁহারই শাসনাধীন পাঞ্জাবীরা যেসব অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সহ্য করে, তাহার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে সর্ববিধ দোষত্রুটী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। কমন্স সভা ও বিশেষত লর্ড সভায় ভারত সংক্রান্ত আলোচনা কালে ভারতবাসীর প্রতি কারুণ্যের সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হইয়াছে এবং পাঞ্জাবীদের উপর অনাচার অনুমোদন করা হইয়াছে; অধিকন্তু খিলাফৎ ও পাঞ্জাব সম্পর্কে বড়লাট যে-ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে অনুশোচনার মনোভাব আদৌ না থাকায় কংগ্রেস এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন যে, এই দ্বিবিধ অন্যায়ের প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত ভারতে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই জাতীয় আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার এবং ভবিষ্যতে এজাতীয় অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব করিবার একমাত্র প্রতিকারোপায় নিহিত।

কংগ্রেস এই অভিমত পোষণ করেন যে, পূর্বোক্ত অন্যায়ের প্রতিকার ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতবাসীর পক্ষে ক্রমবর্ধমান অহিংস অসহযোগ নীতি অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

এইহেতু জনমত গঠনে ব্রতী ও জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের এদিকে কাজ আরম্ভ করা কর্তব্য। গবর্ণমেণ্ট খেতাব ও সম্মান বিতরণ করিয়া এবং শিক্ষায়তন, ব্যবস্থাপরিষদ ও আইন আদালতের মারফৎ স্বীয় ক্ষমতার পুষ্টি করিয়া থাকে। আন্দোলনের সাম্প্রতিক পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা অল্প দায়িত্ব ও ত্যাগস্বীকার বাঞ্ছনীয়; এইহেতু কংগ্রেস নিম্নোক্ত কয়টি বিষয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষে পালনীয় বলিয়া পরামর্শ দিতেছেন, যথা:—(১) খেতাব বর্জন, অবৈতনিক পদ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকার-মনোনীত সদস্যদের পদত্যাগ;

(২) সরকারী দরবার এবং সরকারী বা আধা-সরকারী সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান বর্জন; (৩) সরকারী বা সরকার-অনুমোদিত শিক্ষায়তন ক্রমশ ক্রমশ বর্জন এবং তদপরিবর্তে বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; (৪) উকিল ও মক্কেলদের আদালত বর্জন ও মামলার নিষ্পত্তির জন্য সালিশী আদালত স্থাপন; (৫) সৈন্য, কেরাণী ও মজুরদের মেসোপটেমিয়ায় চাকরি করিতে অস্বীকার; (৬) ব্যবস্থাপরিষদে নির্বাচনপ্রার্থীদের নির্বাচন প্রত্যাহার এবং নির্দেশ অমান্যকারীদের ভোট না দিবার ব্যবস্থা ও (৭) বিদেশী দ্রব্য বর্জন।

নিয়মশৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগ ব্যতীত কোন জাতিই সত্যকার উন্নতি লাভ করিতে পারে না বলিয়া উহাদের উপর ভিত্তি করিয়া অসহযোগ নীতি পরিকল্পিত হইয়াছে। নরনারীশিশু নির্বিশেষে প্রত্যেককে অসহযোগ নীতির প্রথম পর্যায় অনুসরণের সুযোগ দান করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সকলকে স্বদেশীবস্ত্র গ্রহণের নির্দেশ দিতেছেন। ভারতীয় মূলধনে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত কাপড়ের কলগুলি চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট কাপড় ও সূতা উৎপাদনে সম্প্রতি অসমর্থ; দীর্ঘকাল হয়ত এই অবস্থা বর্তমান থাকিবে: কাজেই কংগ্রেস প্রতি গৃহে চরকাকাটা প্রবর্তনের পরামর্শ দিতেছেন; অধিকন্তু উৎসাহদানের অভাবে জাতব্যবসাত্যাগী লক্ষ লক্ষ তাঁতিকে বেশী পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদনে সহায়তা করা উচিত।"

এইভাবে কলিকাতা কংগ্রেসে গান্ধী-নেতৃত্ব প্রাধান্য বিস্তার করে; কিন্তু তাঁহার পরিকল্পিত নীতি সমর্থন লাভ করিলেও তাঁহার নেতৃত্ব পুরাপুরি সকলে মানিয়া নেন না। ইহা সত্ত্বেও তিনি জাতীয় নেতৃত্বের পুরোভাগে আসিয়া উপস্থিত হন।

জাতীয় মুক্তিকল্পে তিনি যে-কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিতে সুপারিশ করেন, তাহার মধ্যে দ্বিবিধ ব্যবস্থা বর্তমান যথা, বৈদেশিক প্রভুত্ব অবসানকল্পে

গবর্ণমেণ্টকে দ্বন্দ্বে আহ্বান এবং নিজস্ব শক্তি সংহতিকল্পে সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথা বর্জন। অধিকন্তু তিনি ভীতিগ্রস্ত ও শোষিত জনসাধারণকে সর্ববিধ ভয় ও সরকারী মর্যাদার মোহ হইতে মুক্তি দানের জন্য উহাদের ভিত্তি মূলে আঘাত হানেন। আর নূতন সামাজিক মর্যাদাবোধ ও জীবনভঙ্গি গড়িবার জন্য তিনি আহারে, বিহারে, আচারে ও পোষাকে বাহুল্য বর্জন করিয়া দরিদ্র দেশের সামর্থ্যের উপযোগী সারল্যের প্রবর্তন করেন। দারিদ্র্যকে তিনি মহত্ত্বে ভূষিত করেন; দরিদ্ররাও তাঁহাকে নিজেদের আকাঙ্খার প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করে। ইহার ফলে কংগ্রেসও জনসাধারণের আনুগত্য লাভ করে এবং উহারাই তাহার শক্তির উৎসে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে গান্ধিজী কংগ্রেসে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য-প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন এবং কংগ্রেসকে সমগ্র বৃটিশ-বিরোধী জাতীয় শক্তিনিচয়ের সঙ্গমস্থলে পরিণত করেন।

কংগ্রেসের এই বৈশিষ্ট্য বা রূপ পরিবর্তন ব্যাপারে যে-যুগান্তর ও কালান্তর ঘটে, তাহার কৃতিত্বের অধিকাংশই গান্ধিজীর প্রাপ্য; বোধশক্তিরহিত একটি জাতির দৃষ্টিভঙ্গি এমন করিয়া আমূল পরিবর্তন করা আদৌ সহজসাধ্য নহে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তাঁহার এই ঐতিহাসিক অবদান ও ভূমিকা নিঃসন্দেহে স্মরণীয় ঘটনা।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতে গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের কণ্ঠরোধ করিতে আরম্ভ করে। ফলে বহিঃপ্রকাশের পথ না পাইয়া বিক্ষুব্ধ জনচিত্ত একটা গোপন পথের সন্ধান করে। তাহা হইতে বৈপ্লবিক সশস্ত্র দলের উদ্ভব হয়। গান্ধিজী নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথমেই জাতির সেই অবরুদ্ধ মর্মবেদনাকে বজ্রনির্ঘোষে ব্যক্ত করেন—বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তাঁহারই কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল—"I am a rebel"—আমি বিদ্রোহী। জাতির মর্মস্থলে যে-ব্যথা আলোড়িত হইয়া গুমরিয়া গুমরিয়া

মরিয়া যাইতেছিল, গান্ধিজীর কণ্ঠে তাহাই গঙ্গোত্রীর মত প্রথম উৎসারিত হইয়া দুর্বার বেগে জাতীয় জীবনের দুইকূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলিল। সমগ্র জাতি এক নূতন সঞ্জীবনী শক্তিতে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। সমস্ত দ্বিধাসঙ্কোচ ও ভেদাভেদ বিসর্জন দিয়া জাতি তাহার পতাকাতলে উন্নতশিরে দাঁড়াইল।

ইহা সত্ত্বেও বলা যায়, গান্ধিজীর অবলম্বিত আত্মশক্তি উদ্বোধনের ব্যবস্থা বঙ্গভঙ্গ যুগে উদ্ভাবিত ব্যবস্থা হইতে বিশেষ পৃথক নহে; বঙ্গভঙ্গকালেও চরমপন্থী নেতাগণ জনসাধারণকে স্বদেশী গ্রহণ, স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠা, জাতীয় বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা ও সরকারী বিদ্যায়তন ত্যাগ প্রভৃতি আত্মবিকাশমূলক কর্মপন্থার সন্ধান দেন। শুধু স্বরাজ সাধনায় কর্মগত নীতি ও পদ্ধতি হইতে তাঁহার অনুসৃত পন্থায় মৌলিক মতভেদ বিদ্যমান। তাহা ছাড়া, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আঞ্চলিক এবং একটি বিশেষ অন্যায়ের প্রতিকার ও প্রতিবাদকল্পেই আন্দোলন করা হয়; পক্ষান্তরে এই প্রথমবার কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং তদনুযায়ী জনসাধারণকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সংগঠন করার ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। অধিকন্তু বাঙালী শস্ত্রপাণি যুবক দল অস্ত্রের সাহায্যে মুক্তি চান; পক্ষান্তরে গান্ধিজী আত্মিক-বলের শক্তিতে প্রতিপক্ষকে বশ করিয়া ভারতবাসীর দারিদ্র্য মোচনের উপায় নির্দেশ করেন!

যাহা হউক, কংগ্রেস অধিবেশনের সহিত নিঃ ভাঃ মুসলীম লীগেরও অধিবেশন হয় এবং উহাতে কংগ্রেসের অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই হেতু লীগ ও খিলাফৎকমিটির নিবিড় সহযোগিতায় কংগ্রেস নিঃশঙ্কচিত্তে সরকারী ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করিবার সাহস অর্জন করে। এদিকে একদল প্রতিভাবান মুসলীম জননায়ক ও কর্মী কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় উহার শক্তি বৃদ্ধি হয়: অধিকন্তু সদ্যোমুক্ত বিপ্লবীরা

নীতি ও কর্মগত মতভেদ সত্ত্বেও কংগ্রেসের মধ্যে নিজেদের অভিপ্রেত মুক্তি-সাধনের সন্ধান পাইয়া তাহাতে যোগ দেন। নিগৃহীত জনসাধারণ, নির্যাতিত কিষাণমজুর ও কর্মহীন যুবকদল উহাকে নিজেদের অবদমিত কামনার প্রতীক বলিয়া মনে করিতে থাকে। কংগ্রেস হইয়া উঠে মুক্তিকাম হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর মিলনস্থল। একদল মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের একচেটিয়া সম্পত্তি হইতে কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। বহু মত ও পথের পথিকদের সমন্বয় সাধন করিয়া উহা সাধারণের আনুগত্য দাবী করে; উহার মধ্যেই তাহার মূল শক্তি নিহিত।

কাজেই গবর্ণমেণ্ট নিজমূর্তি ধারণ করে। ভাবী বিপদপাতের সম্ভাবনায় তাহারা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে নির্দেশ দেয় যে, আন্দোলনের প্রবর্তক কর্তৃক নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিলে যে-কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে; অথবা যাহাদের বক্তৃতা বা প্রবন্ধ হিংসামূলক কর্মে উস্কানি দিবে, অথবা যাহারা পুলিশ ও সৈন্যদলকে রাজানুগত্য হইতে বিচ্যুত করার চেষ্টা করিবে, তাহাদের বিরুদ্ধে রাজদণ্ড উদ্যত হইবে। অধিকন্তু গবর্ণমেণ্ট এই মর্মে আশা করে যে, জনসাধারণ সত্যাগ্রহ পরিকল্পনা পরিহার করিবে; যেহেতু উহাতে তাহাদের মতে কোনরূপ গঠনমূলক সম্ভাবনা নাই এবং উহা সফল হইলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অরাজকতা ও কায়েমী স্বার্থের অপহ্নব অবশ্যম্ভাবী।

এইভাবে কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্ট দুইটী বিরুদ্ধবাদী ও যুধ্যমান শিবিরে পরিণত হয়। উভয়েই নিজ নিজ শক্তি সংহত করিয়া আক্রমণোদ্যোগ করিতে থাকে। ইহাই আসন্ন ঝটিকার পূর্বাভাস।



# পরিশিষ্ট

গ্রন্থে বর্ণিত কয়েকটি বিষয়ে বক্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। উহা সংক্ষেপে হইলেও বলা প্রয়োজন।

'বাঘা যতীন' বা বিপ্লবী যতীন মুখার্জি ( পৃঃ—১৭১ ) বাঙলা তথা ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনে অন্যতম অদ্ভুতকর্মা পুরুষ। তাঁহার কার্যকলাপ এতাবৎ যতদূর প্রকাশ পাইয়াছে, সেসম্পর্কে মোটামুটি কোন মতভেদ নাই; তবে তাঁহার নেতৃত্ব সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী মতামত জানা গিয়াছে।

যুদ্ধারম্ভে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের মিলন এবং তাঁহাকে সম্মিলিত নেতৃপদে বরণ করা লইয়া পুস্তকে যে-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনেকে প্রকৃত ঘটনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে, অনুশীলন-দলের সহিত যুগান্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে মতৈক্য হয় নাই এবং যতীনবাবুকে একমাত্র নেতা বলিয়াও মানিয়া লওয়া হয় নাই। তবে উভয় দলের মধ্যে যোগাযোগ রাখিয়া কাজ করিবার ব্যবস্থা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও হয়। অপর এক দল বলেন, যুদ্ধকালে সৈনিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টার সহিত বিদেশে গদর দল ও জার্মানীর সহিত যোগাযোগ রাখিয়া কাজ করার সমগ্র পরিকল্পনা রাসবিহারী বসু কর্তৃক উদ্ভাবিত। পুলিশ ও গুপ্তচরের উৎপাতে তাঁহার পক্ষে যখন কাজ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় তখন তিনি যতীন মুখার্জির উপর প্রাচ্যদেশীয় জার্মান এজেন্টদের সহিত একযোগে কাজ করার জন্য ভার অর্পণ করেন। কাজেই যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে রাসবিহারী ও শচীন সান্যাল উত্তর ভারতে কাজ করেন বলিয়া যে-কথা বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বের অভিমত মানিয়া নিলে টিকিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, যতীন্দ্রনাথ যুগান্তর বা অনুশীলন কোন দলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি একটি স্বতন্ত্র ( চন্দননগর ) দলভুক্ত ছিলেন। তবে যুগান্তর

দল তাঁহাকে যতটা মানিত, অনুশীলন ততটা মানিত কিনা সন্দেহ। সুতরাং সমগ্র বিষয় সুস্পষ্ট হইতে আরও কিছুকাল হয়ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

বুড়ী বালামের তীরে (পৃঃ—১৮১) যতীন বাবুর দলের সহিত খণ্ডযুদ্ধ কালে টেগার্টের উপস্থিতি সম্পর্কে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে খণ্ডযুদ্ধ সম্পর্কে সকলেই নিঃসন্দেহ। তাঁহারা বলেন, পুলিশ বিভাগে মিঃ টেগার্ট (তৎকালে কলিকাতা পুলিশের ডেপুটী কমিশনার) ও মিঃ লোম্যান প্রায়শ বিপ্লবীদের সহিত সংঘর্ষে রত হইতেন বলিয়া বালেশ্বরেও মিঃ টেগার্টের উপস্থিতি কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু আর একদল পুস্তকে উল্লিখিত বিবরণই সমর্থন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়ত মাদ্রাজে বিপ্লব আন্দোলনের সূচনায় (পৃঃ—১৮৯) বিপিন চন্দ্র পালের ১৯০৭ সালের বক্তৃতা কম সহায়তা করে নাই। তিনি রক্ষা-কালী পূজার প্রবর্তন এবং সাদা পাঠা বলির প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

তৃতীয়ত মহারাষ্ট্রে বিপ্লব আন্দোলনে চিৎপাবন ব্রাহ্মণরাই সবচেয়ে অগ্রণী হইয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে মহারাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় তাঁহারা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া আসেন। কাজেই পরবর্তী কালে শাসনক্ষমতা দখলের সুযোগ আসামাত্র তাঁহারা উহার সদ্ব্যবহার করিয়া লইতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পর হইতে বোম্বাই প্রদেশের রাজনীতিতে তাঁহাদের প্রভাব হ্রাস পাইয়াছে।

চতুর্থত, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের পর আসে সশস্ত্র অভ্যুত্থান কামীদের যুগ। কিন্তু অসতর্কতাবশত এই যুগের ইতিহাসকে বঙ্গভঙ্গ এবং অসহযোগ আন্দোলন অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বিষয়সূচীতে পৃষ্ঠানুযায়ী সশস্ত্র অভ্যুত্থানকামীদের যুগটিকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসাবে দেওয়া হইল।

———

# ভ্রম শুদ্ধি

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৫৯ | ১৪ | শ্রেশীগত | শ্রেণীগত |
| ৬২ | ৭ | অন্য | জন্য |
| ৭৬ | ২১ ও ২২ | ইংরেজী শিক্ষিত না হইয়াও | ইংরেজী শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন না হইয়াও |
| ১০১ | ৮ | যদিও ওয়াহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত | যদিও সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত |
| ১০১ ও ১০২ | ২৪ | অখিল মুস্‌লীম স্বার্থের অখণ্ডত্ব | বিশ্ব মুস্‌লীম ভ্রাতৃত্ব |
| ১০৬ | ৯ | ১৮৮১ | ১৮৯৯ |
| ১২৫ | ১৭ | অস্ত্রবলে | অস্ত্রবলে |
| ১৪৩ | ৪ | হার্ডিঞ্জের গাড়ীতে | হার্ডিঞ্জের উপর |
| ১৪৪ | ২১ | ১৯০৯ | ১৯০৬ |
| ১৫৯ | ১০ | হইয়া | ইহার |
| ১৬৭ | ১১ | উপলক্ষ ইহার | উপলক্ষ হইয়া |
| ১৭৩ | ২০ | এই সময় আমীর আমানুল্লা শাসিত কাবুলে | এই সময় কাবুলে |
| ১৮১ | ১৫ ও ১৬ | কলিকাতা পুলিশের কর্তা স্যর চার্লস টেগার্ট | কলিকাতা পুলিশের মিঃ চার্লস টেগার্ট |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ১৮৫ | ৩ ও ৪ | নলিনী গুপ্ত | নলিনী বাগচী |
| ১৮৬ | ৯ | গত | গতি |
| ১৯৯ | ১ | মঞ্জুর | মজুর |
| ২২৮ | ২৬ | Muslim Politics in India | Modern Islam in India |
| ২৩২ | ১৫ | হামদাদ | হামদার্দ |
| ২৩৩ | ১১ ও ১২ | লিয়াকৎ হোসেন আলী | লিয়াকৎ হোসেন |
| ২৫৫ | ১৮ | লর্ড মেস্টন ও লর্ড সত্যেন্দ্র সিংহ | স্যর মেস্টন ও স্যর সত্যেন্দ্র সিংহ |

# পুস্তকপঞ্জী

পুস্তকপ্রণয়নে যেসব গ্রন্থ, সংবাদপত্র ও রচনার সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে, নিম্নে সেইগুলির নামোল্লেখ করা হইল :—

১। সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস ( পাঁচ খণ্ড )—রজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত

২। History of the Sepoy war in India ( 6 Vols. )—
By J. W. Kaye & J. B. Malleson.

৩। History of the Indian Mutiny ( 2 Vols. )—
By Charles Ball.

৪। My Diary in India ( 2 Vols. )—By W. H. Russell.

৫। The Indian Rebellion—By Alexander Duff.

৬। The Other Side of the Medal—
By Edward Thompson.

৭। Two Native Narratives—By C. T. Metcalfe.

৮। Rise of the Christian Power in India—
By Major B. D. Basu.

৯। Empire of Nabobs—By Hutchinson.

১০। Great Britain—By Dilke.

১১। A Nation in Making—By Surendra Nath Banerjee.

১২। সুরেন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্র।

১৩। Memories of my Life and Times—
By Bepin Chandra Pal.

১৪। Indian National Evolution—By A.C. Mazumder.

১৫। How India Wrought for Freedom—
By Annie Beasant.

১৬। আনন্দ বাজার বিশেষ সংখ্যা ( ১৯২৮, ১৯২৯ ও ১৯৩৫ সাল )।

১৭। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত।

১৮। Modern Islam in India—By W. C. Smith.

১৯। My Experiment with Truth ( 2 Vols )—
By M. K. Gandhi.

২০। Discovery of India—By Jawahar lal Nehru.

২১। গদর বিপ্লবী—রণধীর সিংহ।

২২। Recollections ( 2 Vols. )—By John Morley.

২৩। Rowlatt Committee Report.

২৪। Hunter Committee Report.

২৫। Punjab Enquiry Committee Report.

২৬। Administrative Report (1916, 1917, 1918, 1919,
1920, 1921, 1922.)

২৭। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ—এম কে গান্ধী প্রণীত :
সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত অনূদিত।

২৮। চম্পারণ সত্যাগ্রহ—সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত সংকলিত।

২৯। মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশ চন্দ্র বাগল প্রণীত।

৩০। The Problem of India—By Dr. K. S. Shelvankar.

৩১। History of the Congress—By Dr. P. Sitaramaiya.

৩২। A Review of the History & Work of the Hindu
Mahasabha—By Indra Prakash.




এই লেখকের লেখা

**মহাচীনের নবজন্ম**